পারাবার

(উপন্যাস)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৩৪৩

প্রকাশক—শ্রীরণেন্দ্রকুমার শীল
"পর্ণ-কুটীর"
৬, কামারপাড়া লেন, বরাহনগর

মূল্য ৩৲

প্রিণ্টার—শ্রীনিমাইচরণ বিশ্বাস
"অক্ষয় প্রেস"
২৭।৫, তারক চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ]

মাসিক-বসুমতীর সুযোগ্য সম্পাদক

প্রিয়বন্ধু

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কর-কমলেষু

২নং এলগিন লেন,
কলিকাতা

প্রীতিমুগ্ধ
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পারাবার

কাশীতে কেদার ঘাটের কাছে সরু গলির মধ্যে তিন-তলা বাড়ী। বাড়ীখানি জীর্ণ। এই বাড়ীতে দোতলার একটা ঘরের মেঝেয় বসিয়া বীণা চাহিয়া আছে খোলা জানলা দিয়া বাহিরে আকাশের পানে। রৌদ্র-স্নাত আকাশে ক'টা পাখী উড়িতেছে—বীণার দৃষ্টি পাখীর দিকে নয়। আকাশের পানে চাহিয়া সে অনেক কথা ভাবিতেছিল। বীণার হাতে একখানি চিঠি। খামে ভরা। এ চিঠি ডাকে আসিয়াছে। খামের উপরে নাম লেখা,—

শ্রীমতী সলিলা দেবী

প্রোফেসার ৺সন্তোষকুমার রায়ের বাড়ী·····

চিঠি আসিয়াছে কলিকাতা হইতে; লিখিয়াছেন সলিলার পিতামহ তারাচরণ রায়।

চিঠিতে লেখা আছে,—

প্রাণাধিকাসু

হঠাৎ আমার চিঠি পাইয়া তুমি চমকিয়া উঠিবে! চমকাইবারই কথা!

আমি তোমার পিতামহ। তোমার বাবা সন্তোষ অমার পুত্র—একমাত্র পুত্র। বড় আশায় তাকে মানুষ করিতেছিলাম। এম্-এ পাশ করিয়া তার খেয়াল হইল প্রোফেশরি চাকরি করিবে। তার চাকরির প্রয়োজন ছিল না। পাঁচ-ছজন প্রোফেশরকে মাহিনা দিয়া বাড়ীতে পুষিতে পারার মতো সঙ্গতি আমার ছিল—এখনো আছে। তোমার বাবার খেয়াল—আমিও স্নেহ-বশে তাকে নিবৃত্ত করি নাই।

সন্তোষ গেল ভাগলপুরে চাকরি করিতে। তোমার ঠাকুমা বহু কাল স্বর্গে গিয়াছেন। সেজন্য একা আমি···সন্তোষকে কাছে-কাছে পাইবার বাসনা আমার মনে ছিল খুব বেশী-রকম। সন্তোষ আমাকে একা রাখিয়া চলিয়া গেল বলিয়া আমার মনে অভিমান হইয়াছিল অনেকখানি। ভাবিলাম, আমার নিঃসঙ্গতার কথা ছেলে একবার ভাবিল না! মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিলাম।

কিন্তু তারপর তোমার বাবা অতি-বড় দুঃখ দিল তোমার মাকে বিবাহ করিয়া। তোমার মামা ছিলেন তার কলেজের ফিলজফির প্রোফেশর। ভদ্রলোক বিদেশে সহসা মারা গেলে তার সংসার দেখিতে গিয়া তোমার মার উপর তোমার বাবার মমতা জাগিল। এবং আমার অনুমতি লইবার পূর্ব্বে তাঁকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা করিল। আমার অনুমতি চাহিল বিবাহের পাঁচদিন পূর্ব্বে। লিখিয়াছিল, "বিবাহের সব ঠিক; শুধু আপনার আশীর্ব্বাদ আর অনুমতি প্রত্যাশা করি।"

সে-অনুমতি আমি দিই নাই। তার পর আমার লোক ভাগলপুরে গিয়া দেখিয়া আসে, তোমার বাবা তোমার মাকে বিবাহ করিয়া

ঘরকর্ণা পাতিয়াছে! আমাকে সেজন্য চিঠি লিখিয়া সংবাদ দেওয়া কিম্বা আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা—দু'টোর কোনোটাই তোমার বাবা উচিত বলিয়া মনে করে নাই। সেদিন হইতে তোমার বাবার নাম আমার বুক হইতে মুছিয়া দিলাম!

তার পর তোমাদের কোন সংবাদ পাই নাই। সংবাদ লইবার জন্য মন উদগ্রীব হইলেও দু'পায়ে মনের সে-বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছি!

সাত বৎসর পূর্ব্বে তোমার কথা এবং তোমার মার কথা লিখিয়া তোমার বাবা আমাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল। লিখিয়াছিল, একটি মেয়ে হইয়াছে—তার নাম সলিলা। তোমার বয়স তখন বারো বৎসর। তোমার খুব অসুখ—তুমি নাকি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে! তাই তোমার বাবা লিখিয়াছিল,—আমার উপর যত রাগ থাকুক, আমার মেয়ে আপনার পৌত্রী, সে তো কোনো অপরাধ করে নাই ইত্যাদি! সে চিঠির উত্তরে আমি জানিতে পারি, তোমার বাবা ভাগলপুর ছাড়িয়া কাশীর কলেজে ইংলিশের প্রোফেশরি করিতেছে।

তার পর আর কোনো সংবাদ আমি রাখি নাই। রাখিবার প্রয়োজন মনে করি নাই!

দু'মাস পূর্ব্বে আমার এক কর্ম্মচারী লোকনাথ গিয়াছিল তীর্থ করিতে। তার মুখে শুনিলাম, তোমার মা মারা গিয়াছেন—তোমার বাবার শরীর ভালো নয়!

এখন সে কেমন আছে,—সংবাদ লইতে গিয়া শুনিলাম, তোমার বাবাও ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তুমি একা এবং

আমার পৌত্রী তুমি ; তোমার বয়স অল্প। এ-বয়সে অসহায় একা তোমার বহু বিপদ ঘটিতে পারে, এজন্য তোমার বাবার সব অপরাধ ভুলিয়া তোমাকে লিখিতেছি—তুমি যদি ইচ্ছা করো, আমার কাছে আসিতে পারো। তোমার কোনো অসুবিধা ঘটিবে না। জানিয়া রাখো, এ বাড়ীতে তোমার আসন আমার পৌত্রীর আসন—সে-আসন অটল।

হয়তো তোমাকে এখানে আনিবার জন্য নিজে আমি কাশী যাইতাম! কিন্তু ভয় হয়, তেজী বাপের তেজ স্মরণ করিয়া যদি বলো—আসিবে না! সব ছাঁটিয়া-কাটিয়া পাথর বনিলেও জীবনে ভ্রূভঙ্গী বা অপমান সহিবার মতো শক্তি এ-পাথরের বুকে নাই!

এত কথা লিখিলাম—হয়তো এ কথা রূপকথার মতো শুনাইবে। তবু লিখিলাম। এই বুড়াকে সঠিক বুঝিতে তোমার অসুবিধা না হয়, তাই!

যদি আমাকে পিতামহ বলিয়া স্বীকার করিয়া আমার কাছে আসিতে আপত্তি না থাকে,' জবাবে তাহা জানাইয়ো। তাহা হইলে পৌত্রীর আদরে আনিয়া তোমাকে বুকে রাখিবার ব্যবস্থা করিব।

তোমার বাবার ও মার উপর আমার আচরণ হয়তো তুমি বলিবে, কঠিন, অমানুষের মতো! সে সম্বন্ধে কোনো বালিকার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহি না। কতখানি বেদনার আঘাতে মানুষের মন পাথর হইয়া যায়, সে-বেদনা যে পাইয়াছে, সে ভিন্ন অপরে আমার মনের তত্ত্ব বুঝিবে না।

এখন সুস্পষ্টভাবে কথাটা বলিবার পর আশা করি, আমাকে বুঝিতে হয়তো তোমার কষ্ট হইবে না।

যে-আমি তোমার বাবার কোনো পত্রের উত্তর দিই নাই, সেই আমি নিজে যাচিয়া তোমাকে পত্র লিখিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকিতেছি—এ-ডাকে সাড়া দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছা। তবে আমি যখন ডাকিয়াছি, তখন পুরানো অভিমান ও দুঃখ-ব্যথা মনে পুষিয়া তোমার অনাদর করিব না, সে সম্বন্ধে তোমাকে নিঃসংশয় অভয় দিতে পারি।

আশা করি, তোমার শারীরিক কুশল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। যেমন উচিত মনে করো, সেই ভাবেই পত্রের জবাব দিয়ো। এক-সপ্তাহ-কাল তোমার উত্তরের প্রত্যাশা করিব। ইতি

শ্রীতারাচরণ রায়

চিঠি আসিয়াছে বেলা প্রায় দশটায়; এখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে।

এ চিঠি বীণার নয়; তবু বীণা খাম ছিঁড়িয়া এ-চিঠি খুলিয়া পড়িয়াছে। এবং পড়িয়া অবধি তার চিন্তার আর সীমা-পরিসীমা নাই!

ক্ষীরোদাময়ী আসিয়া বার-বার তাগিদ দিয়া গিয়াছেন!—ওরে, চান্ করেছিস্ সেই কোন্ সকালে! এমন করে বসে পিত্তি পড়াস নে—খাবি আয়।

শেষ-বারের তাগিদে বীণা জবাব দিয়াছে—খিদে নেই মাসিমা! শরীরটা ভারী খারাপ বোধ হচ্ছে!

এ কথায় বীণার কপালে-গায়ে হাত দিয়া ক্ষীরোদাময়ী আশ্বাস

দিয়া বলিলেন—গা আলো। ও কিছু নয়! খেলেদেলেই শরীর সুস্থ বোধ করবি...

এ-কথায় বীণা ছোট্ট জবাব দিল,—না।

ক্ষীরোদাময়ী আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া চলিয়া গেলেন।

বীণা তেমনি বসিয়া আছে। নড়িবার শক্তি যেন লোপ পাইয়াছে!

বীণা একা। এত বড় পৃথিবীতে আপনার জন বলিতে তার কেহ নাই! এ-বাড়ীতে সে আশ্রয় পাইয়াছে...সে কি আজ...

পাঁচ-ছ' বৎসর পূর্ব্বেকার কথা..

সন্তোষ রায়...সন্তোষ রায়ের স্ত্রী চারুলতা...মেয়ে সলিলা...

যেন স্বপ্ন!

মরু-পথে প্রাসাদ মিলিল! সে-প্রাসাদ এমন করিয়া বাতাসে মিশাইবে, কে ভাবিয়াছিল!

কতই বা বীণার বয়স! এই বয়সেই পৃথিবীর যে-মূর্ত্তি চোখে দেখিয়াছে,...মনে হইলে আতঙ্কে সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া ওঠে!

কোথায় গেল সলিলা? তারি বয়সী। বাঁচিয়া থাকিলে সলিলার বয়স হইত আজ উনিশ। স্নেহ-মমতায় বোনের মতো বীণাকে পাশে লইয়াছিল! সন্তোষ-মামা, চারুলতা মামী...

বুকের মধ্যে নিশ্বাসের বাষ্প জমিয়া উঠিল। বুকখানা সে-বাষ্পের চাপে ফাটিয়া যেন চুরমার হইয়া যাইবে!

নিজের অতীত দিনের কাহিনী...

সে-কাহিনী স্মরণ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়া বীণা ভাবিতেছিল সামনে ভবিষ্যৎ...আগাগোড়া অন্ধকারে ভরা!

ভাবিতেছিল যাদের থাকিবার কথা, থাকিতে যাদের কোথাও বাধে না, তারা কি বলিয়া চলিয়া যায়? কেন যায়? যার থাকিবার ঠাঁই নাই···যার থাকায় দিকে-দিকে অনিশ্চয়তা, তাকে কি বলিয়া এখানো রাখো ভগবান?

এই ক্ষীরোদাময়ী···তার কেহ নয়! অসহায় বিধবা নারী! ঘর ভাড়া দিয়া সেই ভাড়ার টাকায় নিজের ছেলেগুলিকে মানুষ করিতেছেন! যার নিজের দাঁড়াইবার শক্তি নাই, কি করিয়া সে অপরকে দাঁড় করাইবে?

ছ'দিন দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে। তার পর?

আকাশের অমন রৌদ্র···তার উপর কোথা হইতে মেঘ জমিতেছিল···

সাত বৎসর পূর্ব্বে...সলিলার বয়স তখন বারো বছর। টাইফয়েড হইয়াছিল। দাদুকে দেখিবার জন্য কি আগ্রহ! সে দাদুর দিক হইতে সাড়া আসিল না, সলিলাও বাঁচিল না! আজ সে-দাদু চিঠি লিখিয়াছেন! লিখিয়াছেন, আয় দিদি, কাছে আয়!

বীণার বুকখানার মধ্যে যেন হাজার-হাজার কামান দাগিতেছিল!

বীণা ভাবিল, এ চিঠির জবাবে সে যদি লিখিয়া ছায়, আমি···আমি বীণা নই! আমি সলিলা···সন্তোষ রায়ের কন্যা সলিলা—তারাচরণ রায়ের পৌত্রী সলিলা! নিরাপদ আশ্রয়ে যে-সলিলার আজ ডাক পড়িয়াছে, আমি সেই সলিলা!

ছলনা! মিথ্যা! হোক মিথ্যা, এ মিথ্যায় কারো কোথাও বাধিবে না!

অথচ···

সলিলা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, বীণা তাহা হইলে স্বপ্নেও কখনো এমন কল্পনা করিত না! সলিলা আজ নাই···তার নাম লইয়া তার আসনে বীণা গিয়া যদি বসে, সলিলার তাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না···কাহারো ক্ষতি হইবে না! অথচ বীণা জন্মের মতো নিরাপদ আশ্রয় আর স্নেহ পাইয়া বাঁচিয়া যাইবে! এমন আশ্রয় না মিলিলে তার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন···

কিন্তু···

চিঠি যেন লিখিল! সে চিঠি পাইয়া লোক আসিল তাকে লইয়া যাইতে···

বুকখানা ধড়াস্ করিয়া উঠিল!

লোক আসিলে ক্ষীরোদাময়ী যদি তাকে প্রশ্ন করে, কে তুমি? বীণার কে হও? হঠাৎ এতকাল পরে বীণার খপর···বীণাকে কোথায় কার কাছে লইয়া চলিয়াছ?

বীণা···বীণা···

এ-নাম এখানে কি করিয়া ঢাকিবে? যে-লোক আসিবে, সলিলা-পরিচয়ে তার সঙ্গে নিঃশব্দে চলিয়া যাওয়া, কি করিয়া তা হয়?

কিন্তু···

মস্ত সুযোগ! তাছাড়া বীণা জানে, এখন তাকে একা পাইয়া সেই শ্রীপতি এখানে আসিয়া যদি সদম্ভে গোলমাল সুরু করিয়া দেয়?

মা বাঁচিয়া থাকিতে প্রায় সে আসিয়া উদয় হইত···নেশা করিয়া, মত্ত মার-মূর্ত্তিতে! যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি নির্লজ্জ···ভদ্রতার খোলশ তার দেহ-মনের কোথাও নাই! যেন সেই পুরাণের রাক্ষস···রূপ-কথার দৈত্য!

২

বীণার জীবনে খানিকটা ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস দুঃখ-বেদনা গ্লানিতে পরিপূর্ণ!

বীণার বয়স যখন তিন বৎসর, বীণার মা নীরদার বয়স বাইশ, তখন বীণার বাবা মারা গেলেন! শিশু-কন্যাকে লইয়া নিরাশ্রয় বিধবা আশ্রয় লইলেন জ্ঞাতির ঘরে। রান্না-বান্না করিতেন, দাসীর কাজ করিতেন। সেটুকুও বিধাতার সহিল না! জ্ঞাতির ছিল এক শ্যালক শ্রীপতি। দুর্বৃত্তের একশেষ! তার উৎপাতে বিধবার মান-সম্ভ্রম, নারীত্ব···সব ভাসিয়া গেল। এবং চার-পাঁচ বৎসর এই শ্রীপতির সংসর্গে বহু দুঃখ ভোগ করিবার পর সন্তোষ রায়ের পায়ে ধরিয়া নীরদা বীণাকে লইয়া তার গৃহে আশ্রয় পায়। এ-আশ্রয়ে দুঃখ-অপমান কিছুদিনের জন্য ভুলিয়াছিল,···কিন্তু কোথা হইতে সন্ধান পাইয়া শ্রীপতি এখানে আসিয়া টাকা-পয়সা চাহিয়া, চীৎকার করিয়া নানাভাবে উৎপাত সুরু করে। সন্তোষ রায় এবং বাড়ীর লোক তাহাতে টলে নাই! কিন্তু পাড়ায় কলরব উঠিল, পাঁচজনে টিটকারী জুড়িয়া দিল। শেষে সে-জ্বালা দুর্ব্বহ হইয়া উঠিলে নীরদা একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত তার সন্ধান মিলে নাই।

সেদিন হইতে বীণা একা।

একা হইলেও সন্তোষ এবং চারুলতার অন্তর-ভরা স্নেহ-দরদে দুঃখ ভুলিয়াছিল। মায়ের পরিচয় লইয়া কোনো-দিন তাকে এতটুকু অনাদর-অবজ্ঞা সহিতে হয় নাই! শুধু তাই? সলিলা যত দিন বাঁচিয়াছিল, সলিলার সঙ্গে কোথাও তার তফাৎ ছিল না! যেন এক-মায়ের পেটে জন্মিয়াছে দুই বোন! দু'জনে এক স্কুলে এক ক্লাশে পড়িত। দু'জনের দিকেই সন্তোষ এবং চারুলতার ছিল সমান দৃষ্টি।

তার পর এ বাড়ীর উপরে বিধাতার কুদৃষ্টি পড়িল! সলিলা চলিয়া গেল; তার পর চারুলতা; তার পর সন্তোষ! আলোয় আলো-করা পুরী···নিমেষে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া অন্ধকার হইয়া গেল।

ভয়ে বীণা কাঠ হইয়া রহিল! নিজের ভাগ্যকে এ সর্ব্বনাশের হেতু বুঝিয়া সেই দিন হইতে গ্লানির ভারে মুষড়িয়া বীণা এতটুকু হইয়া আছে! ক্ষীরোদাময়ী আশ্রয় দিলেন। আজো তিনি এমন কথা বলেন নাই, যে এ-গৃহে বীণার ঠাঁই হইবে না! তবে যে-করিয়া তাঁর সংসার চলে···বীণা জানে! তার উপর একটা লোকের ভার বহা তাঁর পক্ষে কতখানি কঠিন!

পাড়ার দু' চারিজন প্রবীণা মাঝে মাঝে আসিয়া ক্ষীরোদাময়ীকে হিতোপদেশ দিয়া যান, বলেন···যে-মার মেয়ে···তার উপর এই সোমত্ত বয়স! শেষে কিছু একটা যদি ঘটে! বলে, মানুষ নিজের মেয়েকেই এ-বয়সে সাম্‌লে রাখতে পারে না, এ তো কোন কুটুমের কুটুম! ভালো করছো না ক্ষীরো···নোটিশ দাও! শেষে একটা দুর্নাম রটলে সেই সঙ্গে তোমারো মাথা হেঁট হবে।

এ-কথা বীণার কাণে গিয়াছে। শুনিয়া সে লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকে। লোকের সামনে বাহির হইতে ভয় পায়! কে জানে, যদি কোনো-দিন উহাদের কথা শুনিয়া ক্ষীরোদা-ময়ী বলিয়া বসেন,—সত্যি বীণা ভয় করে মা!

রাত্রে বিছানায় পড়িয়া বীণা তাই কত দিন ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কত কথা লইয়া মনে তোলাপাড়া করে! ভাবে, একজন নিরাশ্রয় বিধবার বুকে ভর করিয়া না থাকিয়া একদিন বাহির হইয়া পড়িবে!

বাহিরে দীর্ঘ পথ—সীমাহীন—পৃথিবীর প্রান্ত-সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে! নাই বা কোনো গৃহে আশ্রয় মিলিল! ঐ দীর্ঘ পথে চলিয়া-চলিয়াই জীবনটাকে শেষ করিয়া দিবে! নদীতে জলের অভাব নাই! পথের ধারে বন মিলিবে না?···সে-বনে ফল-মূল—?

এমনি পাঁচ কথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন স্নান করিতে গিয়া সত্যই সে ঐ প্রসারিত দীর্ঘ পথে বাহির হইয়া পড়িল! পিছনে ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহে নাই! সামনে যেদিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকে চলিয়াছিল।

পথের শেষ নাই! ভাবিয়াছিল, চলা শেষ হইবে না!

কিন্তু পথ নিরঙ্কুশ নয়! ভিড় ছাড়িয়া যেমনি বিজন পথে পা দিল, অমনি ক্ষুধাতুর লোলুপতা ইতর হাস্যে-ভাষ্যে তাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল! একদিনের চলার পথে বাহিরের এমন উন্মুখ লেলিহান্ ক্ষুধা দেখিয়া বীণা ভয়ে শিহরিয়া উঠিল! ভাবিল, এ পথে আরো অধিক অগ্রসর হইয়া গেলে না জানি···

ভয়ে-ভয়ে বীণা গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তখন দিনের সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। ক্ষীরোদাময়ী কাঠ হইয়া বসিয়াছিলেন, বলিলেন,—ব্যাপার কি বীণা? চান করতে গিয়ে ফেরবার নাম নেই···ভাবনায় আমি মরি!

পথের সে-ভয় বীণার বুকে তখনো মিলায় নাই! মৃদু কণ্ঠে বীণা বলিল,—ইস্কুলের একটি মেয়ে তার মা দিদিমার সঙ্গে ঘাটে এসেছিল,— আমায় বললে, ঠাকুর দেখে বাড়ী যেয়ো। তার পর ঐ মন্দিরের কাছে তাদের বাড়ী···দেরী হয়ে গেল মাসিমা!

ক্ষীরোদা কোনো কথা না বলিয়া বিরক্তি-ভরে বীণার পানে চাহিয়া রহিলেন। বীণা তখনি ক্ষীরোদাময়ীর পায়ের উপর পড়িয়া অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—এবারের মতো মাপ করো মাসিমা! আর কখনো এমন হবে না।

বেচারীর মলিন মুখ দেখিয়া ক্ষীরোদা বুঝিলেন, বীণা বুঝিয়াছে; এমন আর কখনো করিবে না বলিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছে! তিনি খুশী হইলেন; বলিলেন—বেশ!···কিন্তু খাওয়া হয়েছে?

আবার মিথ্যা কথা বলিতে হইল। বীণা বলিল—খেয়েছি ওদের বাড়ী।

ক্ষীরোদা বলিলেন—কখন খেয়েছিস?

—অনেকক্ষণ।

—খিদে পায়নি? বিকেলের জলখাবার খাওয়ায় সময় হলো যে!

—আছে খাবার?

—ভাতে জল দিয়ে রেখেছি···

যেন খুব খুশী হইয়াছে, এমনি ভঙ্গীতে বীণা বলিল,—চমৎকার

হবে মাসিমা। দেবে দুটি সেই ভিজে ভাত?···সত্যি আমি ভাবছিলুম···খুব ভয় করছিল, তবু মনে হচ্ছিল, বাড়ীর ভাতগুলো নষ্ট হবে! মাসিমা যদি সে-ভাতে জল দিয়ে রাখে তো বেশ হয়···

—জানি, পরের বাড়ীতে খেলে কি পেট ভরে রে! হাজার হোক, মেয়ে-মানুষ···পরের বাড়ী খেতে বসলে লজ্জা করে।

—সত্যি মাসিমা···এমন লজ্জা করছিল যে সে আর কি বলবো!

কোনোমতে ফাঁড়া কাটিলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বীণা বলিল—এ বেলায় আমি রাঁধবো মাসিমা।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—বেশ···রাঁধ। আজ আবার পিণ্টু খাবে না। কোথায় ওর নেমন্তন্ন আছে বুঝি!

পিণ্টু ক্ষীরোদাময়ীর বড় ছেলে···বীণার চেয়ে দু'বছরের ছোট। পিণ্টু ম্যাট্রিক পড়িতেছে।

এমনিভাবে দিন কাটিতেছিল···

শ্রীপতি আসিয়া ক'দিন আগে আবার দেখা দিয়া গিয়াছে। নোটিশ দিয়াছে,—আমার মেয়ে···ডাগর হয়েছে···এখানে ওকে রাখবো না।

ক্ষীরোদাময়ী ইতিহাস জানিতেন, কাজেই সঙ্কোচ না করিয়া জবাব দিলেন—ও তোমার কেউ নয়···এখানে থাকবে না তো তোমার কাছে গিয়ে থাকবে না কি?

শ্রীপতি বলিল—নিশ্চয়।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—তোমার সঙ্গে কুকুর-বেরাল রাখতে দিতে ভয় হয়, এ তো ডাগর মেয়ে!

—মেয়ে দেবে না?

—না। দেবো না।

—আমি ওর বাবা···আইন আছে।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—তুমি ওর কেউ নও। আইনের জোরে পারো, নিয়ে যেয়ো···

শ্রীপতি বলিল—বেশ···তাই হবে তাহলে!

এবং তার পর শ্রীপতি একদিন সত্যই পুলিশ লইয়া হাজির হইল। পুলিশের হাতে ওয়ারেণ্ট।

ওয়ারেণ্ট দেখিয়া ক্ষীরোদাময়ী শিহরিয়া উঠিলেন। বীণা কাঁদিল।

পুলিশ বলিল—কোর্টের ওয়ারেণ্ট আছে মা। আদালতে শ্রীমতী বীণা দেবীকে হাজির করে দিতে হবে।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—কিন্তু ও তো মেয়ের কেউ নয় বাবা! ওর সঙ্গে মেয়ে যাবে কেন?

পুলিশ বলিল—হাকিমের হুকুম আছে, মেয়ে যার কাছে থাকতে চাইবে, এখন তার কাছে থাকবে। তিনি হবেন মেয়ের জামিন। তবে তিন-তারিখে মেয়েকে পৌঁছে দিতে হবে আদালতে হাকিমের সামনে।···মেয়ের কোনো নালিশ আছে কি না, হাকিম তা শুনবেন মেয়ের মুখে।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—হাকিম হঠাৎ ওয়ারেণ্ট দিয়ে মেয়ে নিয়ে যেতে চান কেন?

পুলিশ বলিল—ইনি গিয়ে নালিশ করেছেন, ওঁর মেয়ে···ডাগর নাবালক মেয়ে। এখানে জোর করে তাকে আট্‌কে রাখা হয়েছে··· মেয়ের চরিত্র নষ্ট করবার মতলবে···

এ কথায় ক্ষীরোদামযী রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। লজ্জা-সরম ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—এত বড় কথা বলেছে ঐ লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা?… হুঁ!…বেশ, মেয়েকে আমি হাকিমের কাছে নিয়ে যাবো।…বাবা বলে পরিচয় ছায়, এত-বড় যার আস্পর্দ্ধা, তার পরিচয় কোর্টে গিয়ে হাকিমকে জানাবো। মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। জানেন, ঐ লক্ষ্মীছাড়াটা…ও যে কত বড় বখাটে, পাজী তা আমি কি বলবো! সে-কথা জানেন শুধু বাবা বিশ্বনাথ!

আদালতে গিয়া হাকিমের কাছে এ-কথা বলিতে হইল। ক্ষীরোদামযী উকিল দিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপতির পরিচয় দিলেন। পরিচয় দিয়া উকিল বলিলেন,—ও লোকটিকে শাসন করে দিন হুজুর, ও যেন ও-বাড়ীতে না ঢোকে!

সব কথা শুনিয়া হাকিম দিলেন শ্রীপতিকে জোর-ধমক; ধমক দিয়া বলিলেন,—তুমি যদি ও-বাড়ীর ত্রিসীমায় যাও, কিম্বা পথে-ঘাটে ওঁদের উপর কোনো উৎপাত করো, তাহলে তোমার উপর ১০৭ ধারা চালাবো…

এ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে মাসখানেক পূর্ব্বে। তার পর শ্রীপতি এ গৃহে পদার্পণ না করিলেও পাড়ায় আসিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দোকানে বসিয়া থাকে এবং পথে ক্ষীরোদামযীকে দেখিলে অকথা-কুকথা বলিয়া আক্রোশ মিটায়। পাঁচ জনকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলে,—পরের ডাগর সুন্দরী মেয়েকে পেয়ে হাতছাড়া করতে চায় না…কাশীতে ব্যবসা চালাচ্ছে ভালো…

ক্ষীরোদাময়ী সে কথা গায়ে মাখেন না…পাশ কাটাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসেন।

দু'দিন পূর্ব্বে বীণা গিয়াছিল মন্দিরে। ফিরিবার পথে শ্রীপতি তার হাত ধরিয়া টানে, বলে—আমার মেয়ে হয়ে তুই সভাপণ্ডিতী করবি শুদ্ধাচারে, আর আমি না খেতে পেয়ে মরবো! ককখনো না···

কোনোমতে সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া বীণা কি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল···

ভাবিতে বসিয়া কোনো কথাই মনের গহনে গোপন রহিল না। না, এখানে বাস করা চলে না···চলিতে পারে না! অন্য কোনো কারণে না হোক, ঐ শ্রীপতির জন্য···

ক'দিন আগে ক্ষীরোদাময়ী বলিয়াছেন—একটি ভালো পাত্র পাই··· কিন্তু সে তো বিনা-পয়সায় হবে না!

প্রতিবাসিনী মোক্ষদা সেদিন রামলীলা দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার মুখে এ-গৃহে আসিয়াছিলেন আত্তিশো জানাইতে। তিনি বলিলেন—সত্যই তো, ও-ভাবনা তোমার কেন দিদি? লেখাপড়া শিখেছে—কোনো মেয়ে-ইস্কুলে মেয়ে পড়াবার চাকরি করুক্ না! তার পর বিয়ে···হুঁঃ, নিজের পথ নিজে দেখে নিক্!

এ-কথায় ক্ষীরোদাময়ীর মন সায় দেয় না। মেয়ের মতো এতদিন যাকে মানুষ করিয়াছেন···

পাঁচজনের পাঁচটা কথায় বীণার মন কোথায় ভাসিয়া বেড়ায়—কুল পায় না! চারিদিকে যেন অতল অকূল পারাবার!

পিণ্টু, মিণ্টু, সিণ্টু ক্ষীরোদাময়ীর তিন ছেলে—বীণাকে দেখে বোনের মতো! তাদের দিক হইতে প্রীতির সীমা নাই!

কিন্তু বীণা বাঙালীর ঘরের মেয়ে। সে জানে, শুধু স্নেহ দিয়া

মেয়েকে মানুষ করা যায় না। মেয়ের জন্য চাই পাত্র এবং সে-পাত্র-সংগ্রহ করা আজিকার দিনে কত-বড় সমস্যা, পৃথিবীর এক প্রান্তে পড়িয়া থাকিলেও বীণার তা অবিদিত নয়!

এত চিন্তার তরঙ্গ ঠেলিয়া মন আবার ঐ চিঠির উপর নিজেকে সঁপিয়া দিল। যদি সে লেখে, আমি সলিলা,—তুমি আমার দাদু—তাহা হইলে অপরাধ হইবে? কিম্বা পাপ?

ও-সংসারের খানিকটা পরিচয় সে শুনিয়াছে সন্তোষের কাছে। শুনিয়াছে তারাচরণের বুকের একদিকে যেমন স্নেহের সমুদ্র, আর-এক দিকে তেমনি ভিসুভিয়াস অগ্নিগিরি! কুসুমের মতো যেমন তিনি মৃদু হইতে জানেন, তেমনি আবার বজ্রের মতো কঠিন হইতেও বাধে না!

সন্তোষ যখন ছোট ছিল, যে-বায়না ধরিত, বাপ সে-বায়না মিটাইতেন। মা সেজন্য রাগ করিতেন। তারাচরণ বলিতেন—কোন্ মুখে 'না' বলবো, বলো? দুটো মারা গিয়ে এখন ঐ একটিতে ঠেকেছে। ও-ও যদি চলে যায়?

মা বলিতেন,—যায় যদি, ভগবানের হাত...তুমি-আমি প্রাণ দিয়েও রাখতে পারবো না। কিন্তু থাকবে ভেবেই তাকে মানুষ করা চাই! আর সে জন্য ছেলেকে সব-তাতে অত প্রশ্রয় দিলে চলবে না। বেঁচে ওর মানুষ হাওয়া চাই, বাঁদর না হয়!...

সেই বাপ···এ-বিবাহে এত বড় নির্দ্দয়-অভিমান করিয়া বসিলেন! সন্তোষের এমন অপরাধ যে, তার মার্জ্জনা মিলিল না! সন্তোষেরও অভিমান হইয়াছিল। তার উপর মুখখানি মলিন করিয়া চারুলতা বলিত,—'আমি তোমার শনি···আমার জন্য রাজার ঐশ্বর্য্যে তুমি বঞ্চিত থাকবে!

সন্তোষ তাড়াতাড়ি চারুলতার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিত—না, খবর্দ্দার! ও-কথা তুমি বলো না…

এ-সব কথা বীণা শুনিয়াছে চারুলতার কাছে। বীণার মনে বড় কষ্ট হইত! সে ভাবিত, কেন এমন হয়! স্নেহ বর্ষণ করিতে বসিয়া মানুষ কেন দেনা-পাওনার হিসাব মিলাইতে চায়?

বেলা পড়িয়া আসিল। বীণার চিন্তার বিরাম নাই!

ক্ষীরোদাময়ী আসিয়া বলিলেন—ও মা! এখনো বঁসে আছিস্ গঁট্ হয়ে! আমি ভাবছিলুম, শরীর ভালো নয়, বুঝি ঘুমোচ্ছিস্!

বীণার চমক ভাঙ্গিল। বীণা বলিল—ঘুমোইনি মাসিমা। ভাবলুম, ঘুমোলে যদি জ্বর আসে!

ক্ষীরোদাময়ী আবার তার কপালে-গায়ে হাত দিলেন। গা যেন একটু গরম! বলিলেন—মাথা ধরেছে?

—না।

—তাহলে ওঠ্। একটু বরং ছাদে যা। বাতাস লাগলে শরীর সুস্থ বোধ করবি।

বীণা মনে মনে হাসিল। এ অসুস্থতা কেন…কোথায় এ অসুস্থতা—তুমি তার কি বুঝিবে, মাসিমা! সরলা নারী! জানো না, বীণা অহরহ দেখিতেছে তার চোখের সামনে দুস্তর মরুভূমি! সে মরুর কোনো দিকে এতটুকু তৃণ-পল্লবের চিহ্ন নাই!

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা বলিল,—গা ধুয়ে আসি। কাজ করতে করতে সেরে উঠবো'খন।

রাত্রে সকলে শয়ন করিলে বীণা চিঠি লিখিতে বসিল। মনকে সে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে! সন্তোষ, চারুলতা, সলিলা—তিন জনের উদ্দেশে নতি জানাইয়া, মার্জ্জনা চাহিয়া মনে মনে বলিল, কোনোদিকে উপায় না দেখিয়া এ ছলনা করিতে বসিয়াছি। তোমাদের কাহারো ক্ষতি নাই!···শুধু সলিলা, তোমার প্রাপ্য স্নেহটুকু চোরের মতো যদি অবলম্বন-স্বরূপ গ্রহণ করি, তুমি ক্ষমা করিয়ো বোন্! আমার ভূত-ভবিষ্যৎ ওখান হইতে সব তো তুমি দেখিতে পাইতেছ!

এ চিঠি পাইয়া লোক আসিবে! নিজের নাম মুছিয়া দিয়া সলিলা-নামে সে লোকের সঙ্গে বীণা···

বুকে মৃদু কাঁপন!

কিন্তু সে চিন্তা পরে। এখন···

বীণা চিঠি লিখিল। লিখিল,

শ্রীচরণেষু

দাদু

আপনার চিঠি পাইয়া কি আনন্দ পাইলাম, লিখিয়া জানাইতে পারি না।

আপনার শ্রীচরণ-সেবা করিব, এ সৌভাগ্য জীবনে মিলিবে ভাবি নাই!

আমাকে স্নেহ-ভরে ডাকিয়াছেন,—সে স্নেহের অমর্য্যাদা করিব, এমন-বংশে জন্ম নয়!

কবে লোক পাঠাইবেন, আগে লিখিয়া জানাইবেন। এখানে যাঁদের কাছে আছি, তাঁরা খুব স্নেহ করেন। আমি চলিয়া গেলে

তাঁরা খুবই ব্যথা পাইবেন। তাই তাঁদের কাছে এ কথা বলি নাই। না বলিলেই ভালো হয়! বলিলে তাঁরা কান্নাকাটি করিবেন— পাড়ার পাঁচজন আসিয়া জড়ো হইবে! হয়তো কত কথা বলিবে! সে সব আমার সহ্য হইবে না। মার ও বাবার নাম করিয়া যদি আমার ভাগ্যের সমালোচনা করে, তাহা হইলে আমার মনে বড় ব্যথা বাজিবে। সে সম্বন্ধে সাবধান হইতে চাই—তাই এ কথা লিখিলাম।

জানিনা এ-সব কথা লেখার জন্য আপনি রাগ করিবেন কি না! দেখা হইলে সব কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিব।

পত্রের উত্তরের আশায় রহিলাম।

আমার কোটী-কোটী প্রণাম জানিবেন। ইতি

আপনার স্নেহের

সলিলা

চিঠি লিখিয়া খামে ভরিয়া খামে ঠিকানা লিখিল ইংরেজীতে—

Sreejut Taracharan Roy...

এবং পরের দিন ভোরে বাড়ীর লোকের ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই বীণা নিজে গিয়া নিঃশব্দে এ-চিঠি ডাক্‌বাক্সে ফেলিয়া আসিল।

৩

ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলিয়া আসার পর হইতে বীণা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিল! কাহারো সামনে বাহির হইতে পারে না—গা ছম্-ছম্ করে! কেহ ডাকিলে বুকের মধ্যে যেন মেঘ ডাকিতে থাকে!

ভাবিতেছিল, কেন এ কাজ করিলাম! এত-বড় ছলনা···এমন পাপ······

যদি সেখান হইতে লোক আসে? যদি কেন,—নিশ্চয় আসিবে! চিঠির জবাবে যে-কথা লিখিয়াছে, সে লেখায় লোক আসা সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় নাই! আসিলে তখন···?

কি করিয়া ক্ষীরোদাময়ীর সাক্ষাতে সে-লোকের সঙ্গে দেখা করিবে? কি করিয়াই বা এখানে কোনো রকম প্রশ্ন না জাগাইয়া চলিয়া যাইবে? ক্ষীরোদাময়ী সে-লোকের মুখে তার আসার কারণ শুনিলে···

যে-লোক আসিবে, আসিয়াই এক-কথায় সে বীণাকে লইয়া যাইতে পারে না! জিনিষপত্র গোছগাছ করা আছে।···এবং সলিলার বা সলিলার মা-বাপের জিনিষপত্র ফেলিয়াও বীণা চলিয়া যাইতে পারে

না!···অথচ সেগুলা "লইতে" গেলে ক্ষীরোদাময়ী যদি কোনো প্রশ্ন করিয়া বসেন?

মন তার বেদনায় অস্থির হইয়া হায়-হায় করিতে লাগিল।

শ্রীপতির পীড়ন, অনির্দ্দিষ্ট-অন্ধকার ভবিষ্যৎ—এ-সবেও এক-রকমে তার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু এখন যদি তার এত-বড় ছলনার কথা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে এখানকার আশ্রয়টুকুও ভাঙ্গিয়া যাইবে! সকলে ধিক্কার বাণে বিঁধিয়া তাকে জর্জ্জরিত করিবে! এবং সে-ধিক্কার একটুও অনুচিত হইবে না!

ভাবিতেছিল, কোনোমতে যদি নিঃশব্দে চলিয়া যাইতে পারে, সেখানে কি করিয়া সামঞ্জস্য রাখিবে? বড় মানুষের বাড়ী—কত লোক সে-বাড়ীতে বাস করে। সকলের সন্দেহ এড়াইয়া সকলের চোখে ধুলা দিয়া সলিলার আসনটিতে সলিলা সাজিয়া বসিতে কত দিকে যে চাড় পড়িবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই······

কেন···কেন··কেন তার এমন দুর্ম্মতি হইল? এ কাজ সে কেন করিল?

বই পড়িয়া সংসারের কাজ লইয়া বীণা সেদিন নিজেকে সারাক্ষণ সকলের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিল।

ও-ঘর হইতে ক্ষীরোদাময়ী ডাকিলেন,—হ্যাঁ রে পিণ্টু···

পিণ্টু বলিল,—কেন মা?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—বীণা কোথায় গেল রে? তোর বীণাদি?

পিণ্টু বলিল,—ছাদের সিঁড়িতে বসে লেশ বুনছে।

—ও···তাকে একবার ডেকে দে তো···

পিণ্টু ডাকিল,—বীণাদি···

কথাগুলা সবই বীণার কাণে গিয়াছিল। পিণ্টুর আহ্বানে কণ্ঠকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও সরল করিয়া সে সাড়া দিল, বলিল,—কি ভাই-পিণ্টু?

পিণ্টু বলিল,—মা তোমাকে ডাকছে।

নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত-সংযত করিয়া বীণা আসিয়া দাঁড়াইল ক্ষীরোদাময়ীর সামনে। কহিল—ডাকছো মাসিমা?

ক্ষীরোদাময়ী কহিলেন,—হ্যাঁ। তোর কাতুমাসির ছেলের পৈতে রে পরশু। আজ রাত্রে ওদের ওখানে আমাকে গিয়ে থাকতে বলেছে। কাজ করতে হবে।

বীণার বুকে স্বস্তির নিশ্বাস বহিল। ভাবিল, মা-অন্নপূর্ণা তার মনের কাতরতা বুঝিয়াছেন!

বীণা বলিল,—তা আমাকে কি করতে হবে?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—তোরা চার-ভাই-বোনে একা থাকতে পারবি? ভয় করবে না?

বীণার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বুক চিরিয়া একটা প্রশ্ন উঠিয়া কণ্ঠতালুতে সংলগ্ন রহিয়া গেল, বাহির হইতে পারিল না।

কোনোমতে গলাকে সহজ করিয়া লইয়া বীণা কহিল,—ভয় কেন করবে, মাসিমা?···বলিয়া পিণ্টুর পানে চাহিল। কহিল,—কি রে পিণ্টু?

পিণ্টু বলিল,—ও বাবা, আমরা চার জনে একলা একলা থাকবো!··· বীণাদি তো ছেলেমানুষ···আমাদের ভয় করে যদি?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—কিসের ভয় রে? বেটা-ছেলে···ভয় করবে বলতে লজ্জা হচ্ছে না?

পিণ্টু বলিল,—হ্যাঁ···তোমার সিণ্টুকে জিজ্ঞাসা করো···একদিন ও যা করেছিল! তুমি সেদিন মন্দিরে গিয়েছিলে নন্কুদার মার সঙ্গে···রাত তখন ন'টা···ও একেবারে ভয়ে যে-কীর্ত্তি করলে···মনে নেই ভাই বীণাদি?

বীণা বলিল,—না মাসিমা, ভয় করবে না। আমি ওদের আগ্‌লে নিয়ে থাকবো।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—আমি যাবো সেই রাত নটার পর তোমাদের খাইয়ে-দাইয়ে, তবে···

বীণা বলিল,—তুমি যেয়ো···

পিণ্টু বলিল,—সেখানে তুমি ক'দিন থাকবে?

হাসিয়া ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—ক'দিন কি রে! শুধু আজ রাত্তিরটা! কাল সকালেই আস্‌বো। মানে, কাজে-কর্ম্মে বেশী রাত হবে কি না···তাই ওদের ওখানে থেকে তার পর সকালে ফিরে তোদের রান্না-বান্না করবো। শুধু ঐ রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া! কালও হয়তো রাত্রে ওদের ওখানে থাকতে হবে···পরশু যজ্ঞি··

বীণা মনে-মনে দিন গণিল। সে-চিঠি কাল গিয়া কলিকাতায় পৌঁছিবে! তাঁরা যদি কালই সে চিঠির জবাব দেন, নিশ্চয় সে জবাব আসিবে পরশু···তার পর লোক আসিবে। বীণা যদি লিখিয়া দিত, তার চিঠি পাইবামাত্র লোক পাঠাইবেন; তাহা হইলে পরশুই লোক আসিত···মাসিমা থাকিবে কাতু-মাসির বাড়ী···নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার চমৎকার ব্যবস্থা হইত!

কিন্তু সে তো জানিত না···

এখন. মা-অন্নপূর্ণা যখন এটুকু করিয়া দিয়াছেন—দয়া করিয়া যদি লোক আসার দিনেও এমনি একটা সুব্যবস্থা···

রাত্রে ক্ষীরোদাময়ী চলিয়া গেলে পিণ্টু-সিণ্টুদের লইয়া বীণা গল্প বলিতেছিল···রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্প !

কিন্তু গল্পের রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া তার নিরুদ্দেশ-যাত্রা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিন-ভাই ঘুমে অচেতন হইয়া বীণাকে ছুটী দিল।

বীণা একা···চোখে ঘুমের ছায়াও নাই ! রাত্রির নিঃশব্দতায় বুকের মধ্যে আবার সেই দুশ্চিন্তা উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেল হইয়া উঠিল···

কেবলই মনে হইতেছিল, সাধ করিয়া এ অস্বস্তি কেন কিনিলাম! ইহার চেয়ে···

মনের এ উদ্বেগ-মোচনের জন্য বীণা একখানা বাঙলা নভেল খুলিয়া বসিল।

মন কিছুতে নভেলে বসিতে চায় না ! জোর করিয়া মনকে চাপিয়া-ধরিয়া বইয়ের পাতায় যত গুঁজিয়া ধরে, মন ততই হাতের ফাঁক বহিয়া চিন্তার তরঙ্গ তুলিয়া সেই চিঠির পিছনে ভাসিয়া চলে !···

সকালে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র আবার সেই চিন্তা···

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—তোকেও আজ নিয়ে যাবো, বীণা। ওর অনেক করে বলে দেছে। মানে, ঘটার পৈতে! লোকজনকে কাপড়ই

দিচ্ছে অমন থান-পঞ্চাশ···সে সব কাপড় রঙ করতে হবে! বলেছে, বীণাকে নিয়ে এসো, দিদি...

আবার এ কি নূতন সঙ্কট, ভগবান!

আজ না হয় গেল। কিন্তু কালও যদি যাইতে হয়? সে ও-বাড়ীতে থাকিবে, তখন যদি কলিকাতার চিঠি আসে?···এত শীঘ্র চিঠি আসিবে?

জবাব না আসিয়া সেখান হইতে সশরীরে লোক আসিয়া যদি উদয় হয়?

বীণা চট্‌ করিয়া ক্ষীরোদাময়ীকে কোনো জবাব দিতে পারিল না।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—কিরে যাবি তো?

সসঙ্কোচে বীণা বলিল—সব্বাই যাবো মাসিমা, বাড়ীঘর ফেলে?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—সকালে আসবার সময় আমার দুটি হাত ধরে অনেক করে বলে দেছে!

বীণা কহিল—বাড়ী-ঘর?

একরাত্রির সমাদরে ক্ষীরোদাময়ীর মন তখনো ভরিয়া আছে। কাত্যায়নী দেবী এবং মেয়ে জ্যোতি কাছে বসিয়া ক্ষীরোদাময়ীকে খাওয়াইয়াছেন—লুচির গোছা, বেগুন-ভাজা, দই, সন্দেশ, রাবড়ি··· কাজেই তাঁর সে ভরাট-মনে নিজের বাড়ী-ঘরের কথা ঘেঁষিতে পারিল না! বীণার ছোট-প্রতিবাদে ক্ষীরোদাময়ী কেমন অস্বস্তি বোধ করিলেন—

তিনি বলিলেন,—বাড়ী-ঘরে কি এমন দুশো-পঞ্চাশ-টাকা দামের হীরে-মোতি, জড়োয়া, না মোহর ছড়াছড়ি য়াচ্ছে যে, সে-সবের চৌকিদারী করতে হবে!

বীণা বলিল—পিণ্টু-মিণ্টুরা একা থাকবে ?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—কেন, ওদের খাইয়ে-দাইয়ে দেবো। ওরা স্কুলে যাবে। তুইও ওদের সঙ্গে খেয়ে নিবি। নিয়ে দোরে তালা লাগিয়ে দু'জনে যাবো'খন!···আজ না যাস্, কাল তো সেই সকাল হলেই গুষ্ঠীশুদ্ধ যেতে হবে। কাজের বাড়ী! কাজের কি-সীমা পরিসীমা আছে রে···

উপায় নাই!

তবু এতখানি নিরুপায়ের মধ্যেও একটু ক্ষীণ আশা—কাল যদি চিঠি আসে···এক-সময় ওবাড়ীর গোলমালের মধ্যে ফাঁক পাইলেই বীণা এখানে আসিবে···

চিঠি আসিতে সেই বেলা একটা-দুটো। সেই সময়েই ডাকওয়ালা এ পাড়ায় আসে। বীণার সে খপর জানা আছে।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন--তাহ'লে নে সকাল-সকাল চান-টান সেরে ছেলেদের সঙ্গে খেয়ে নিয়ে তৈরী হবি। আমি চান করতে চললুম... তুই মা কোনোমতে গোটা-চারেক আলু ছাড়িয়ে দে, আর সেই সঙ্গে একটা ঝোলের আনাজ!···ভাতে-ভাত আর ঝোল—এই দিয়ে তোদের এবেলার খাওয়া হয়ে যাবে'খন। ওবেলায় ওদের ওখানে কত কি খাবি···তোর কাতুমাসী বলে দেছে।

কথাটা শেষ করিয়া গামছা আর ঘটী লইয়া ক্ষীরোদাময়ী গঙ্গায় স্নান করিতে বাহির হইলেন।

বীণা বসিল আনাজ-তরকারী লইয়া··

পাশের ঘরে পিণ্টু-মিণ্টু সিণ্টু উচ্চ রব তুলিয়া পড়া করিতেছিল

তাদের সে মিশ্র কলরবের উপর দিয়া বীণা তার মনকে আবার ছুটাইয়া দিল চিঠির পিছনে…

সহর কলিকাতা! সেখানকার কথা আবছায়ার মতো মনে পড়ে …কবে সেই ছোটবেলায় একবার গিয়াছিল! বড় বড় পথ…সে-পথের দু'ধারে সার-সার বাড়ী…কোনোটা এত উর্দ্ধে মাথা তুলিয়াছে যে আকাশ দেখা যায় না। কোনো পথে মস্ত-উঁচু কল সে কলের কালো ধোঁয়ায় চারিদিক যেন কালি-মাখা! পথে লোকজন গাড়ীঘোড়ার কি ভিড়… লোকের হট্টগোল সারাক্ষণ আকাশ-বাতাস ভরিয়া আছে! তার পর গঙ্গা! গঙ্গার জলে নৌকা আর ষ্টীমার গিশ্ গিশ্ করিতেছে! গঙ্গার বুকে মস্ত পুল…

তার ছোট চিঠিখানি ঐ ভিড়ের মধ্যে দিয়া ডাকওয়ালার ব্যাগে চড়িয়া গিয়া পৌঁছিবে…

প্রকাণ্ড রাজপুরী! সে পুরীতে কত লোক—দরোয়ান চাকর, দাসী-পাচক, সরকার-গোমস্তা—তাদের সকলকে ছাড়িয়া চিঠি গিয়া উঠিবে সলিলার বৃদ্ধ পিতামহ তারাচরণ রায়ের হাতে!

চিঠি পড়িয়া তিনি…

উত্তেজনা-বশে বীণার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আলু ফশকাইয়া বঁটির ধারে হাত কাটিল।

ঝর-ঝর রক্তধারা! বীণার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী লালে লাল হইয়া গেল!

সামনে ছিল জলের গামলা, বীণা সেই গামলায় হাত ডুবাইল।



এখানকার কাজ সারিয়া ক্ষীরোদাময়ীর সঙ্গে বীণা যখন কাতু-মাসীর বাড়ী গিয়ে পৌঁছিল, বেলা তখন প্রায় এগারোটা।

গরীবের ঘরের ডাগর-মেয়েকে কাজের বাড়ীতে পাইলে সুগৃহিণীরা তখনি তাকে মাথায় তোলেন। বীণা আসিবামাত্র কাত্যায়নী দেবী তাকে মাথায় তুলিলেন। বলিলেন,—তোর জন্যই পথ চেয়ে আছি মা।... চ'মা, ও-ঘরে মাটীর গামলা আছে...চাকরদের বল্, তারা জল দেবে, রঙ গুলে দেবে। তুই মা কাপড়গুলো রঙে ফেলে শুধু দেখে নিবি, সব-জায়গায় রঙ যেন ঠিক সমান ধরে! চাকরদের দিলে ওরা ফাঁকি দেবে তো...তার পর কাপড় ছোপানো হলে দু'টি খেয়ে নিস্। খাবার পর তোর হাতে অনেক কাজ দেবো!

তাঁর কথায় সায় দিয়া কাজে লাগিল।

বেলা প্রায় দু'টার সময় আহারের ডাক পড়িল। কাটা আঙুল

তবু সেই আঙুল লইয়া রঙের গামলায় হাত ডুবাইয়া বীণা দু'হাত একেবারে রাঙাইয়া তুলিয়াছে...

কাত্যায়নী দেবীর বিধবা মেয়ে জ্যোতি আসিয়া বলিল,—খাবি আয় বীণা।...মার বেশ আক্কেল! সকলের খাওয়া হয়ে গেল, তোকে এখানে একধারে রঙের গামলার মধ্যে চুবিয়ে রেখেছে! ভাগ্যিস খোঁজ পড়লো! আয়, আয়...

জ্যোতি তাকে এক-রকম টানিয়া বাহিরে আনিল। সাবান দিল, গামছা দিল, দিয়া বলিল—বেশ করে হাত ধুয়ে ফ্যাল্। ফেলে আয়, আমারো খেতে বাকী—এক সঙ্গে বসবো'খন। আমার ননদ এসেছে। তারো খাওয়া বাকী।

জ্যোতির ননদ বিজয়া। কলিকাতায় বেশ বড় ঘরে তার বিবাহ হইয়াছে। স্বামী হাইকোর্টে ওকালতি করে। বিজয়া মানুষটি খুব ভালো। শান্ত প্রকৃতি। পাঁচজনের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে, এবং সে মিশ্-খাওয়ার মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা থাকে না।

খাইতে বসিয়া বিজয়া বীণাকে দেখিল। দেখিয়া ভালো লাগিল। মেয়েটি দেখিতে বেশ! জ্যোতিকে বলিল—এ মেয়েটি কে ভাই বৌদি?

জ্যোতি পরিচয় দিল, দিয়া বলিল—কেউ নেই...আহা, বড় গরীব। ভাগ্যে ক্ষীরো-মাসিমা আশ্রয় দেছে—বীণা বড় ভালো মেয়ে, ভাই-ঠাকুরঝি!

বিজয়া বলিল—বামুন?

হাসিয়া জ্যোতি বলিল—খুব বুদ্ধি তো তোমার! বামুন না হলে একসঙ্গে সকলে মিলে খেতে বসেছি!

বিজয়া অপ্রতিভ হইল, বলিল--সত্যি···আমি ভাই ভারী বোকা। সকলের মুখে চিরদিন এ-কথা শুনে আসছি। বুদ্ধি আমার আর কখনো হবে না...

বিজয়ার এ-হাসি, এ-কথা বীণার বড় ভালো লাগিল।

বিজয়া বলিল—বিয়ের কথা কোথাও হচ্ছে?

জ্যোতি কহিল—না। কি করে হবে? ক্ষীরো মাসিমার তো ঐ অবস্থা!···হ্যাখোনা তোমরা কলকাতায় থাকো···একটি সুপাত্র দেখে দাও ভাই ঠাকুরঝি···সত্যি! কি উপকার যে তাহলে করবে...বীণার ইহজন্মটাই বুঝি তুমি তাহলে গড়ে দেবে!

বিজয়া ভাল করিয়া বীণাকে দেখিল···দেখিয়া বলিল,—মেয়েটি দেখতে বেশ···আহা-মরি না হলেও যেখানে দাঁড়াবে বা বসবে, পাঁচজনকে চোখ তুলে ওর পানে চেয়ে দেখতেই হবে!···তা দেবেন ওঁরা বিয়ে?

জ্যোতি বলিল--পাত্র আছে?

বিজয়া বলিল—আছে। তোমার ঠাকুর-জামাইয়েরই এক বন্ধু... বেশ দিল্-খোলশা ভদ্রলোক। বয়সে ওঁর চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হবে তো বড় নয়। পয়সা-কড়ি আছে। সংসারে এক বিধবা মা, আর একটি বিধবা বোন। ছেলের নাম ধরণীধর চাটুয্যে।

জ্যোতি বলিল—বড্ড সেকেলে নাম, ভাই!

হাসিয়া বিজয়া বলিল,—নাম সেকেলে হলে কি হবে, মানুষটি কিন্তু খুব একেলে! গান-বাজনা জানে, শীকার করতে বেরোয়, ফটো তোলে···

জ্যোতি বলিল—এ্যাদ্দিন বিয়ে হয়নি কেন ?

বিজয়া বলিল—বলে, অবসর কৈ ? মা কত দুঃখ করেন। তোমার ঠাকুর-জামাইকে কতবার বলেছেন, ধরে-কয়ে ওর বিয়েটা তোমরা দিয়ে দাও···তোমরা হলে বন্ধু···

জ্যোতি বলিল,—তাতে কি বলে ?

বিজয়া বলিল,—বলে, ব্যস্ত কেন ? আমাকে বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের মালিক বিধাতা···মানুষের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় এ তিনটি জিনিষ হতে পারে না···

হাসিয়া জ্যোতি বলিল—ভারী মজার মানুষ তো !

বিজয়া বলিল—হ্যাঁ।···আচ্ছা, এবারে আমি ফিরে গিয়ে ওঁকে ধরবো। বলবো, তোমার বন্ধুর জন্য পাত্রী ঠিক করে এসেছি···খুব ভালো পাত্রী··· কিন্তু তাহলে তোমাদের বীণার সঙ্গে ভাব করতে হয়! ভাব হলে পাঁচটা গুণের কথা তবে তো গিয়ে বলতে পারবো। ধরণী বাবুকেও লোভ দেখাতে পারবো !

জ্যোতি বলিল,—বেশ তো, খাওয়া হলে বীণাকে নিয়ে কাজে লেগো···পাণ-টাণ সাজা আছে···ও-বেলায় মা ছোটখাট যজ্ঞির ব্যবস্থা করেছে...

৫

কথায় কথায় বেলা কাটিয়া গেল।

ক্ষীরোদাময়ী আসিয়া বলিলেন,—একবার বাড়ী যা মা বীণা···ছেলে তিনটে ফিরে সেখানে কি করছে, কে জানে!...তা কাতুর হুঁশ্ আছে রে,—চাড় করে চারটের সময় সে তাদের জন্য জলখাবার পাঠিয়ে দেছে··· লুচি, বেগুন-ভাজা, দই, সন্দেশ। তবু তুই একবার যা মা। ওদের নিয়ে এখানে আসিস্। আর নিজে পাট ভেঙ্গে একখানা ফর্শা সাড়ী পরে আসবি, বুঝলি!

হাসিয়া জ্যোতি বলিল,—ফর্শা কাপড় পরে না এলে নেমন্তন্ন খেতে পাবে না মাসিমা, না?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—তা নয় মা। পাঁচজন আসবে, নেহাৎ দুঃখী-কাঙালীর মতো আধ-ময়লা পরে থাকবে!...আইবুড়ো মেয়ে··· বাবা বিশ্বনাথের আশীর্ব্বাদে যদি কারো চোখে পড়ে, হিল্লে হয়ে যেতে পারে!

জ্যোতি বলিল,···হিল্লে এক-রকম হয়েছে মাসিমা। আর তা ঐ আধ-ময়লা কাপড়েই!

ক্ষীরোদাময়ীর চোখদুটো যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইবে!...তিনি বলিলেন,—তার মানে?

জ্যোতি বলিল,—আমার ননদ এসেছে না? ওর শাশুড়ী কাশীতে আছেন। কাজেই এ-বাড়ীতে ঠাকুরঝি আজ নেমন্তন্ন এসেছে। তার সঙ্গে তোমার বীণার ভাব হয়েছে। বীণাকে তার খুব ভালো লেগেছে। ওর শ্বশুর বাড়ী কলকাতায়। ও বলছে, ওর জানা একটি ভালো পাত্র আছে...তারা পয়সা-কড়ি চায় না...চায় শুধু আসল জিনিষ—মানে, একটি ভালো মেয়ে...

প্রচুর বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—সত্যি?

জ্যোতি বলিল—সত্যি নয়তো কি তোমার সঙ্গে আমি এ-কথা নিয়ে তামাসা করছি মাসিমা?

ক্ষীরোদাময়ীর মন আশ্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—তোমার ননদের হাতের নো সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক্ মা...তাই করে দিক্!...ওর কথা যখন ভাবি, সত্যি, তখন আমি কি যে হয়ে যাই...

বীণা বাড়ী আসিল এবং তার বিলম্ব করা চলিল না। তাড়াতাড়ি ক্ষীরোদাময়ীর তিন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কাজের বাড়ীতে ফিরিল। ফিরিয়া দেখে, বিজয়া চলিয়া গিয়াছে। কুটুম্ব-গৃহে দু-বেলা পাত পাড়িবার জন্য পড়িয়া-থাকা বিজয়ার শাশুড়ীর সম্মানে বাধে—তাই তিনি বধূকে লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁর কোদাইচৌকীর বাসায় চলিয়া গিয়াছেন।

সে রাত্রিটাও বীণার আতঙ্কে কাটিল।

পরের দিনও মনে চাঞ্চল্যের সীমা নাই। সে চাঞ্চল্য সে কখনো

স্তোক দিয়া রোখে, কিসের ভয়! মাসিমা আজ এ বাড়ীতে থাকিবে না! কেহ থাকিবে না···ডাকওয়ালা যে-সময় এ পথে আসে, তখন যেমন করিয়া পারে, বীণা এখানে চলিয়া আসিবে! তার পর চিঠি আসিলে···

সেদিন কিন্তু চিঠি আসিল না। বীণার উদ্বেগ বাড়িল। পরের দিন তার ভাগ্যে না জানি কি ঘটিবে!

কাতু মাসিমা ছাড়িলেন না। ক্ষীরোদাময়ীকে সগোষ্ঠী এখানে নিমন্ত্রণের পাশে আবদ্ধ রাখিলেন। বীণাকেও দু'চারিটা কাজ দিয়া আটক করিলেন···

কাজকে বীণা ভয় করে না। কিন্তু চিঠি কাল আসে নাই, আজ নিশ্চয় আসিবে!

অসুস্থতার ভাণ করিয়া দুপুরবেলায় বীণা একবার বাড়ী আসিল।

আসিয়া দেখে, চিঠি আসিয়াছে! সেই একই হাতের লেখা। খামের মধ্যে না জানি কি আছে···

খাম ছিঁড়িল। ছোট চিঠি। লেখা আছে—

প্রাণাধিকাসু

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বিলম্ব করা উচিত নয়। লোক পাঠাইতেছি। নাম তিনকড়ি গাঙ্গুলি। আমার খুব বিশ্বাসী। অনেক দিন আমার কাছে আছে। বুড়ো মানুষ। তোমার বাবাকে একদিন কোলে-পিঠে করিয়াছে!

তিনকড়ির একটি মেয়ে থাকে চুণারে। চুণারে মেয়ের সঙ্গে দেখা করিয়া সে তোমার কাছে যাইবে।

যাঁরা তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া তাঁহাদের খুসী করিয়া তোমাকে সে আমার কাছে আনিবে। তিনকড়ির কাছে টাকা-কড়ি দিয়াছি। যাহা উচিত মনে করো, অসঙ্কোচে তিনকড়িকে বলিবে,—তিনকড়ি তাঁদের টাকা দিবে।

তাঁদের ঋণ টাকায় শোধ হয় না, জানি। তবু লৌকিক একটা রীতি মানিয়া তাঁদের কিছু অর্থ দেওয়া উচিত মনে করি। তাঁদের অবস্থাও শুনিয়াছি তেমন ভালো নয়।

তোমার জন্য এখানে বসিয়া এখন প্রহর গণিব। ভগবান যে তোমাকে আনিবার সুযোগ আমাকে দিয়াছেন, এ তাঁর কতখানি দয়া, মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝিতেছি!

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

শুভার্থী

দাদু

কি মন-গলানো চিঠি! প্রত্যেকটি কথায় প্রাণের কি অজস্র স্নেহ মাখানো রহিয়াছে!

বুকের উপর কে যেন পাথর ছুড়িয়া মারিল! সে আঘাতে তার দু'চোখে জল···সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক অস্পষ্টতায় ঢাকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

সলিলা কেন চলিয়া গেল? তার বদলে যদি বীণা যাইত! আহা, এই চিঠি! এমন অধীর আকুল স্নেহ! কি বলিয়া এ-বস্তু সে চুরি করিতে চলিয়াছে!

বুকের মধ্যে কে যেন বার-বার বলিতে লাগিল, যেটুকু অপরাধ

করিয়াছিস, তার বেশী আর নয়! অপরাধের ভার আর এতটুকু বাড়াস্‌নে! তিনকড়ি বাবু আসিতেছেন…তাঁর কাছে স্পষ্ট ভাষায় বল্‌—কোথায় সলিলা? সে নাই!

যদি বলে, ও চিঠি তবে…?

ভয় কি! বলিস, ও চিঠি কে লিখিয়াছে, আমি জানি না।

সব মেঘ কাটিয়া যাইবে! তোর আকাশে যদি স্নিগ্ধ রৌদ্র না পাস্‌, তবু সারা জীবন এমন কালো মেঘে আঁধার হইয়া থাকিবে না!

একা সে এ-গৃহে থাকিতে পারিল না। চারিদিকে কারা যেন ছায়ার মতো ঘুরিতেছে…কারা যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া তারি পানে চাহিয়া আছে… যেন তারা দেখিতে চায়, বীণার এ দুঃসাহস কোথায় গিয়া দাঁড়ায়…

পাশের বাড়ীতে কে উচ্চ হাস্য করিল। বীণা কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ও বুঝি এই কাশী-পুণ্যতীর্থে শিবের কোনো অনুচর!

শ্রীপতির কথা মনে জাগিল! শ্রীপতিকে ঘৃণা করে…সে ঘৃণা কেন? দুষ্ট অভিসন্ধি খাটাইয়া পয়সা রোজগার করিতে চায় বলিয়া!… আর বীণা নিজে? তার এ ছলনা…

বুকখানা যেন ফাটিয়া চূর্ণ হইবে—এমন ব্যাপার! তাড়াতাড়ি দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া বীণা বাহির হইয়া পড়িল।

খানিকটা পথ আসিবার পর মনে হইল, চুণার হইতে যদি সে ভদ্রলোক আসেন?…

বাড়ীর পাশে মহাদেও মুদির দোকান। বীণা আসিয়া মহাদেওকে বলিল,—বাড়ীতে কেহ রহিল না, যদি কোনো বুড়া ভদ্রলোক আসেন, বীণাকে য়েন বেণী বাবুর বাড়ী ওপর ভায়…

মহাদেও বলিল,—বাড়ীর উপর সে নজর রাখিবে এবং কোনো ভদ্দর-আদমি আসিলে…

এ-বাড়ীতে যেন কুরুক্ষেত্র ব্যাপার! লোকের ভিড়, কাজের কলরব …তবু মনের উপরে সেই চিঠি আর তিনকড়ি গাঙ্গুলি!

ক'দিন ভোজের সমারোহ চলিয়াছে। ক্ষীরোদাময়ী এ গৃহের বিশেষ অনুগৃহীতা এবং গৃহিণীর একান্ত অনুগতা। কাজেই এ ক'দিন এ-বাড়ীর চৌকাঠ পার হইয়া তিনি আর পথে পা দিতে পারিলেন না!

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। জ্যোতির ঘরে বসিয়া বিজয়া বীণার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল।

ক্ষীরোদাময়ী আসিয়া কহিলেন,—এই যে বীণা…

বীণা চমকাইয়া উঠিল! বিজয়া বলিল,—আবার নড়ে!

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—ওন্ তা শোন্ মা, কে নাকি ভদ্দরলোক এসেছে বাড়ীতে। মহাদেওয়ের বৌ বলতে এসেছে। তাঁকে তাদের দোকানে বসিয়ে রেখেছে। তা আমি তো যেতে পারবো না, মা। আমার বলে, মরবার ফুরসৎ নেই! এদের দেহাতের যত লোক এসেছে, তাদের খাওয়াতে হবে। তোর মাসিমা বলছে, তোমার গেলে চলবে না ভাই…এক-মিনিটের জন্য না!—তা তুই একবার যা মা, ছুটে যা। কে ভদ্দরলোক এলো, জেনে আয়। আর পারিস তো জেনে আসিস, কি চায়, কেন এসেছে।

বুঝিতে বীণার কিছু বাকি ছিল না! নিশ্চয় সেই তিনকড়ি

গাঙ্গুলি! খুব বাঁচিয়া গিয়াছে! ভাগ্যে মাসিমার যাইবার উপায় নাই! তাড়াতাড়ি সে বলিল,—আমি এখনি যাচ্ছি মাসিমা। তোমাকে ভাবতে হবে না।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—যদি কোনো আপনার জন হয়, আর থাকতে চায়—তাহলে তার খাওয়া-দাওয়া...সে যে মুস্কিলের কথা!

জ্যোতি বলিল,—কিসের মুস্কিল মাসিমা? তোমার খুব আপন-জন হন যদি, বীণা তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে। এ বাড়ী তো তোমার পরের বাড়ী নয়!

ক্ষীরোদাময়ী যেন অকূলে কূল পাইলেন! বলিলেন,—না, পরের বাড়ী নয়। তবে কে লোক, কেমন লোক···

জ্যোতি বলিল,—বীণা নিয়ে আসবে'খন। তাতে হবে না?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—কি জানি মা! আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তা বীণা, যা মা···কথাবার্ত্তা কয়ে যা ভালো বুঝবি, করবি। বুঝলি!

যাইতে পাইলে বীণা বাঁচে! তাড়াতাড়ি বলিল,—বুঝেছি মাসিমা।

কোনোমতে খোঁপার পাট সারা হইবামাত্র বীণা এক-মুহূর্ত্ত বসিল না; গৃহাভিমুখে ছুটিল।

দ্বারের তালা খুলিয়া ঘরে দীপ জ্বালিয়া বীণা আসিল মহাদেওয়ের দোকানে; ডাকিল—মহাদেও...

মহাদেও কহিল,—এই যে দিদিমণি, এই সে বাবু...

বীণার বুকের উপর দিয়া যেন কামানের গাড়ী চলিয়া গেল। বুকখানা বাঁকিয়া দুমড়াইয়া...

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বেশ সাদাসিধা। বীণা কহিল,—আপনি এসেছেন কলকাতা থেকে? আপনি তিনকড়ি বাবু?

তিনকড়ি গাঙ্গুলি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন,—হ্যাঁ দিদি...

এখানে কোনো কথা নয়! এতটুকু ইঙ্গিত পর্য্যন্ত না!

বীণা বলিল,—আসুন...

ভদ্রলোক বীণার সঙ্গে আসিলেন।

ঘরে ঢুকিয়া চারিদিকে চাহিলেন। তার পর অবিচল দৃষ্টিতে বীণার পানে চাহিয়া রহিলেন। সে দৃষ্টির সামনে বীণা একেবারে এতটুকু হইয়া গেল! তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বেতস-লতার মতো থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে!

৬

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—এই ঘরেই সন্তু...

তাঁর কথা শেষ হইল না।

সে কথায় বীণার চোখের সামনে সন্তোষের সৌম্য মূর্ত্তি চকিতে যেন জীবন্ত-জাগ্রত হইয়া দেখা দিল! বীণা চক্ষু মুদিল।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—সন্তুর ফটোগ্রাফ আছে?

বীণা বলিল,—আছে।

—বৌমার?

বীণা কহিল,—আছে।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—নিশ্চিহ্ন হয়নি তাহলে! কর্ত্তা বলছিলেন কি না! বলছিলেন, যদি ছবি থাকে, তাহলে চোখের সামনে রাখতে পারবো তবু...যে কটা দিন আর আছি!

বীণার গায়ে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ-রেখা! বুকে আতঙ্ক জমাট হইয়া উঠিতেছিল। মন বলিতেছিল, এখনো সময় আছে! উঁহাদের মনের এতখানি আকুল অধীর কামনা...মিথ্যা দিয়া তাহা পূর্ণ করিস্ নে!...

বীণা কোনো জবাব দিল না, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দু'চোখের দৃষ্টিতে দ্বিধা-ভয়-সংশয়!

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—আমরা ওঁকে চিরদিন বলেছি, কার উপর এ-রাগ এ-অভিমান করছেন? আপনার অমত আর আপত্তিই বড় হয়ে থাকবে? স্নেহকে পায়ে চেপে পিষে ফেলবেন? তা কর্ত্তার মন খুব ভালো...সব গোলযোগ কোন্‌কালে মিটে যেতো, এমন করে' বেঘোরে এঁদেরো প্রাণগুলো নষ্ট হতো না, তোমাকেও এ-দুর্ভোগ সইতে হতো না দিদি কিন্তু!...

তিনকড়ি গাঙ্গুলির কথার স্বর সহসা অতি মৃদু হইয়া থামিয়া গেল। তিনি চারিদিকে চাহিলেন। যেন দেখিয়া লইলেন, তাঁর কথার শেষটুকু শুনিবার জন্য অলক্ষ্যে কেহ দাঁড়াইয়া আছে কি না!

বীণার মনে ক্ষণে-ক্ষণে চেতনা জাগিতেছিল, আবার তখনি মিলাইয়া যাইতেছিল! কথাগুলা কাণে আসিয়া লাগিতেছে...কিন্তু সব কথা মনে গিয়া পৌঁছিতেছে কি না, বলা কঠিন! বীণার মনে শুধুই ভয়··

সহসা কি খেয়ালের বশে, কি দুরাশায় মাতিয়া চিঠি লিখিয়া ডাকে দিয়াছে...তারপর আজ সে-চিঠি লইয়া চরম পরীক্ষার ক্ষণ আসিয়া উদয় হইয়াছে! মাসিমা তবু বাড়ী নাই, মিণ্টু-পিণ্টু-সিণ্টুও নাই! তারা এখন এ-বাড়ীতে থাকিলে কি যে হইত...

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তুমি বাড়ীর মেয়ে...বাড়ীতে চলেছো... সবই জানতে পারবে দিদি! তবে সেখানে পৌঁছুবার আগে জেনে রাখলে সাবধান হতে পারবে এবং অনেক আঘাত থেকে মনকে নিরাময় রাখতে পারবে!

বীণা এ-কথা শুনিল···শুনিয়া বুঝিল, সেখানে তারাচরণ রায়ের অজস্র স্নেহ-সমুদ্রে এমন-কিছু আছে··· .

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তোমাদের এক পিশিমা আছেন··· কর্ত্তার বৈমাত্রেয় বোনের মেয়ে। তিনি আছেন, তাঁর এক ছেলে আছেন, মেয়ে আছেন। মেয়ের এখনো বিয়ে হয় নি—বয়সে তোমার চেয়ে বড় বৈ ছোট হবে না। ছেলের বিয়ে হয়েছে। তাঁরাই সংসারটিকে জুড়ে আছেন কি না! পিশিমার এতে কিছু স্বার্থও আছে। পুরুষ-মানুষের কাণের কাছে দিবারাত্র যদি কেউ কারো নামে লাগানি-ভাঙ্গানির কথা তোলে, পুরুষ-মানুষের মনে তাহলে মন বলে' কোনো পদার্থ থাকে না! তুমি ছেলেমানুষ এ-সব বুঝতে না পারলেও সংসারে আমরা অনেক দেখেছি-শুনেছি, আমরা তো বুঝি!

সংক্ষেপে সেখানকার অন্তর্বিদ্বেষের পরিচয়টুকু দিয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি আবার চুপ করিলেন। তার পর চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন—কিন্তু এ বাড়ীতে কাকেও তো দেখছি না! মানে, যাঁদের কাছে তুমি আছো!

কথাটা বলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনকড়ি গাঙ্গুলি চাহিলেন বীণার পানে। সে-দৃষ্টি বীণার দেহে-মনে বিঁধিল চিকিৎসকের ধারালো লান্সেটের মতো।

এবার আর বীণার চুপ করিয়া থাকা চলে না! দ্বিধা-ভয়-সংশয় ঠেলিয়া একটা কিছু বাছিয়া লইতে হয়! হয় এ-দুরাশা ত্যাগ করা,··· না হয় যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছে, পাগলের মতো চোখ-কাণ বুঝিয়া সে-সমুদ্রে ঝাঁপ খাওয়া···

বীণা চিন্তা করিবার সময় পাইল না। মনের সব-উপরে যে-কথাটা বড় হইয়া দেখা দিল, সেই কথাই তার কণ্ঠ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া

পড়িল। বীণা বলিল,—না। এঁদের এক-রকম আত্মীয় আছেন... তাঁদের বাড়ীতে ঘটার পৈতে। অনেক লোকজন খাচ্ছে। আমরা সকলেই সেখানে রয়েছি। আপনার আসবার কথা ছিল বলে' ঐ মহাদেও মুদি আছে...ওকে আপনার কথা বলে যাওয়া হয়েছিল।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন—ও। লোকটি ভালো। আমি এসে দরজা তালাবন্ধ দেখে ভয় পেয়েছিলুম। ভাবলুম, বাড়ী ভুল হলো! না, কোথাও বুঝি সকলে চলে গেছেন! তা বাড়ীর দরজায় আমাকে দাঁড়াতে দেখে ও নিজে থেকে কাছে এলো। এসে বললে, আপনারি আসবার কথা ছিল? আমি বললুম, হ্যাঁ। তখন বললে, আমার ওখানে বসবেন আসুন; আমাকে খবর পাঠাতে বলে গেছেন। এই বলে' মুদি তার বৌকে পাঠালো তোমাদের খপর দিতে।

বীণার বুকে একটু সাহস! মনে হইল, এ বুঝি তবে ভগবানের দয়া! নহিলে সহসা তার এ-বুদ্ধি কেন হইবে? আর ও বাড়ীতে পৈতার সমারোহে পড়িয়া মাসিমা ও পিণ্টু-মণ্টুরা এ-বাড়ী ছাড়িয়া এ সময়ে দূরে থাকিবে কেন? নিশ্চয় বীণার এ-কাজে ভগবানের ইঙ্গিত আছে!

এত কথা ঠিক এমন সূক্ষ্মভাবে মনে উদয় হয় নাই। তবে বীণা ডাগর হইয়াছে, তাছাড়া এ-বয়সে সংসারে সে অনেক-কিছু দেখিয়াছে... স্নেহ-মমতা, দুর্বৃত্ততা, অভিসন্ধি...এবং বইয়ে-পড়া ও চোখে-দেখা বহু ঘটনার বিশ্লেষণও মনে মনে করিয়াছে! কাজেই সে সম্বন্ধে তার নিজের সুস্পষ্ট চেতনা না থাকিলেও মন আপনা হইতে এদিকে নিজেকে যেন সপ্রতিভ করিয়া তুলিয়াছে...

বীণা বলিল,—হ্যাঁ, ওরা খুব ভালো লোক।

তিনকড়ি গাঙ্গুলী বলিলেন,—তা তো বুঝলুম। কিন্তু এঁরা না থাকলে কার সঙ্গে কথা কয়ে তোমাকে নিয়ে যাবো? আমার আবার একটু মুস্কিল আছে, দিদি।

মুস্কিল! বীণা চমকিয়া উঠিল।

তিনকড়ি গাঙ্গুলী বলিলেন,—কর্ত্তা বোধ হয় তোমাকে চিঠিতে লিখেছেন·· চুণার হয়ে আমার এখানে আসবার কথা?

চিঠির কথা বীণার মনে পড়িল। ঠিক, চুণারের কথা চিঠিতে লেখা ছিল।

তিনকড়ি গাঙ্গুলী বলিলেন—এ কথা লেখার মানে, চুণারে আমার এক মেয়ে আর জামাই থাকে। মেয়েটির অসুখ চলেছে আজ তিন মাস। তাকে আমি দেখতে যাবো···এ-কথায় কর্ত্তা একেবারে দিন-ক্ষণ হিসাব করে বলে দেছেন, কালকের তারিখে যেন কলকাতায় তাঁর নাতনিকে পৌছে দিতে অন্যথা না হয়!

তিনকড়ি গাঙ্গুলীকে দেখিয়া এবং তাঁর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বীণার মনের পুঞ্জিত দ্বিধা-ভয় অনেকখানি হাল্‌কা হইয়া আসিল। ভাবিল, এ লোকটিকে মায়া-মমতায় বশ করা শক্ত হইবে না। যে স্নেহ-দৃষ্টিতে বীণাকে ইনি দেখিয়াছেন,···গোড়া হইতে সেখানকার সংসারের পরিচয়-টুকু দিয়া বীণাকে এই যে সতর্ক করা···এ স্নেহ সলিলার উপর হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই জন্যই তিনকড়ি গাঙ্গুলীকে···মানে, সলিলার উদ্দেশ্যে হইলেও বীণা যখন আজ সলিলা হইয়াছে,···ভয় নাই!

এমনি পাঁচ-সাত কথা মনের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল; কোনোটা

মুখে প্রকাশ করিতে পারিল না। শেষে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—আপনার মেয়ের কি অসুখ?

তিনকড়ি গাঙ্গুলী বলিলেন—একটি খোকা হয়ে আঁতুড়েই মারা গেছে। সে আজ তিন মাস হলো। সেই অবধি মেয়ের অসুখ চলেছে সমানে।

বীণা আবার প্রশ্ন করিল,—মেয়ের বয়স কত?

তিনকড়ি গাঙ্গুলী বলিলেন,—কুড়ি বছর চলেছে।

বীণা বলিল,—তাহলে প্রায় আমায় বয়সী!

তিনকড়ি গাঙ্গুলী কোনো জবাব দিলেন না, নিশ্বাস ফেলিলেন। বীণা আবার প্রশ্ন করিল—আপনার মেয়ের নাম?

তিনকড়ি উত্তর দিলেন—ঊষাঙ্গিনী। ঊষা বলে ডাকি।

—তাঁর আর ছেলেমেয়ে নেই?

—না দিদি। দু'বছর আগে আর একটি খোকা হয়েছিল, তা সেটিও তিন মাসের হয়ে চলে গেছে। মেয়ের বরাত বড় খারাপ, দিদি···এই বয়সে দু'দুটো শোক পেলে···বলে, যার বাড়া শোক আর মানুষের নেই··· পুত্রশোক!

বীণার মনে আঘাত লাগিল। অজানা ঊষাঙ্গিনীর উপর মমতায় মন ভরিয়া উঠিল। কহিল,—এতদিনেও এখানে অসুখ সারছে না? তাঁকে আপনি কেন কলকাতায় আপনার কাছে নিয়ে যাচ্ছেন না? সেখানে অনেক ডাক্তার-বদ্যি আছেন···

একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তাই নিয়ে যাবো দিদি। তোমাকে সব কথা খুলে বলি! সেখানকার অবস্থা দেখে

মেয়েটাকে না নিয়ে গিয়ে পারলুম না! জামাই রেলে চাকরি করে। যে-বাসায় থাকে, সে যেন পাখীর খাঁচা! তার পর কথাবার্ত্তা কইবে বা দেখাশুনা করবে, এমন-জন কেউ কাছে নেই! আছে বুড়ো শাশুড়ী, আর ঐ মেয়ে···

এতক্ষণে বীণা অনেকখানি সাহস পাইয়াছে! সে বলিল,—আপনি তাঁকে নিয়ে চলুন।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—সেই ব্যবস্থাই করে এসেছি। মানে, আমি তো জানতুম না, এখানে এঁদের কাকেও পাবো না! তাই ব্যবস্থা করে এসেছি, এখানে এসে তোমাকে নিয়ে পৌণে নটার ট্রেণে বেরিয়ে পড়বো। তার পর মোগলসরাইয়ে দিল্লী-মেল ধরবো···জামাই ওদিকে মেয়েকে নিয়ে মোগলসরাইয়ে আসবে। দিল্লী-মেলে তোমার জন্য সেকেণ্ড ক্লাশ মেয়ে-কামরায় একখানা ব্যর্থও আমার জামাই রিজার্ভ করে রাখবে। সব ব্যবস্থা পাকা করে এসেছি।···কিন্তু এঁরা এখানে নেই—তুমি এখন হুট্ বলতে যাবে কি করে' বলো তো?

বীণার মনটা কাঁপিয়া উঠিল! পরক্ষণে সে ভাবিল, নিশ্চয় মা-অন্নপূর্ণার কৃপা! চিঠি লিখিয়া অবধি সে ভয়ে ভয়ে কাঁটা হইয়া আছে··· লোক আসিলে কি হইবে? এখানকার শিকড় ছিঁড়িতে কতদিকে যে কত চাড় পড়িবে, বিশ্রী কি গোলযোগের যে সৃষ্টি হইবে···

তিনকড়ি গাঙ্গুলির এ-কথায় মনে আশ্বস্তি বোধ করিল।

বীণা বলিল,—সেজন্য কোনো অসুবিধা হবে না। মানে, এঁরা সব জানেন। আর এঁদের কি-বা আপত্তি থাকতে পারে?···তা এখন কটা বেজেছে?

ঘড়ি দেখিয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—আটটা বাজে। আটটা বাজতে বারো মিনিট বাকী।

ক'টা মাত্র মিনিট! এ ক'মিনিট যদি একটু হুঁশিয়ার হইয়া কাটাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে ক্ষণেকের খেয়ালে যে-কাজ করিয়া বসিয়াছে, হয়তো তার ফল হইবে ভালো! এবং···

বীণা বলিল,—তাহলে আপনি বসুন···আমি ছুটে একবার ও-বাড়ীতে গিয়ে খপর দিইগে। গিয়ে এঁদের বলি, আপনি আপনার মেয়ের জন্য যে-ব্যবস্থা করে এসেছেন···তার পর এঁরা যা বলেন···

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—মানে, এ ট্রেণে যদি মোগলসরাইয়ে পৌঁছুতে না পারি, তাহলে একটা গোলযোগ হতে পারে। অবশ্য আমাদের না দেখে মেয়েকে আমার জামাই ট্রেণে তুলে দেবে না। তবে আমারো এতখানি সুনিশ্চিত্ হওয়া উচিত হয়নি! এখন ভাবনায় পড়েছি···

বীণা বলিল,—না, না, আপনি ভাববেন না···আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আপনার মেয়েকে আবার মোগলসরাই থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন কি?

বীণা দাঁড়াইল না, তখনি ছুটিল কাতু-মাসিমার বাড়ী। সেখানে গিয়া ক্ষীরোদাময়ীকে বলিল, যে-ভদ্রলোক আসিয়াছেন, তিনি সম্পর্কে বীণার দাদু। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কাশীতে আসিয়াছিলেন; আসিয়া বীণার খপর পাইয়া তাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা করিতে হইবে না!

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—রাত্রে তিনি আমাদের ওখানে থাকবেন?

একটা ঢোক গিলিয়া বীণা বলিল,—তা তো জিজ্ঞাসা করিনি।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—কোথাকার বোকা মেয়ে! সে-কথা জিজ্ঞাসা কর। আর শোন্, এখানে তো রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার। ওদিকে বাড়ীতে একজন আপন-জন এসেছেন···না খেয়ে যাবেন? ভালো হয় না মা!···আমি কাতুকে বলি, কিছু খাবার-দাবার তুই বরং নিয়ে যা···ভালো করে জিজ্ঞাসা পড়া করবি···বুঝলি?

বীণা সরিতে পারিলে বাঁচে···তাঁর স্বর সহে না! সে বলিল,—এখুনি আমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসছি মাসিমা। তুমি যেতে পারবে না?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—আমার কি নিশ্বাস ফেলবার সময় আছে মা!···তাকে বুঝিয়ে বলবি···তিনি যেন দোষ না ন্যান্!

বীণা বলিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি···

বলিয়া সে ছুটিতেছিল···জ্যোতি কাছে ছিল, বলিল,—মাসিমা যে খাবার নিয়ে যাবার কথা বললে, বীণা!

বীণা বলিল,—ও·· খাবার দাও মাসিমা।

জ্যোতি বলিল,—তোমাকে নিয়ে যেতে হবে না। আমি লোক দিচ্ছি···থালায় করে সাজিয়ে সে নিয়ে যাবে'খন।

বীণা বলিল,—দেরী হলে যদি তিনি চলে যান জ্যোতিদি?

জ্যোতি বলিল,—আমি এখুনি পাঠাচ্ছি···তুমি বরং গিয়ে তাঁকে একটু ধরে রাখো···

—সেই ভালো। এইটুকুমাত্র বলিয়া বীণা ছুটিল।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—হাঁপাচ্ছো যে দিদি···

বীণা কহিল,—ছুটে গিয়েছি, ছুটে এসেছি।

—কাজের কি করে এলে?

—সব কথা বলেছি। ওঁদের কোন আপত্তি নেই। তবে আসতে পারছেন না···দুঃখ করতে লাগলেন।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—মানে, যে-রকম ব্যবস্থা, তাতে অপেক্ষা করা চলে না, এ-কথা বুঝিয়ে বলেছো?

বীণার বুক কাঁপিল···কোনোমতে সে বলিল,—বলেছি।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—মানে, কর্ত্তা বলে দিয়েছেন, যদি, তেমন বোঝো, ওঁদের কিছু টাকা দিয়ে এসো।

বীণা বলিল,—টাকা নেবেন না।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—ওখানে আমাদের মধ্যেও সেই কথা হয়েছিল। কাশী-বাস করলেই কি মানুষ লোভী হয়? তা এর পরে বরং আমি একদিন এসে কর্ত্তাবাবুর তরফ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাবো।··· তুমি মোদ্দা দেরী করো না দিদি···তৈরী হয়ে নাও।···আমি একখানা ঘোড়ার গাড়ীর চেষ্টা দেখি···

তিনকড়ি গাঙ্গুলি গাড়ী ডাকিতে গেলেন। বীণা বসিয়া চিঠি লিখিল। ক্ষীরোদাময়ীর নামে চিঠি। লিখিল,

শ্রীচরণেষু

মাসিমা

যিনি আসিয়াছেন, সম্পর্কে ইনি আমার দাদু হন। আমাকে ওঁদের ওখানে লইয়া যাইতে চান। বলেন, আমার জন্য সকলে আকুল।

তোমরা নাই, তোমাকে কোনো কথা বলিতে পারিলেন না, সেজন্য দাদু অত্যন্ত দুঃখ করিতেছেন !

আমার জন্য চিন্তার কারণ নাই। হয়তো দু'দিন পরে আসিব। কিম্বা তাঁরা যদি না ছাড়েন, জানি না। চিঠি লিখিব। তোমরা আমার প্রণাম জানিয়ো।

মিণ্টু-পিণ্টু-সিণ্টুকে স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়ো।

তোমার স্নেহের

বীণা।

চিঠি শেষ হইয়াছে, ও-বাড়ী হইতে লোক আসিয়া হাজির। তার হাতে মস্ত চ্যাঙারি। চ্যাঙারীতে লুচি, তরকারী, সন্দেশ প্রভৃতি।

খাবারের চ্যাঙারি রাখিয়া বীণা বলিল,—আচ্ছা। তুমি এসো।

লোকটি চলিয়া গেল।

৭

কোনো মতে তেত্রিশ-কোটি দেবতার পায়ে মনকে লুটাইয়া দিয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলিকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া বীণা তাঁর সঙ্গে ষ্টেশনে বাহির হইল। যাইবার সময় বাড়ীর দ্বারে তালা দিয়া সে-চাবি মহাদেওয়ের কাছে রাখিয়া আসিল, বলিল,—মা-জী এলে তাঁকে দিয়ো মহাদেও। বলো, দিদিমণি তাঁর এক দাতুর সঙ্গে দাতুদের বাড়ী গেছে।

মাথা নাড়িয়া মহাদেও চাবি রাখিয়া দিল।

তার পর মোগলসরাইয়ে ট্রেণ আসিলে তিনকড়ি গাঙ্গুলির জামাই ও মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়ে ঊষাঙ্গিনী যেন ছায়ার মূর্ত্তি! দেহ শুকাইয়া পাত—বিশীর্ণ-মলিন-মুখ।

জামাই বলিল,—মেল আজ বিশ মিনিট লেট্!

ঊষাঙ্গিনীর সহিত বীণা ভাব করিল; বলিল,—আপনি আমার কে হন?

মলিন মৃদু হাস্তে ঊষাঙ্গিনী বলিল,—তোমার পিশিমা হই।

পিশিমা…এ এক নূতন সম্পর্ক! মানুষ পৃথিবীতে মা-বাপ ভাই-বোন খুড়া-খুড়ী পিশি-মাসির সঙ্গে বাস করে। তার কেহ নাই!

কাশীতে এক অনাত্মীয়া করুণাময়ী স্থান দিয়াছিলেন, তাকে ডাকিত মাসিমা! ওখানেও সম্পূর্ণ অনাত্মীয়-অনাত্মীয়াদের সঙ্গে নূতন সম্পর্ক গড়িয়া বাস করিবে! বাস করিবে কি? যদি তাঁরা নিঃসঙ্কোচে বীণাকে সেস্থানে স্থান দেন, তবেই! নহিলে এত বড় পৃথিবীতে কে তার আছে? নিজের অভিশপ্ত জীবনে কার কাছ হইতেই বা একটু স্নেহ মমতা পাইবে? সলিলার কথা মনে পড়িল, যেখানেই থাকো, তুমি তো সব দেখিতেছ···বীণার এ স্পর্দ্ধা তুমি মার্জ্জনা করিয়ো!

বীণা কহিল,—বাপের বাড়ী গিয়ে অসুখ এবারে নিশ্চয় সেরে যাবে!

উষাঙ্গিনীর মুখে আবার তেমনি মলিন মৃদু হাস্যরেখা! সে বলিল,—সারাবার জন্যই তো সকলের চেষ্টা···

একটা নিশ্বাস উষাঙ্গিনী রোধ করিতে পারিল না।

বীণা বলিল,—ভাববেন না। হাওয়া বদল করলেই অনেক অসুখ সেরে যায়। দেখিনি, তবে লোকের মুখে শুনেছি।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি আসিয়া বীণাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—প্লাট-ফর্ম্মের বেঞ্চে না বসে তুমি বরং সেকেণ্ড-ক্লাশ ওয়েটিং-রুমে বসো দিদি···

আর পিশিমা?

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—ওর ইণ্টার-ক্লাশের পাশ। আমারো ইণ্টারের টিকিট। জামাই রেলে চাকরি করলে কি হবে, ভারি ধার্ম্মিক। রেলের আইন-কানুন একেবারে লাইনে-লাইনে মেনে চলে!

বীণা কি ভাবিল! তার পর বলিল,—বাঃ! দুজনে তাহলে ট্রেণে একসঙ্গে যাবো না বুঝি?

সঙ্কোচ-ভরে তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—কি করে তা হবে দিদি?

তোমার হলো সেকেণ্ড-ক্লাশ আর ওর হলো ইণ্টারের টিকিট। ওকে নিয়ে আমি ইণ্টারে থাকবো। তবে সব ষ্টেশনে তোমার খপর নেবো। কোনো ভয় নেই!

আব্দারের সুরে বীণা কহিল,—না দাতু, আমরা একসঙ্গে যাবো।

—তোমার কষ্ট হবে দিদি···

বীণা কহিল,—কোনো কষ্ট হবে না দাতু···আপনাদের ছেড়ে একলা-একলা গেলেই বরং কষ্ট হবে!

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তোমার যে সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট·· বার্থ রিজার্ভ করা।

—তা হোক! তার জন্য তো দণ্ড দিতে হবে না।

তিনকড়ি বলিলেন,—দণ্ড দিতে হবে না। কিন্তু কর্ত্তা···

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে বীণা বলিল,—গিয়ে আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন, একলাটি সেকেণ্ড-ক্লাশ কামরায় থাকতে চাইলো না! এ কেমন হবে বলুন দিকিনি, পিশিমার অসুখ···একসঙ্গে গেলে ওঁরও মন ভালো থাকবে, আমারো থাকবে···সব সময় ওঁকে দেখতে পারবো, ওঁর এই অসুখ শরীর! না দাতু, এতে অমত করবেন না, লক্ষ্মীটি···

মিষ্ট কথায় এবং মিষ্ট দরদে তিনকড়ি গাঙ্গুলি খুশী হইলেন!

জামাই আসিয়া বলিল,—ঐ সিগনাল দেছে...

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তাহলে ট্রেণ আসছে?

জামাই বলিল,—হ্যাঁ।

ট্রেণ আসিল। এবং তিনজনে একখানা ইণ্টার-ক্লাশ কামরায় উঠিয়া

বসিল। কামরায় ভিড় ছিল না। তিনজনে একখানা গোটা বেঞ্চ দখল করিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তোমাদের দু'জনের বিছানা করে দি। শুয়ে পড়ো…

বীণা বলিল,—আর আপনি?

তিনকড়ি বলিলেন,—সামনের বেঞ্চে থাকবো। ট্রেণে কোনোকালে আমার ঘুম হয় না। তাছাড়া রোগী রয়েছে সঙ্গে…

বীণা কহিল,—বাঃ, রোগীকে আমি দেখবো! মেয়ে-মানুষ ছাড়া রোগীর যত্ন পুরুষে করতে পারে না কি, দাদু?

কথার শেষে বীণা মৃদু হাসিল।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—আমাকে ছোট-দাদু বলো দিদি। সন্তু আমাকে 'কাকা' বলে ডাকতো!

বীণার বুকে আবার চমক! সন্তোষের কথা মনে হইলেই বুকে কেমন কাঁপন জাগে!

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বাঁধন খুলিয়া শয্যা বিছাইতে উদ্যত হইলেন।

বীণা কহিল,—আমি বিছানা করি ছোট-দাদু…

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—করো দিদি, তাই করো।

উষাঙ্গিনী বলিল,—আমি সাহায্য করবো কিন্তু…

নিষেধ তুলিয়া মিষ্ট কণ্ঠে বীণা বলিল,—না পিশিমা। আপনার

তিনকড়ি বলিলেন,—ওকে 'আপনি' বলো না দিদি…

বীণা বলিল,—বেশ, 'তুমি' বলবো। আমারো কেমন লাগছিল ঐ

'আপনি' কথাটা। আপনাকেও 'তুমি' বলতে ইচ্ছে হচ্ছে ছোট-দাদু। আপনি-কথাটায় যেন দূর-দূর পর-পর মনে হয়...কাছাকাছি পাওয়া যায় না!

চমৎকার কথাগুলি! হাসিয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,– তোমার বাবা আমাকে কোনোদিন আপনি বলেনি! তোমারো আপনি বলার কথা নয়। দৈব-দুর্ব্বিপাকে এতকাল অজানার মতো কোথায় কতদূরে পড়েছিলে! লোকনাথদা কতদিন কর্ত্তার কাছে মিনতি জানিয়েছে। তা কর্ত্তা কতবার বলেছেন, তাদের আনো; না হয় চলো, ঝুপ্ করে তাদের ওখানে গিয়ে উঠি, তাদের ধরে নিয়ে আসি। যাবার উদ্যোগ করেছেন···কিন্তু তোমাদের ঐ পিশিমা...বংশের মান-ইজ্জৎ, ছেলের অবাধ্যতা, বৌমার ছোট নীচু বংশ, লোভার্থী মন...এমনি কাঁটায় বিঁধে কর্ত্তাকে বেরুতে দ্যাননি! সংসারের ঐ-দিকটা এমন হয়ে আছে, সেই নবাব-বাদশার অন্দর-মহলের কথা মনে পড়ে। রাজা যা-খুশী তা করবেন, জো কি! কত রকমের কত জীব যে সংসারে কত চক্রান্ত রচনা করছে! হুঁঃ! কর্ত্তাকে এবারে আর থামাতে পারেনি পিশিমা...চেষ্টা করেছিল। কর্ত্তা বললেন, আমার বংশের মেয়ে...এর পর দুর্দ্দশার দায়ে যদি একটা হাড়ি-ডোমের ঘরে যায়? শেষে যদি মুসলমান হয়?

একাগ্র মনোযোগে বীণা এ-কথা শুনিল। শুনিয়া ভয়ে কাঁটা হইয়া রহিল। নিরাপদ আশ্রয় ভাবিয়া যেখানে চলিয়াছে, সেখানে দিবারাত্র বহু চক্রান্ত ভেদ করিয়া তাকে বাস করিতে হইবে! কে জানে, এ চক্রান্ত কোন্ দিক দিয়া কোন্ পথে...

উষাঙ্গিনী বলিল,—এবারে যে জ্যাঠামশায়ের মত হলো...

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—এ চিঠি লিখেছেন, তাও লোকনাথের কথায়! লোকনাথদা দিবারাত্র বোঝাচ্ছে। সেদিন খপরের কাগজ পড়ে শোনালো, কে-একজন বড় লোকের ছেলে বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে এসেছিল। সেজন্ম বাপ তাকে ত্যাগ করে। তার পর একটি মেয়ে রেখে ছেলে মারা যায়। মেম-মা সে-মেয়েকে ফেলে আর-একজন সাহেবের সঙ্গে বিলেত চলে গেছে। সাহেবের মুসলমান খানশামা মেয়েটিকে বাজারে বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে। মহা হৈ-হৈ! সে খপর পড়ে লোকনাথদা বললে,—সন্তুর মেয়ে আছে। মা-বাপ নেই···কাশীতে পরের আশ্রয়ে পড়ে আছে, তার যদি এমন বিপদ ঘটে? তাতে বংশের দুর্নাম রটা ছাড়া কীর্ত্তি রক্ষা পাবে না তো! তাছাড়া পৌত্রী...রক্তের সম্পর্ক! মুছে দেবার নয়, কেটে ফেলবার নয়! কিছু হলে লোকে বলবে, তারাচরণ রায়ের পৌত্রী!

কল্পনা-নেত্রে বীণা দেখিতেছিল, এক মস্ত পুরী...সে পুরীর মধ্যে সিংহাসনে বসিয়া অটল-অচল মন লইয়া রাজা! রাজার মনে দারুণ ক্রোধ...অপরাধী পুত্রের বিচার শেষ করিয়া তাকে দণ্ড দিয়াছেন। পুত্রকে দণ্ড দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই! সেই সঙ্গে যেন আদেশ দিয়াছেন, অপরাধী পুত্রের যে যেখানে আছে, নিশ্চিহ্ন করিয়া সব উপড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফ্যালো! পুত্রের কোনো চিহ্ন রাখিয়ো না! রাজার পাশে মন্ত্রী পাত্রমিত্রের দল রাজাকে বার-বার নিবেদন জানাইতেছেন...

উষাঙ্গিনী বলিল,—পিশিমা-মানুষটির জন্ম ও বাড়ীতে ঢুকতে সত্যি ভয় হয়। আমার মনে আছে, ঐ শশিদার বিয়ের সময়...সেদিন বৌ-ভাত! কনে-বৌকে নিয়ে আমরা বসে গল্প করছি, কে বুঝি

গোঁপাল ভাঁড়ের গল্প বলছিল। গল্প শুনে আমরা সকলে হেসে গড়াগড়ি, বৌ-বেচারীও তাই! এমন সময় তোমাদের ঐ পিশিমা এলেন, হু'চোখে আগুন জেলে কনে-বৌয়ের দিয়ে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বললেন, না, না, না—আর যে হাসে হাসুক, তুমি অমন অসভ্যর মতো হাসবে না। এত-বড় ঘরের বৌ হয়ে এসেছো, কত জন্মের তপস্যা ছিল ব'লে। ও ছোট-লোকের চাল-চলন এ-বাড়ীতে চলবে না! একদিন এ-রাজ্যের সিংহাসনে তোমাকে বসতে হবে, বাছা...তোমার যদি সে-যোগ্যতা না দেখি, বনবাসে পাঠিয়ে ছেলের আবার বিয়ে দেবো, জেনো!...ভাবো তো, নতুন বৌ...ছেলেমানুষ...বেচারী! তাকে এই কথা বলে? মানুষের মুখে এ কথা বেরোয়? উঃ, সে-কথা আমি ভুলতে পারিনি, আজ-পর্য্যন্ত না!

এ-কথা শুনিয়া বীণা থ হইয়া রহিল।

সেইখানে সে চলিয়াছে সুখের আশায়...নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে... নিজের জীবনকে নিরাময় করিতে! তাও এত-বড় ছলনার উপর নির্ভর করিয়া!

তিনকড়ি গাঙ্গুলী বলিলেন,—তা দিদির কোনো ভয় নেই। একটুতেই যে-পরিচয় পেলুম, এমন মিষ্টি স্বভাব...প্রাণে এত দরদ...এমন উঁচু মন... তাছাড়া ওঁরই তো রাজা! ওঁর ওপর দুর্ব্যবহার করতে সাহস হবে না। কর্ত্তা সহ্য করবেন কেন?

উষাঙ্গিনী বলিল,—ও থাকবে অন্দরে চেড়ীদের কাছে। জ্যাঠামশাই জানবেন কি ক'রে...যে ওকে চিমটি কাটছে? ও তো কথায় কথায় নালিশ করতে ছুটবে না! মেয়ে-মানুষের সে-স্বভাবই নয়!

বীণার মুখ পাংশু বিবর্ণ! তিনকড়ি গাঙ্গুলি তাহা লক্ষ্য করিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—বাড়ীতে পা দেবার আগেই ওকে ভয় দেখাস্‌নে, ঊষা। সত্যি, দিদির মুখ আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে...দেখছিস্‌ না?

এ-কথায় ঊষাঙ্গিনী বীণার পানে চাহিল। কহিল,—সত্যি, ও-সব কথা থাক...

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তোমরা শুয়ে পড়ো দু'জনে। অনেক রাত হয়েছে...

বীণার চেতনা ফিরিল। বীণা কহিল,—হ্যাঁ, শোও! তোমার অসুখ-শরীর পিশিমা...

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তুই কখন খেয়েছিস ঊষা?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—সন্ধ্যাবেলায়।

—তা হলে কিছু খা...

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—না বাবা...কিছু খাবো না।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—কিছু খেতে হবে বৈ কি। এতখানি রাতে না খেলে সকালে বড্ড কাহিল বোধ করবি। আর কিছু নয়—একটা বেদানা আর একটা কমলালেবু...

কথা শেষ করিয়া তিনি বাক্সের-উপরে-তোলা ছোট টুক্‌রি হইতে একটি বেদানা ও কমলালেবু বাহির করিলেন। বীণা সে-দুটা হাতে লইয়া বলিল,—আমাকে দাও ছোট-দাদু...ধুয়ে ছাড়িয়ে পিশিমাকে আমি খাওয়াচ্ছি...

কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া বেদানা-লেবু ধুইয়া বীণা ছাড়াইতে বসিল, বলিল,—তুমি শোও পিশিমা...শুয়ে শুয়ে খাবে...

উষাঙ্গিনী বলিল,—সেবার রকম দেখেছো বাবা...যেন কত বুড়ো গিন্নি-ঠাকরুণটি!

হাসিয়া বীণা কহিল—নিশ্চয় তো!

কমলালেবুর কূয়াগুলি পরিষ্কারভাবে ছাড়াইয়া বীণা দিল উষাঙ্গিনীর হাতে। উষাঙ্গিনী আপত্তি তুলিল না।

খাইতে খাইতে উষাঙ্গিনী বলিল,—এত কথা হলো তোমার সঙ্গে... আসল কথাই হয়নি!

বীণা কহিল,—কি কথা?

উষাঙ্গিনী বলিল,—তোমার নামটি জানি না তো...তোমার নাম?

কম্পিত কণ্ঠে বীণা কহিল,—আমার নাম সলিলা।

৮

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিতে ঊষাঙ্গিনী দেখে, ট্রেণ চলিয়াছে এবং শীটে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া বীণা খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া আছে...অনিদ্রায় চিন্তায় মলিন মুখ—ছ'চোখে যেন রাজ্যের চিন্তা বিজড়িত! বীণা বসিয়া আছে পুতুলের মতো...যেন চেতন-হারা!

পাশাপাশি কামরায় বসিয়া যাত্রীরা ঘুমাইতেছে। তিনকড়িও নিদ্রাচ্ছন্ন। বীণা শুধু জাগিয়া আছে।

ঊষাঙ্গিনী ডাকিল—সলিলা...

বীণা চমকিয়া উঠিল...বুকের মধ্যে সে-চমকের ঢেউ ছুটিল।

বীণা ফিরিয়া চাহিল।

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—সারা রাত এমনি জেগে ব'সে আছো?

মলিন মৃদু হাস্যে বীণা বলিল—ঘুম হলো না। ট্রেণে আমার ঘুমোনো অভ্যাস নেই তো।...তোমার ঘুম হয়েছিল পিশিমা? কোনো কষ্ট হয়নি?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—না।...

কথাটা বলিয়া উষাঙ্গিনী বাহিরের পানে তাকাইল...বাহিরে সবুজ মাঠ-বাটের ফাঁকে-ফাঁকে বাঙলার পল্লী দেখা দিয়া আবার তখনি বনের আড়ালে লুকাইতেছে...উষাঙ্গিনী বলিল,—বোধ হয় এসে পড়েছি। মাঠ-জলার পরে মাঝে মাঝে লোকালয় দেখা যাচ্ছে...তুমি মুখ-হাত ধোবে না? এ-সব কামরার নতুন বাথরুমগুলো দেখছি, ভালো...

বীণা কহিল,—তুমি আগে মুখ ধুয়ে এসো। তার পর তুমি এলে আমি যাবো'খন!

উষাঙ্গিনী বাথরুমে ঢুকিল...

বীণার এবার সত্যই চেতনা ফিরিয়াছে! এতক্ষণ যেন কোন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিল! রাত্রে অন্ধকারের আব্ছায়ায় বসিয়া বসিয়া শুধু দেখিয়াছে, বাহিরের নানা বেশে ছায়ার ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে সে ছুটাছুটির উপর দাঁড়ি পড়িয়াছে,—তখন স্তিমিত আলোয় ঘুমঘোরে দু'চারিজন লোকের ছুটোছুটি, একটু কলরবের ঝাপ্টা—তারপর আবার সেই মাঠে-বাটে ছায়ার ছুটাছুটি...

এখন উষাঙ্গিনীর কথায় মনের ঘোর কাটিয়া চোখে পড়িল জীবন্ত পৃথিবীর নূতন রূপ! মনে পড়িল, কোথা দিয়া একটা রাত্রি কাটিয়া গেছে! কাল সে কোথায় ছিল—তার পর চকিতে কোথা দিয়া কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! যেখানে আসিয়াছে, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, সে উপায় নাই! সামনে অগ্রসর হইতে হইবে! ফিরিয়া যাইবে,—পিছনে সে-পথের চিহ্ন-অবধি মুছিয়া দিয়া আসিয়াছে! উষাঙ্গিনী বলিল,—আসিয়া পড়িয়াছি। তার মানে...?

বীণা শিহরিয়া উঠিল।

চোখের সামনে আলো স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে···যেখানে যত আব্‌ছায়া ছিল, আবরণ ছিল, অস্পষ্টতা ছিল, তার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আলো প্রবেশ করিয়া সব এখন সুস্পষ্ট রেখায় ফুটাইয়া তুলিতেছে!

রাত্রির সে-অস্পষ্টতায় নিজেকে ঢাকিয়া-ঢুকিয়া কোনোমতে চালাইয়া লওয়া যায়···কিন্তু দিনের এ আলোয় ছদ্ম-আবরণকে কি করিয়া ঢাকিবে? ···চোখের সামনে ছায়া-মূর্ত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল সন্তোষ, সলিলা, ক্ষীরোদাময়ী, পিণ্টু-মিণ্টু-সিণ্টু···কাতু-মাসীর বাড়ী···সে বাড়ীতে কাজের ভিড়···সে ভিড়ে জ্যোতি···বিজয়া!···মহাদেওয়ের সেই হাসি-ভরা মুখখানা পর্য্যন্ত...

তারা ছিল যেন মস্ত সহায়!...এখন? যদি তারা জানিতে পারে, কি দুঃসাহসে ভর করিয়া বীণা কতখানি মিথ্যা-ছলনার আশ্রয় লইয়াছে...

বীণার দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল...

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা ভাবিল, তাই করিবে না কি? ফিরিয়া যাইবে? তিনকড়ি গাঙ্গুলির পানে চাহিল। এখনো ঘুমাইতেছেন! সরল ভদ্রলোক! কি-বিশ্বাসে তাঁকে সঙ্গে আনিয়াছেন! আর এই ঊষাঙ্গিনী···

রোগে যে-ব্যথাই পাক্, তার মতো ঊষাঙ্গিনীর মনে ভয় নাই! শঙ্কা নাই!

বীণার বুকের উপর দিয়া যেন সার সার কামানের গাড়ী চলিয়াছে!

ঊষাঙ্গিনী আসিয়া পাশে বসিল, বলিল,—এবার তুমি যাও সলিলা··· মুখচোখ ধুয়ে এসো। এই নাও তোয়ালে আর সাবান...

বীণার হাতে ঊষাঙ্গিনী সাবান ও তোয়ালে দিল। তার পর

বাহিরের পানে তাকাইয়া বলিল,—এবারে বোধ হয় বর্দ্ধমান আসবে... মনে হচ্ছে যেন! কতবার গেছি তো এ-পথে! তুমি বোধ হয় এদিকে কখনো আসোনি?

যেন কোন্ অতল পাতাল-গহ্বর হইতে বীণা বলিল,—না···

উষাঙ্গিনী বলিল,—যাও, দেরী করো না। তুমি এলে বাবাকে ডেকে দেবো। তার পর তিনজনে বসে গল্প করবো।···একবার রাজপুরীতে প্রবেশ করলে তোমার সঙ্গে হয়তো আর এমন গল্প করা হবে না। ...এত ভালো লাগছে তোমায় যে কি বলবো!

বীণার বুকখানা যেন ফাটিয়া চূর্ণ হইবে!...কি দুর্ভাগিনী সে! এমন স্নেহের কথা বলিবে, এমন আপন-জন তার কেহ নাই! বেচারী সলিলা! তার জন্য পৃথিবীতে স্নেহ-প্রীতির এমন ভাণ্ডার···এ-সব ছাড়িয়া কোথায় গেল সলিলা? তার যাইবার কি প্রয়োজন ছিল?

মুখ-হাত ধুইয়া বীণা ফিরিয়া আসিল···মনকে সবল সুদৃঢ় করিয়া। না, পুরানো কথার চিন্তায় মনকে আচ্ছন্ন হইতে দিবে না! যে-বাস্তব কঠিন বেশে সামনে আসিতেছে, তার সামনে দাঁড়াইবে! দাঁড়ানো ছাড়া তার আর এখন অন্য উপায়ও নাই!

উষাঙ্গিনী বাহিরের পানে চাহিয়াছিল; বীণাকে ফিরিতে দেখিয়া বলিল,—বসো···

বীণা বলিল,—না, বসবো না পিশিমা! তোমাকে খেতে দিতে হবে। কমলালেবু আনি···

—থাক্, লেবু খেয়ে খেয়ে লেবুতে অরুচি ধরে গেছে···

—তাহলে আপেল খাও···

উষাঙ্গিনী বলিল,—না, গাড়ীতে আর খাবো না। একেবারে সেই বাড়ীতে গিয়ে খাবো'খন !···বাবাকে ডাকি···তার পর দু'জনে বসে চারিদিক দেখি আর গল্প করি।

তিনকড়িকে উষাঙ্গিনী জাগাইয়া দিল। তিনি উঠিলেন। বলিলেন—বাঃ, সকাল হয়ে গেছে ! তাই তো···বৰ্দ্ধমান পেরিয়ে এসেছি না কি রে ?

উষাঙ্গিনী বলিল,—বোধ হয়, না ?

তিনকড়ি বলিলেন,—তাহলে বৰ্দ্ধমানে পৌঁছুলেই চায়ের ব্যবস্থা করি। আমার দিদি চা খাবেন তো ?

বীণা বলিল—আমি ?···না ছোট দাদু···আমি চা খাই না।

তিনকড়ি বলিলেন,—ভালো, ভালো দিদি···ও অভ্যাসটা আর করো না। পৃথিবীতে খাবার মতো কত জিনিষ রয়েছে···তা ছেড়ে চা খাবে কি-দুঃখে ?···তাহলে তোমরা কিছু খেয়ে নাও ! ফল রয়েছে···জামাই মিষ্টি কিনে দেছে, দু'জনে খাও···

উষাঙ্গিনী বলিল—আমি কিছু খেতে পারবো না, বাবা ! সলিলা খাক্।

উষাঙ্গিনীর মুখে সলিলা-নাম শুনিয়া বীণা আবার চমকিয়া উঠিল। কিন্তু না, চমকাইলে চলিবে না···চম্‌কানো নয়···

বীণা বলিল,—আমিও খাবো না। খিদে নেই ছোট দাদু···

তিনকড়ি বলিল,—এ-বয়সে তোমাদের খিদে আবার থাকবে কি দিদি ! খিদে পেতে দেবে না !···খিদের বয়স আসুক, তখন বুঝবে, অক্ষিদে কি-বস্তু···

কথাটা বলিয়া তিনকড়ি হাসিলেন।

তার পরে বলিলেন,—না, না···তা হয় না। বেশ, ফল না খাও, বর্দ্ধমান আসছে, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা···তাই খেয়ো!··· পশ্চিমেই রইলে দিদি···বাঙলা দেশের খাবার তো খেলে না! খেয়ো এই বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা···খাশা জিনিষ! তোমার পশ্চিমের লোক কি মিষ্টি তৈরী করতে জানে?···হুঁঃ দুধ জমিয়ে ঠেশে তাতে চিনি-গুড় মিশিয়ে খালি ঐ প্যাঁড়া আর প্যাঁড়া!···এই যে তোমার পিশিমা···শ্বশুর-বাড়ী থেকে এসে আগে-আগে কেবল বলতো, কান্না পায় বাবা, মিষ্টি মুখে দিতে বসে! তোমার পিশিমা মিষ্টিটা খুব ভালোবাসে কি না! সন্দেশ, রসগোল্লা, লেডিগেনি···

তিনকড়ি গাঙ্গুলি আবার হাসিলেন···

সলজ্জ-হাস্যে উষাঙ্গিনী বলিল—তুমি মুখ-হাত ধোও গে...না হলে কখন বর্দ্ধমান এসে যাবে, তোমার আর সীতাভোগ-মিহিদানা কেনা হবে না!

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বাথ-রুমে গেলেন।

উষাঙ্গিনী বলিল—সত্যি সলিলা, এদেশের মিষ্টি খুব ভালো···

বীণা বলিল,—কিন্তু কাশীতেও সন্দেশ, রসগোল্লা, লেডিগেনি—এ-সব পাওয়া যায়, পিশিমা···

হাসিয়া উষাঙ্গিনী বলিল—কেন পাওয়া যাবে না? বাবার ঐ রকম কথা! বাবা সন্দেশটা খুব ভালোবাসেন।···আমি তখন এলাহাবাদে··· বাবা গিয়ে দু'দিন ছিলেন। ওখানকার বাঙালীর দোকান থেকে ফরমাশ দিয়ে তোমার পিশেমশাই বাবার জন্য সন্দেশ তৈয়েরী করিয়ে আনালেন।

একটুখানি মুখে দিয়ে বাবা আর খেলেন না। কত বললুম, বাবা বললেন—রামোঃ, এদেশের সন্দেশ না কি আবার মানুষে খায়! তোমার পিশেমশাই বললেন—বাঙালীর দোকান…তারা কলকাতা থেকে ময়রা আনিয়ে ভিয়েন করাচ্ছে! বাবা বললেন—ময়রা এলে কি হবে? সে ময়রা বাঙলা দেশের গরুর দুধ এখানে পাবে কোথায়? সে ছানা? এখানকার জল-বাতাসে সে-ছানা তৈরী হয় না…সে-পাকও এখানে হয় না…তার উপর আবহাওয়া বলে' একটা বস্তু আছে তো!

কথা শেষ করিয়া ঊষাঙ্গিনী হাসিতে লাগিল।

বীণার চমৎকার লাগিল! এ মানুষটিকে ক'ঘণ্টাই বা দেখিয়াছে! প্রথম যখন দেখে, বীণার মনের মধ্যে তখন চলিয়াছে বজ্র-বিদ্যুতের ঘন-ঘটা…লেলিহান অগ্নিশিখার মুহুর্মুহু যেমন শিহরণ, তেমনি প্রাণঘাতী গর্জ্জন! তার পর ঐ শান্ত স্বর, মিষ্টমধুর বাণী! সে-স্বরে কত স্নেহ-মমতা! তারপর বীণাকে নিঃসংশয়ে এতখানি বিশ্বাস! তার পর ষ্টেশন, ট্রেণ…এবং দেখা হইল এই ঊষাঙ্গিনীর সঙ্গে!…এই একটি রাত্রির পরিচয়ে তিনকড়ি গাঙ্গুলিকে এমন নির্ভরযোগ্য স্নেহশীল পরমাত্মীয় বলিয়া মনে হইয়াছে! ভাবিল, যদি তেমন হয়…তিনকড়ি গাঙ্গুলিকে সব কথা বুঝাইয়া বলিবে…তিনি সহায় হইবেন!

কিন্তু বার-বার এ-কথা কেন ভাবে? না, না, না…আর সে ভাবিবে না! সে বীণা নয়, বীণা নয়। বীণা মরিয়াছে। সে সলিলা…

ঊষাঙ্গিনী বলিল—বাড়ীর কাছে যতই আসছি, মন তত যেন আকুল হয়ে উঠছে! কেবলই মনে হচ্ছে, ট্রেণটা যদি আরো জোরে চলতো! তোমার কি মনে হচ্ছে সলিলা?

ঊষাঙ্গিনী বীণার পানে চাহিল...বীণার চোখে কেমন ছায়া! সে ছায়ার স্পর্শে তার দৃষ্টি যেন ক্লান্ত; আতুর!

ঊষাঙ্গিনীর মনে হইল, ভয়? বীণার মনে ভয় হইবার কারণ আছে। কখনো যাঁদের জানে নাই, কখনো যাঁদের দেখে নাই···জানার মধ্যে যাঁদের সম্বন্ধে জানিয়াছে শুধু বিরোধ আর অপ্রীতি...সে-বিরোধের ফলে বাপ নির্ব্বাসিত, মায়ের মর্য্যাদা লাঞ্ছিত! আজ চিঠি পাইলে কি হইবে, যাকে লইয়া ও-বাড়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, সেই সন্তোষদা···তাঁকে বিসর্জ্জন দিয়া ও-রাজ্যকে বীণার কি আজ রাজ্য বলিয়া মনে হইবে?

এ কথা মনে হইবামাত্র ঊষাঙ্গিনী চুপ করিল···নিমেষের জন্য। তার পর বলিল,—তোমার গা ছম্‌ছম্‌ করছে···না? যত আপন-জনই হোন্‌, এ্যাদ্দিন যাঁদের চেনো না, জানো না···বিশেষ সন্তোষদার কথা, বৌদির কথা বড্ড মনে জাগছে···না? শুয়ে আমি অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারিনি! কেবলি ওই কথা ভেবেছি। মনে হচ্ছিল, আহা, আজ যদি সন্তোষদা থাকতো, বৌদি থাকতো, তোমার এ-আসা কত সুখের হতো··· কতখানি সার্থক হতো।

প্রত্যেকটি কথা তীরের মতো বীণার বুকে বিঁধিতেছিল! বুকের ভিতরটা রক্তে রক্তময়! বীণা কিছু বলিল না···তার চোখের কোণে একরাশ বাষ্প ঠেলিয়া আসিল।

ঊষাঙ্গিনী বলিল—সন্তোষদার কথা মনে পড়ছিল। কাকেও কোনো দিন ভয় করেনি। যা ভালো বলে' নিজে বুঝেছে, কারো কথায় তা ত্যাগ করেনি!...জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তর্ক হতো। দেখেছি তো!... একটা ব্যাপার আজো আমার মনে আছে!···ঐ পিশিমা···পিশিমার কে

গুরু ছিল...সেই গুরু এসে ও-বাড়ীতে ক'দিন ছিল। একদিন পাশের কোন্ দোকানে সন্তোষদা বুঝি দেখে, গুরু চপ-কাটলেট্ খাচ্ছে। দেখে গুরুকে বলে—এ কি গুরুজী! আমাদের ওখানে নিরিমিষ ছাড়া কিছু ছুঁতে চান্ না—আর এখানে বসে এই কাজ করছেন! ভয়ে গুরু এতটুকু! তার পর বাড়ীতে এসে গুরু বুঝি পিশিমাকে বলে, এখনি চলে যাবো; তোমাদের কর্ত্তাবাবুর ছেলে আমাকে যা-তা বলে, অপমান করেছে। পিশিমা হৈ-হৈ রব তুললে। সন্তোষদা তখন গুরুর হাঁড়ি দিলে ভেঙ্গে! পিশিমা বললে,—প্রণাম কর্, পায়ের ধূলো নে, নিয়ে মাপ চা। সন্তোষদা বললে, কেন? কি দোষে? কখ্খনো না! উনি খেলেন চপ্-কাট্লেট্...আর আমি চাইবো মাপ? না!...পিশিমা এক-দিন এক-রাত্রি কিছু মুখে দিলে না। জ্যাঠামশাই বললেন, ওরে, শোন্ বাবা কথাটা! সন্তোষদা বললে, দোষ করতুম, উনি আমাকে ধ'রে সাতশো ঘা জুতো মারলেও কথা কইতুম না। তা নয়...কিছুতে সন্তোষদাকে কেউ নোয়াতে পারেনি! এ তো ছোট কথা...তবে কাণ্ডটা চোখে দেখেছি কি না...

বীণার মুখে কথা নাই। দু'চোখের বাষ্প-রাশি তখন কথার বাতাসে জলধারায় পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!

ঊষাঙ্গিনী দেখিল, বীণার চোখে পুঞ্জিত অশ্রু...বলিল—কেঁদো না সলিলা...অদৃষ্ট...না হলে এমন হবে কেন, বলো? তবু জ্যাঠামশায়ের মন হয়েছে...তোমাকে ফিরিয়ে আনলেন। এতে আমাদের অনেক দুঃখ ঘুচলো তবু!

বীণা নিরুত্তর। চোখের সামনে বহির্বিশ্ব ছায়ার মতো ছুটিয়া ছুটিয়া

চলিয়াছে...ও-বিশ্ব যেন নিজেকে সরাইয়া বীণাকে কলিকাতার কাছে, আরো-কাছে ঠেলিয়া দিতেছে!

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—তোমার কাছে সন্তোষদার আর বৌদির ছবি আছে সলিলা?

ছবি ছিল...সন্তোষ চারুলতা ও সলিলার ফটো...গ্রুপ-ছবি...সেখানা বীণা রাখিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে আনে নাই! আর একখানা ছবি... সন্তোষের আর চারুলতার। সে ছবি বীণা সঙ্গে আনিয়াছে। কি জানি, যদি কেহ প্রমাণ চাহিয়া বসে?

বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে বীণা কহিল,—আছে।

ঊষাঙ্গিনী বলিল—এখন নয়, পরে দেখিয়ো। বৌদির ছবি আছে?

মুখে কথা ফুটিল না। মাথা নাড়িয়া বীণা জানাইল, আছে।

ঊষাঙ্গিনী বলিল—একবারটি দিয়ো...বাবাকে দিয়ে তার এনলার্জমেণ্ট করিয়ে আমি কাছে রাখবো। বৌদির কি নাম ছিল সলিলা? তোমার মার নাম?

কম্পিত-কণ্ঠে বীণা বলিল—চারুলতা দেবী।

ট্রেণের গতি ঈষৎ মন্থর...

ঊষাঙ্গিনী বলিল—নিজের বোনের মতো আমায় দেখতো সন্তোষদা ...তেম্‌নি ভালোবাসতো।...কর্ম্মচারীর মেয়ে বলে ভাবতো না!... কি-মানুষ যে ছিল...

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বাথ-রুম হইতে আসিলেন, আসিয়া খোলা জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—বর্দ্ধমান এসে গেল রে...এক-গাদা সিগনাল দেখা যাচ্ছে...

৯

বর্দ্ধমান। তিনকড়ি গাঙ্গুলি ছাড়িলেন না। নামিয়া গিয়া আট-দশ টাকার সীতাভোগ-মিহিদানা কিনিয়া আনিলেন।

হাসিয়া ঊষাঙ্গিনী বলিল—ট্রেণে যেতে হলে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা কিনতেই হয়, না বাবা?

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—এ-কথা কেন বললি রে?

ঊষাঙ্গিনী বলিল—এখনকার কথা জানি না। বিয়ের আগে যদ্দিন তোমাদের কাছে ছিলুম, দেখেছি ট্রেণে করে বাইরে গেলে ফেরবার সময় তুমি সীতাভোগ-মিহিদানার ঝুড়ি নিয়ে ফিরেছো…

উচ্চহাস্য করিয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—যা বলেছিস্! জিনিষটায় আমার মোহ আছে। শুধু আমি কেন, বাঙালী-প্যাশেঞ্জারদের মধ্যে ক'জন না কিনে ছাড়ে, বল্‌তো?…এই ট্রেণই তার প্রমাণ পাবি… আমাদের এই কামরাতেই ছাখ্…

তারপর তিনকড়ি গাঙ্গুলি বীণার পানে চাহিলেন, বলিলেন—এ-জিনিষ তুমি কখনো খেয়েছো দিদি?

বীণা বলিল,—না…

—খাও, খাও…বেশী নয়। একটা-একটা করে! মুখে দিলে

বুঝবে, বুড়ো ছোট দাছ কেন এত সাধ্য-সাধনা করছে। খাও দিদি··· লক্ষ্মীটি !

স্নেহের এ অনুরোধে 'না' বলা চলিল না। বীণাকে খাইতে হইল একটা মিহিদানা।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি সাগ্রহ দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলেন, বলিলেন—তোমাকে যা বলেছিলুম, কেমন, ভালো নয় ?

বীণা বলিল,—ভালো।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন—তবু আগেকার মতো আর হয় না। ফাঁকির কারবার স্থুরু হয়েছে দিদি !···কালের দস্তুর ! গিয়ে তোমার দাছকে বরং জিজ্ঞাসা করো···তাঁর নেশা আরো বেশী। ছ'জনে একবার আসছিলুম। বুঝি গয়া থেকে ! বর্দ্ধমান পাশ করবার আগে থেকে কর্ত্তা বার-বার আমাকে তাগিদ দিয়ে বললেন, আমার কামরায় থাকো··· টাইমটেব্‌ল্ দেখে ঘড়িতে এ্যালার্ম দিয়ে রাখো···ট্রেণ কখন বর্দ্ধমানে পৌছুবে ! থামলে, অন্ততঃ পাঁচ টাকার সীতাভোগ-মিহিদানা আমার চাই। বুঝলে দিদি, এই তো তোমার সঙ্গে চললো সীতাভোগ-মিহিদানার ঝুড়ি··· হয়তো তোমার চেয়ে সেখানে এদের বেশী আদর দেখে তোমার হিংসা হবে !···বুঝলে ?

এ-কথা, এ-হাসি বীণার কাণে শুধু স্পর্শ দিতেছিল ; কাণ ছাড়িয়া মনে প্রবেশ করিল না। প্রবেশের পথ নাই। ছশ্চিন্তার বোঝা জমিয়া পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে !

ট্রেণ চলিয়াছে···ছ'পাশে সূর্য্য-কিরণে উজ্জ্বল কত পল্লী···কত মাঠ ·· কত পথ···দীঘি-পুকুর···লোকজনের কত স্নেহ-নীড়···

অবশেষে হাওড়া ষ্টেশন...

বীণা বসিয়া আছে নিস্পন্দের মতো···তিনকড়ি গাঙ্গুলি লগেজ-পত্র গুছাইতে ব্যস্ত...উষাঙ্গিনী বলিল—এবার নামতে হবে। ট্রেণ থামবে।

যাত্রা শেষ হইয়া গেল ?...

কোথা হইতে কে আসিয়া কাণের কাছে কেবলই বলিতে লাগিল—পিশিমা...পিশিমা...পিশিমা !

ট্রেণ থামিল।

কুলি ডাকিয়া তার ঘাড়ে লগেজ-পত্র চাপাইয়া তিনকড়ি গাঙ্গুলি নামিলেন···সঙ্গে উষাঙ্গিনী ও বীণা।

প্ল্যাটফর্ম্মে ছ'পা অগ্রসর হইতেই লোকনাথের সঙ্গে দেখা। লোক-নাথ বলিল,—কর্ত্তা নিজে এসেছেন। ষ্টেশনের বাইরে মোটরে বসে আছেন...

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—একেই ব'লে রক্তের টান !

বলিয়া তিনি চাহিলেন বীণার পানে ; বলিলেন—দাদু তোমাকে নিয়ে যেতে নিজে এসেছেন দিদি...

সামনে লোকনাথকে দেখিয়া বীণা ভাবিল, ইনিই তবে ? তার পা কেমন বাধিয়া গেল। চকিতে সে নিস্পন্দ, নিথর।

আশ-পাশ দিয়া যাত্রীর দল ভিড় করিয়া চলিয়াছে···যেন তরঙ্গ !

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—তিনি গাড়ীতে বসে আছেন। আর ইনি হলেন কর্ত্তাবাবুর দূত। আমাদের লোকনাথদা।

পাকা চুল, সাদা গোঁফ...মনটি স্নেহে-ভরা...মুখে মিষ্ট হাসি... লোকনাথ বলিল,—দেখি দিদি...একবার দাঁড়াও তো

লোকনাথ একাগ্র দৃষ্টিতে বীণার মুখের পানে চাহিয়া রহিল ; তারপর বলিল,—সন্তোষের মুখের সঙ্গে মিল আছে তিনকড়ি ?

বীণা শিহরিয়া উঠিল···সন্দেহ করিয়াছে ?

উষাঙ্গিনী বলিল,—আছে ছোট-জেঠু···ঠাউরে দেখুন···চোখ দু'টিতে যেন সন্তোষদা'র চোখ বসানো রয়েছে ! চোখ দুটি দেখলে সন্তোষদাকে মনে পড়ে···

লোকনাথ বলিল,—হবে ! আমাদের এ বাহাত্তুরে চোখ···আমাদের চেয়ে তোমরা স্পষ্ট দেখবে মা ! এসো দিদি···

যেন লোকারণ্য···পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাশাঠাশি···শুধু লোক আর লোক ! বীণা কাহাকেও চেনে না···কাহাকেও জানে না ! পৃথিবীতে এত লোক আছে···বীণা কল্পনা করে নাই ! বিমূঢ়-দৃষ্টিতে দেখিয়া বীণা ভাবিতেছিল, এত লোক কোথায় ছিল ? কোথায় চলিয়াছে ? তার মতো এরাও কি···

লোকনাথ আর তিনকড়ি চলিয়াছে আগে-আগে ; পিছনে পাশাপাশি চলিয়াছে সে আর উষাঙ্গিনী। উষাঙ্গিনী আঁটিয়া বীণার হাত ধরিয়াছে··· হঠাৎ বীণার খেয়াল হইল ! এমন করিয়া তাকে ধরিয়াছে কেন ? বীণা পাছে পলায় ?

পলাইবার জন্য প্রাণ তার অস্থির ! যেখানে যত ভয় ছিল, সব ভয় তার মনে আসিয়া জড়ো হইয়াছে ! বুকের মধ্যে ঘা' হইতেছে···

বীণা চলিয়াছে···নিজের গতিবেগে নয়···চলিয়াছে উষাঙ্গিনীর টানে···

ঐ মোটর। মোটরে বসিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। এত বয়সেও

চোখ-মুখের দীপ্তি মলিন হয় নাই। ভদ্রলোক সাগ্রহ দৃষ্টিতে লোকারণ্যের পানে তাকাইয়া ছিলেন…তিনকড়িকে দেখিবামাত্র নামিয়া আসিলেন… ভিড় ঠেলিয়া…আবেগ-ভরে।

ডাকিলেন—তিনকড়ি…

তিনকড়ি বলিলেন—এই যে…আপনার হারানিধি এনেছি…

—কৈ? কৈ?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—দাদু…

চকিতের জন্য তারাচরণ রায়ের দৃষ্টির সহিত বীণার চোখের দৃষ্টি মিলিল…সে-দৃষ্টি বীণা বার-বার দেখিল। সঙ্গে সঙ্গে মনের যত ভয়, যত সংশয় অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভিড়ের মাঝখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া বীণা তারাচরণের পায়ে প্রণাম করিল…পায়ের ধূলা লইল।

উত্তেজনার ঘোরে সে পড়িয়া যাইতেছিল, তারাচরণ রায় সবেগে বীণাকে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন…বীণার মাথায় মাথা রাখিলেন। বুকে যত বেদনা যত হাহাকার পুঞ্জিত ছিল, সে-সব বীণার বুকের স্পর্শে যেন মুছিয়া ফেলিবেন!

তার পর দু'হাতে বীণাকে ধরিয়া বলিলেন—একবার ভালো করে দেখি দিদি…

তারাচরণের মুখের পানে বীণা চাহিয়া রহিল। মন বলিতে লাগিল, আমাকে আশ্রয় দাও গো—তোমার গভীর স্নেহে নিরাপদ আশ্রয়! আমি নীচ…আমি হীন…আমি চোর! এ জীবন-পারাবারে কোথাও কূলের রেখা দেখি নাই! নৈরাশ্যে দুঃখে আমি বড় কাতর…এত-বড়

পৃথিবীতে কোথাও আমার কেহ নাই যে স্নেহ করিবে! তোমার স্নেহের ধারায়···ওগো তুমি···

বীণার দুই চোখ নিমীলিত হইয়া আসিল—দেহে-মনে অবসাদ···

কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে বীণার পানে চাহিয়া থাকিবার পর তারাচরণ রায় মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

তার পর তিনকড়ির পানে চাহিয়া বলিলেন,—বাড়ী চলো। তোমরাও এসো। এসো মা উষা···

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—আমরা আলাদা গাড়ী করছি। মোট-ঘাট আছে।

তারাচরণ বলিলেন,—না, না, না। লোকনাথ আছে। তাকে মোটঘাট বুঝিয়ে দাও···লোকনাথ ট্যাক্সিতে করে মোটঘাট নিয়ে আসবে। তোমরা এসো আমার গাড়ীতে। আমরা একসঙ্গে যাবো··· আমার দিদি, আমি, উষা আর তুমি···

তাহাই হইল। চার জনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ড্রাইভার গাড়ী ছাড়িল।

তারাচরণ রায়ের মুখে কথা নাই···বীণা নীরব নিস্পন্দ। তার মনে হইতেছিল, সে যেন আর এক দেশে আর এক মূর্ত্তিতে নূতন জন্ম লইয়াছে!···সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল ক্ষীরোদাময়ী··· মিণ্টু পিণ্টু সিণ্টু···তাদের পিছনে সেই মহাদেও···

গাড়ী আসিল হাওড়ার পুলের উপর···

তারাচরণ কহিলেন—উষা এখন কেমন আছিস মা?

—ভালো আছি, জ্যাঠামশাই।

তারাচরণ কহিলেন—এ-বয়সে শান্তিতে তোরা আর বাস করতে দিলিনে মা···এ কি কম যাতনা!

উষাঙ্গিনী বলিল—রোগের যাতনার চেয়ে ঐ যাতনা আমারো আরো বেশী মনে হয় জ্যাঠামশাই! আমরা একটু ভালো থাকলে তোমরা কত ভালো থাকো, তবু···

তারাচরণ রায় বলিলেন—হু'জনে ভাব হয়েছে তো?···মানে, সলিলার সঙ্গে?

উষাঙ্গিনী বলিল—হয়নি? খুব ভাব হয়েছে। চমৎকার মেয়ে সলিলা। সন্তোষদার গুণগুলি সব ও পেয়েছে। জানো জ্যাঠামশাই, কিছুতে সেকেণ্ড-ক্লাশে এলো না। বললে, না, একসঙ্গে যাবো···পিশিমার অসুখ···পিশিমার কখন কি দরকার হবে না হবে!···গাড়ীতে আমার কত সেবা করেছে···যেন গিন্নী-বান্নী মা-ঠাকরুণ! সত্যি জ্যাঠামশাই!

উষাঙ্গিনীর মুখে উচ্ছ্বসিত বাক্যলহরী···তারাচরণ সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছেন বীণার পানে; আর বীণা বসিয়া আছে যেন কাঠের পুতুল!

উষাঙ্গিনী বলিল—একটি রাত্রে সলিলা আমায় এমন করেছে জ্যাঠামশাই যে আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওকে ছাড়বো না···ওর সঙ্গে তোমার ওখানে গিয়ে উঠি···ওর পাশে-পাশে থাকি!

তারাচরণ কহিলেন—তাই চ' না···আমাদের ওখানেই থাকবি।

উষাঙ্গিনী কোনো জবাব দিল না।

তারাচরণ বলিলেন,—দোটানায় পড়ে গেলি···না? ও-বাড়ীতে মা···এ-বাড়ীতে সলিলা...এঁ্যা!···তা বেশ, বাড়ীতে গিয়ে মাকে দেখে-শুনে তারপর আস্‌বি···কেমন? মা আস্‌তে দেবে তো?

উষাঙ্গিনী বলিল—কেন দেবে না ?

—তাহলে ?

উষাঙ্গিনী বলিল—আজ থাক্ জ্যাঠামশাই ! তোমার নাৎনি এলো ···চেনো না, জানো না···ওকে আজ কাছে-কাছে রেখে ওর সঙ্গে ভাব করো। আমরা তো আছিই···

তারাচরণ রায় বলিলেন—আছিস্ মা ! তোর সঙ্গে যখন ভাব হয়েছে···নাহলে ওর মন কেমন করবে তো ! প্রথম-প্রথম···নতুন জায়গা···চারিদিকে সব নতুন···

উষাঙ্গিনী বলিল—আসবো বৈ কি জ্যাঠামশাই, আমি রোজ আসবো।

—তাই আসিস মা···

তার পর সকলে চুপ···

তারাচরণ রায় এ নীরবতা ভঙ্গ করিলেন' ডাকিলেন—তিনকড়ি···

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বসিয়াছিলেন সামনের শীটে ড্রাইভারের পাশে··· তারাচরণ রায়ের আহ্বানে বলিলেন—ডাকচেন ?

তারাচরণ কহিলেন—হ্যাঁ। সেখানে তারা কোনো আপত্তি করেনি ?

সংক্ষেপে সারিবার জন্য তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন—না, আপত্তি করবে কেন ?

তারাচরণ রায় বলিলেন—আমার বড্ড ভয় হয়েছিল। ভেবেছিলুম, হয়তো বলবে, এ্যাদ্দিন দাদুর এ-মায়া কোথায় ছিল ? তাতে আর কিছু না হোক, সলিলা মনে ব্যথা পেতো।

তিনকড়ি গাঙ্গুলি বলিলেন,—খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে···আর হবে না

কেন ? কি বাপের মেয়ে !···আমাকে কি আদর-যত্ন করলে, দাদুর কাছ থেকে গিয়েছি···দাদুর লোক !·· ভগবানের দেওয়া 'মায়া···তার কি মার আছে ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—হুঁ···

তার পর আবার স্তব্ধতা···

তারাচরণ রায় আবার কথা কহিলেন, বলিলেন—তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবো ? না, আগে আমরা নামবো ?

উষাঙ্গিনী কহিল—আগে তোমরা নামো জ্যাঠামশাই ! সলিলা কাল সারা রাত ঘুমোয়নি···ঠায় জেগে কাটিয়েছে !···তোমাদের দেখবে বলে কতখানি ব্যাকুল···তাতে কি ঘুম হয় ! ও বড্ড ক্লান্ত হয়েছে··· ছেলেমানুষ···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বেশ···তাই হবে। আগে আমাদের নামিয়ে তার পর তোমরা বাড়ী যেয়ো···

আবার নীরবতা···

বাহিরে সারা সহর ইহারি মধ্যে কাজের নেশায় মত্ত হইয় উঠিয়াছে···

বীণা চাহিয়াছিল বাহিরের দিকে···এ যেন আর এক পৃথিবী ! এর কোনোখানটার সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নাই !···এত ভিড়···এত লোক ···এত গাড়ী-ঘোড়া···

উষাঙ্গিনী ডাকিল—সলিলা···

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা উষাঙ্গিনীর পানে চাহিল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—কলকাতা কেমন লাগছে ?

মৃদু-কণ্ঠে বীণা কহিল—ভালো।

তারাচরণ রায় বলিলেন—আর এই বুড়ো দাদুকে ?

বীণা তারাচরণ রায়ের পানে চাহিল। মনে হইল, যেন স্বপ্ন ! মুখে কথা ফুটিল না।

নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—আমাকে ভালো লাগছে না ? না দিদি ?

মাথা নাড়িয়া কম্পিত মৃদু-কণ্ঠে বীণা কহিল—ভালো লাগছে দাদু।

১০

মোটর আসিয়া তারাচরণ রায়ের সুবৃহৎ গৃহের ফটকে প্রবেশ করিল।

ফটকে মঙ্গল-কলস। পত্র-পল্লবের ঝালর ঢুলিতেছে। সানাই বাজিতেছে। রীতিমত উৎসব!

গাড়ী থামিল। বীণার মনে চেতনা নাই। সমস্ত দেহে-মনে দারুণ কম্পন!

তারাচরণ রায় গাড়ী হইতে নামিলেন, বলিলেন—নামো দিদি। এই আমাদের বাড়ী···

কোনোমতে দেহে-মনে শক্তি সংগ্রহ করিয়া বীণা গাড়ী হইতে নামিল। নামিয়াই ঊষাঙ্গিনীর পানে চাহিল; বীণার দু' চোখে বাষ্পোচ্ছ্বাস!

মৃদু হাস্যে ঊষাঙ্গিনী বলিল—আমার দিকে চেয়ে কি দেখছো?

জড়িত স্বরে বীণা কহিল—তুমি আসবে না?

সে আসিলে বীণা যেন মস্ত সহায় পায়! ঊষাঙ্গিনীকে ধরিয়াই এ-পুরীতে সে যেন একটু নিশ্চিন্ত মনে প্রবেশ করিতে পারে!

ঊষাঙ্গিনী কহিল—না, এখন আর নামবো না। এখন বাড়ী যাই···

কেমন? সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করে' খাওয়া-দাওয়া সেরে যত শীগ্‌গির পারি, আমি আসবো।

তারাচরণ রায় বলিলেন—তাই আসিস, ঊষা।

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় চাহিলেন, বীণার পানে, কহিলেন—এসো দিদি। ঊষা আসবে বৈ কি···নিশ্চয় আসবে।

তারাচরণ রায় গৃহপ্রবেশ করিলেন; বীণা চলিল তাঁর পিছনে যন্ত্রচালিতার মতো।

লোকজন সকৌতূহলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাদের সে-দৃষ্টির স্পর্শ লইয়া বীণা চলিল।

দোতলায় ক'টা ঘর-বারান্দা পার হইয়া অন্দরের দিকে একটা ঘর। ঘরটি বেশ বড় এবং সুসজ্জিত। ঘরে খাট আছে, বিছানা আছে, ড্রেসিং-টেবিল, কাচের আল্‌মারি—মেঝেয় আগাগোড়া পুরু গালিচা পাতা। ফুলদানীতে রাশীকৃত ফুল।

এ-ঘরে আসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—এটি তোমার ঘর। এ-ঘর তার ছিল···তার পর বন্ধ থাকতো। তোমার চিঠি পেয়ে এ-ঘর খুলিয়ে সাজানো হয়েছে।···চেয়ে ছাখো···পছন্দ তো?

কোনোমতে চোখ তুলিয়া বীণা ঘরের চারি দিকে চাহিল। সঙ্কোচে ভয়ে চোখ যেন মুদিয়া আসে!

তারাচরণের সস্নেহ সাগ্রহ দৃষ্টি! তারাচরণ রায় বলিলেন—পাশেই বাথ-রুম। ওদিকে আর একটা সাইড-রুম। তাতে কাপড়-চোপড় থাকবে।···ঐ ছবিখানা ছাখো···তোমার বাবার ছবি। গ্রাজুয়েট হয়ে কনভোকেশন থেকে ফেরবার সময় এ-ছবি তুলিয়েছিল। আসল ছবি

অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল—সম্প্রতি এনলার্জ্জ করিয়ে এনেছি। তোমার মায়ের ছবি তোমার কাছে আছে?

বুক কাঁপিতেছে! এমন অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িতে হইবে, কে ভাবিয়াছিল? এ-পরীক্ষার আভাসও যদি তার মনে জাগিত, তাহা হইলে...

বীণা কহিল—আছে।

স্বর যেন কণ্ঠ ছাড়িয়া বাহির হইতে চায় না! ভয়ে আতুর মূর্চ্ছিত-প্রায়!

তারাচরণ রায় বলিলেন—দিয়ো, দেখবো। দেখে এনলার্জ্জ করিয়ে আনাবো। সে-ছবি রাখবো সামনের দেওয়ালে। ছ'খানি ছবি সামনা-সামনি থাকবে—কেমন?

মাথা নাড়িয়া বীণা কোনো মতে জানাইল, হাঁ।

তারাচরণ রায় বলিলেন—তুমি বিশ্রাম করো। বাথ-রুমে দাঁতের মাজন, জল, সাবান, তোয়ালে সব ঠিক আছে।...জিরোও।...তোমার একজন আলাদা দাসী আছে—মুরলা। সে...তাই তো, তার বুঝি হুঁশ হয়নি, আমরা এসেছি?

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় দ্বারের দিকে চাহিলেন, ডাকিলেন—মাতাব...

মাতাব খাস-খানসামা। বাহিরে ছিল। তারাচরণ রায়ের আহ্বানে ঘরে আসিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—দিদিমণির দাসী মুরলা...কোথায় সে? তাকে ডাক্।

মাতাব চলিয়া গেল...

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এত-বড় পুরী যেন অরাজক হয়ে আছে!... আমাকে মানে...সে-মানা ঐ মাইনের জন্য। তাছাড়া—খেতে-পরতে দিচ্ছি তার জন্যও! যাকে বলে সত্যিকার দরদ-মমতা, তা এখানে কারো মনে নেই!...এতদিন এ দরদের কোনো তোয়াক্কা রাখিনি দিদি! এখন বুড়ো হয়ে একটু দরদ-মায়ার জন্য মনটা কেমন হা-হা করে।...তুমি এসেছো...মনে হচ্ছে, শেষ ক'টা দিন একটু আরামে যদি কাটে!...তোমাকেও একটা কথা বলে রাখি দিদি...

এ-কথা বলা হইল না। কথার মধ্যে ঘরে আসিলেন দাক্ষায়ণী পিশিমা; দাক্ষায়ণীর পুত্র শশিকান্ত এবং কন্যা বিরজা।

তারাচরণ রায় বলিলেন—তোমাদের হুঁশ হয়েছে তাহলে...

দাক্ষায়ণী বলিলেন—বসে-বসে তোমাদের দেরী দেখে ভাবলুম, চানটা করে নি—ভটচায্যি মশায়ের আসবার কথা সকালে। তাই···

তারাচরণ এ-কথার জবাব দিলেন না; বীণার পানে চাহিলেন, চাহিয়া বলিলেন—ইনি দাক্ষে···তোমার পিশিমা হন! এটি ঐ পিশিমার ছেলে শশিদাদা, আর এটি তোমার পিশিমার মেয়ে বিরজাদিদি...

এই পিশিমার কথা বীণা শুনিয়াছে! এবং তিনকড়ি গাঙ্গুলি ও উষাঙ্গিনীর কাছে পিশিমার যে-পরিচয় পাইয়াছে, সে-পরিচয় পাওয়া-অবধি মনে জাগিয়াছে—বইয়ে-পড়া একটি কথা! সে-কথা—দিনের আলো দেখিয়া খুশী হইয়ো না, ঐ-দিনের আলোর পিছনে আছে রাত্রির অন্ধকার!

নিঃশব্দে ভূমিষ্ঠ হইয়া বীণা পিশিমাকে প্রণাম করিল। পায়ের ধূলা

লইতে গেল। পিশিমা দাক্ষায়ণী দু'পা হঠিয়া গেলেন, বলিলেন,—থাক্ মা, আর পায়ে হাত দিতে হবে না। তোমার রেলের কাপড়—আমি চান করেছি…ঠাকুর-ঘরের কাজ করছি কিনা…

তাঁর যে-পরিচয় বীণার মনে গাঁথা আছে, এ কথায় সে-পরিচয় আরো নিবিড় হইয়া উঠিল।

বিরজা ও শশিকান্তকেও বীণা প্রণাম করিতে যাইতেছিল, তারাচরণ রায় বলিলেন,—ওদের আর ঘটা করে প্রণাম করতে হবে না…ভারী তো গুরুজন! ওঃ! দাদা আর দিদি…ওদের এত ভক্তি-শ্রদ্ধা না করলেও চলবে। ওদের সঙ্গে হলো স্নেহের সম্পর্ক!…কি বলো শশি? বিরজা?

শশিকান্ত ও বিরজা কোনো জবাব দিল না…নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

তারাচরণ চাহিলেন দাক্ষায়ণীর পানে; বলিলেন—সলিলার জন্য মুরলাকে কায়েমী করলুম। তা কোথায় সে? তাকে দেখছি না… সে-ও চান করতে গেল না কি?

দাক্ষায়ণী বলিলেন—না। এই সকালবেলায় তার চান করবার তাড়া কিসের!…ত্যাখ্ তো মা বিরজা, মুরলা কি করছে…

বিরজা বাহিরে গেল।

তারাচরণ বলিলেন,—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও দিদি! তার পর আমি তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।…যাও, বসে থেকোনা। কাপড়-চোপড় যা সঙ্গে এনেছো, তা পরে দেখো। বাথ-রুমে আলাদা কাপড়-চোপড় পাবে। তবে সেমিজ আর ব্লাউশ…এ দুটো জোগাড় হয় নি। মানে, ভেবেছিলুম, তুমি এলে মাপ দিয়ে তৈরী করিয়ে দেবো।…হ্যাঁ,

তুমি যাও দিদি, যাও তার পর দু'জনে এক সঙ্গে বসে চা খাবো। আমি এখনো চা খাইনি...তোমার জন্য চা খাওয়া মুলতুবী রেখেছি। দেরী করলে আমারো চা খেতে দেরী হবে। হ্যাঁ, যাবার আগে তোমার চাবিটা দিয়ে যাও...তোমার সেমিজ বার করে রাখি।

এ-কথার পর বীণা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। চাবি দিতে হইল। তারাচরণ রায়ের হাতে চাবি দিয়া বীণা বাথ-রুমে ঢুকিল···

না ঢুকিলে স্বস্তি পাইতেছিল না! একেবারে এতখানি ভিড়ের মধ্যে ···তার উপর এ দলটির যে বিরোধিতার সংবাদ পাইয়াছে!...মনে হইতেছে, তারাচরণ রায়ের সঙ্গ এক-নিমেষ ছাড়িয়া থাকা চলিবে না! এ ছলনা, এ কাপট্য বীণার মনে কাঁটার মতো বিঁধিয়া থাকিলেও তারাচরণ রায়ের সে যাতনায় বিরাম ঘটিবে!...

বাথ-রুমে চমৎকার ব্যবস্থা। দাঁত মাজার ব্রাশ, মাজন, মাথায় মাখিবার গন্ধ-তৈল, ভালো সাবান, তোয়ালে...স্নানের জন্য পোর্শিলেনের শুভ্র জলাধার...

বীণার দুই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে দাঁড়াইয়া রহিল··· নিথর, নিস্পন্দ···

অনেকক্ষণ। হুঁশ ছিল না। সহসা দ্বারে মৃদু করাঘাত···সঙ্গে সঙ্গে নারী-কণ্ঠে মৃদু আহ্বান,—দিদিমণি···

চমকিয়া দ্বার খুলিতেই বীণা সামনে দেখে মধ্য-বয়সী এক রমণী। তার মুখে-চোখে বেশ একটু মিষ্টতার আমেজ! বীণা তার পানে চাহিয়া রহিল।

রমণী কথা কহিল, বলিল—আমি মুরলা। কর্ত্তাবাবু এই সেমিজ আর জামা দিলেন। তিনি নিজে তোমার বাক্স খুলে বার ক'রে দেছেন। আমাকে বললেন, তোর দিদিমণিকে ডেকে এগুলো দে। শাড়ী পাশের-ঘরের আনলায় আছে। আমি রেখে গেছি···

বীণা নিঃশব্দে সেমিজ-ব্লাউশ লইল। এ-ব্লাউশ নিজের হাতে তৈয়ারী করিয়াছে। ক্ষীরোদাময়ী কোথা হইতে খানিকটা ছিট আনিয়া দিয়াছিলেন। সে ছিটে তাঁর তোরঙ্গের ঢাকা সেলাই করিয়া দিয়াছিল; বাকী যে-কাপড়টুকু বাঁচিয়াছিল, তাই দিয়া এই ব্লাউশ্। এ-বাড়ীর সজ্জা-পরিপাট্যের সামনে এ-ব্লাউশের দৈন্য তার চোখে কটু লাগিল। কিন্তু···

জামা সেমিজ লইয়া ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বীণা মুখ-হাত ধুইতে প্রবৃত্ত হইল।

তার পর স্নান সারিয়া তারাচরণের দেওয়া শাড়ী পরিয়া বাথ-রুম হইতে ফিরিল। ফিরিয়া দেখে, তারাচরণ রায় সোফায় বসিয়া আছেন।

বীণাকে দেখিয়া বলিলেন—চা আনতে বলি?

বীণা বলিল,—আমি চা খাই না।

—চা খাও না!

—না।

—বেশ। তাহ'লে দুধ দিতে বলি। চা খাও না শুনে খুশী হলুম। যদিও খেলে মন্দ হতো না···চায়ের টেবিলে একজন সঙ্গী পেতুম। তা চা না হোক, দুধ খাবে আমার সঙ্গে বসে। এ-বয়সে দুধ খাওয়াটাই তোমাদের দরকার, দিদি!

মাতাবকে তিনি ডাকিলেন। মাতাব আসিলে বলিলেন,—দুধ আন্ তোর দিদিমণির জন্য···তার পর আমাকে চা দে। ঠাকুরকে বলে আয়, দিদিমণির চান হয়ে গেছে, খাবার নিয়ে আসবে।

বীণার জন্য দুধ আসিল। তারাচরণের জন্য আসিল চা, টোষ্ট! ঠাকুর আসিল। তার হাতে প্লেটে লুচি, আলু-পটল-ভাজা মিষ্টান্ন···

বীণা বলিল—অত খেতে পারবো না।

—পারবে না?

তারাচরণ রায় বীণার পানে চাহিলেন। বুঝিতে বাকী রহিল না, অভাবে-দারিদ্র্যে ক্ষুধা মরিয়া গিয়াছে! কহিলেন,—এ বয়সে সকালে ক'খানা লুচি আর দুধ···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন—শুধু-দুধটা খাওয়া ঠিক হবে না। খাবারের মধ্যে যা-হয় একটু মুখে দাও। এ-তোমার আপনার ঘর···এখানে কুটুম্বিতে নেই···লজ্জাও নেই! খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবো না।···তোমার যা ইচ্ছা হয়···মানে, একটু-কিছু···

মুখে কিছু দিতে হইল।···

কিন্তু এ স্নেহ পদে পদে বীণাকে কণ্টকিত করিতে লাগিল। ছলনা ···বিরাট ছলনায় এ সে কি করিয়াছে! এত বড় অপরাধ···এমন পাপ···ভগবান কখনো সহিবেন না! তার চেয়ে···

তারাচরণ রায়ের পায়ের উপরে পড়িয়া যদি বলি, আমাকে ক্ষমা করুন! আমার এ পাপের জন্য আমি মার্জ্জনা চাই। মার্জ্জনা করিয়া একটু স্নেহাশ্রয়—ঐ মুরলার সঙ্গে থাকিয়া মুরলার মতো এ-গৃহে

দাস্য করিব! তার বেশী আর কিছু চাহি না···আর কিছু চাহিবার অধিকার আমার নাই!···

মনের ভিতরটা অশ্রুর বাষ্পে ভরিয়া ফাঁপিয়া ফুশিয়া উঠিতেছিল!

তারাচরণ রায় বলিলেন—তোমার বাক্সে ছবি দেখলুম···তোমার বাবার আর মা'র। একবার দিয়ো···এনলার্জ করতে দেবো। তোমার জিনিষপত্র যেমন, তেমনি আছে; ঘাঁটিনি।···বড় কষ্টে ছিলে দিদি! অদৃষ্টের ভোগ!···খাওয়া হ'লে আমার সঙ্গে এসো। বাড়ী-ঘর দেখে বাড়ী-ঘরের সঙ্গে পরিচয় ক'রে নেবে···তোমাকে সব বুঝে নিতে হবে। তার পর দুপুরবেলায় দর্জী গফুরকে আসতে বলে দিছি···প্যাটার্ণ নিয়ে সে আসবে। প্যাটার্ণ দেখে নিজের পছন্দমতো সেমিজ-ব্লাউশ্, পেটিকোট-টোট্ যা-যা সব দরকার, করতে দিয়ো।

বীণা কোনো কথা কহিল না···কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

১১

বেলা এগারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বীণা নিজের ঘরে সোফায় চুপচাপ বসিয়াছিল। মনের মধ্যে যেন লক্ষ্য ফৌজ নানা অস্ত্র-শস্ত্রে ভূষিত হইয়া মার্চ্চ করিয়া ফিরিতেছে···তীব্র বেগে মাথায় রক্ত-স্রোত বহিতেছে! যে-কথা ভাবিতে যায়, সেই কথাই প্রচণ্ড কল কোলাহলে ডুবিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ঝরিয়া পড়ে।···দুগ্র্হ!

জোর করিয়া ভাবিতে বসিল কাশীর কথা। সেখানে না জানি কি হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে! কত কু-কথা, কত ভৎর্সনা, কত নিন্দাবাদই না চলিয়াছে!···তারা কি ভাবিতেছে? যদি সেখানে ফিরিতে পারিত··· সে-ভৎর্সনা, সে কু-কথা ভূষণের মত অঙ্গে লইত! এখানে এ কি অনিশ্চয়তা···কি সংশয়! এখন এই বসিয়া আছে···পরক্ষণে কি হইবে··· কোথা দিয়া কি নিষ্ঠুর বজ্রপাত···

বিরজা আসিয়া বলিল—বসে আছো!

বীণার মুখে কথা ফুটিল না···সে শুধু বিরজার পানে চাহিয়া রহিল।

বিরজা বলিল—তোমার সঙ্গে ভাব করতে এলুম।

সামনের চেয়ারে বিরজা বসিল; বলিল—চুপ করে বসে আছো!

বিরজা বলিল—সন্তু মামাকে দেখেছিলুম···সে কত কালের কথা! আমি তখন খুব ছোট···তবু সন্তু মামার চেহারা বেশ মনে আছে!···এত দুঃখ হয়, যখন সন্তু মামার কথা ভাবি! দাদামশাই কি-রকম যে চ'টে গেলেন বিয়ের কথা শুনে···

বিরজা নিশ্বাস ফেলিল।

বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল···এখনি না-জানি কত রকমের প্রশ্ন-বাণে বিদ্ধ করিবে!

বিরজা বলিল—একটি-একটি করে সব কথা শুনবো ভাই।···বড় হয়ে সব বুঝতে শিখেছি তো!···মা-টা কত রাগ করতো। বলতো, কি-বংশের ছেলে···তার আবার বিয়ের ভাবনা! কত রাজা-রাজড়া সাধ্য-সাধনা ক'রে পায়ে মেয়ে ধ'রে দিত!···আগে অত বুঝতুম না। ভাবতুম, সন্তু মামা বুঝি ভয়ানক অন্যায় করেছে!···এখন বুঝতে পারি। ···মামীমা দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন···না?

কোনোমতে বীণা জবাব দিল। বলিল—হঁ্যা।

বিরজা বলিল—তোমার চেয়েও রঙ্ ঢের ফর্শা ছিল?

বীণার মনে পড়িল চারুলতার সেই লক্ষ্মীর মতো শ্রী! বলিল—হ্যাঁ।

বীণাকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণান্তে বিরজা বলিল—তোমার রঙ হয়েছে বুঝি সন্তু মামার মতো?

বীণা বলিল—জানি না।

বিরজা চুপ করিল। কি ভাবিতে লাগিল। তার পর বলিল—তুমি নিশ্চয় খুব লেখা-পড়া শিখেছো! সন্তু মামা খুব বিদ্বান ছিল!

বীণা এ-কথার কোন উত্তর দিল না। মনে-মনে ভগবানকে ডাকিতে

লাগিল,—ঠাকুর…এ-সব প্রশ্ন-বাণ হইতে রক্ষা করো! কি প্রশ্ন কখন করিয়া বসিবে…বীণা তার কি উত্তর দিবে…

বিরজা বলিল—যে-দিন তোমার চিঠি এলো…তুমি লিখলে এখানে আসবে, সে-দিন দাদামশাইয়ের কি আহ্লাদ! এ-ঘর বরাবর বন্ধ থাকতো …এ-ঘরে কারো ঢোকবার জো ছিল না! তোমার চিঠি পেয়ে দাদামশাই নিজের হাতে ঘর খুলে এর সজ্জার ব্যবস্থা করলেন। মিস্ত্রী এলো… কত কি হলো। এ-ঘরের এমন মূর্ত্তি যে দেখছো, এ তোমার জন্য হয়েছে!

বীণা কোনো কথা কহিল না। তার বুকের উপর দিয়া যেন একরাশ কামানের গাড়ী চলিয়াছে! কায়-মনে সে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল…

ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ঊষাঙ্গিনীকে তিনি পাঠাইলেন এ-ঘরে বীণার কাছে।

ঊষাঙ্গিনী বলিল—একটু দেরী হয়ে গেছে আমার আসতে…না? প্রথম দিন কি না…মার কথা আর ফুরোয় না। মাও তোমাকে দেখতে এসেছে।

তার পর বিরজার পানে চাহিল। চাহিয়া বলিল—বিরজা-দিদির সঙ্গে ভাব হলো?

বিরজা বলিল,—আমি তো এইমাত্র এলুম।…ওদিকে কুটনো কুটে দিলুম কি না…রাত্রে লোকজন খাবে। দাদামশাই অনেককে নেমন্তন্ন করেছেন…যাকে বলে, যজ্ঞি!

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—ওঁর মনে আজ যেমন দুঃখ, তেমনি সুখ! কি করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না! আমি আসবামাত্র যেমন দেখলেন… আমাকে ডাকলেন। বললেন, অনেক মেয়ে-ছেলে আসবে নেমন্তন্ন,

কি করি বল্ তো উষা? নাচগানের ব্যবস্থা করবো না কি? আমি বললুম, না জ্যাঠামশাই। যারা আসবে, তারা সব আপন-জনের মতো... আপনার নাৎনীর সঙ্গে চেনা-শোনা করতে আসবে। গান কে শুনবে, বলুন তো?...তাতে বললেন, তা' বটে! ভাগ্যে তুই বুদ্ধি দিলি... নাহলে ওদের আমি বলছিলুম, একজন ভালো গাইয়ে আনতে...রেডিয়োতে গায়, এমন কোনো মেয়েছেলে!

বীণা একাগ্র মনোযোগে এ-কথা শুনিল; কোনো কথা বলিল না। তার মনে হইতেছিল, যেন স্বপ্ন দেখিতেছে!

থাকিয়া-থাকিয়া সানাই বাজিতেছে...লোক আসিতেছে, জন আসিতেছে···তাকে ঘিরিয়া সবার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল আর আগ্রহ···

বীণাকে নিরুত্তর দেখিয়া উষাঙ্গিনী বলিল,—এমন চুপচাপ রয়েছো কেন? ট্রেণে আসার জন্য কষ্ট? ঘুমোবে একটু?

বীণা কহিল,—না।

উষাঙ্গিনী বলিল,—একটু ঘুমোলে বোধ হয় ভালো হয়···মানে, বিশ্রাম! রাত্রে পাঁচজন লোক আসবে, খাওয়া-দাওয়া আছে···শুতে দেরী হবে, সেই সঙ্গে বেশ ধকল পড়বে!

বীণা বলিল,—ঘুমোবো না।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে চাহিল উষাঙ্গিনীর পানে। ইচ্ছা হইতেছিল, উষাঙ্গিনীকে বলে, এ কোলাহল বন্ধ করিয়া দিতে পারো না? এ ভিড়ে আমার মনে যে কি হইতেছে···

কিন্তু বিরজা আছে! উষাঙ্গিনী একা থাকিলে এ-কথা হয়তো বলিতে পারিত—বলিতে বাধিত না।

বাহিরে তারাচরণ রায়ের কণ্ঠ শুনা গেল। তারাচরণ রায় কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন এবং কথা কহিতে কহিতে তিনি এ-ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিছনে লোকনাথ।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সকলেই আছো এখানে...ভালো!...তোর মা কোথায় রে বিরি?

বিরজা বলিল,—একটু আগে মার পূজো সারা হয়েছে। এখন বোধ হয় খেতে বসেছে।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোর মাকে বলে আয়, খাওয়া হলে যেন এ ঘরে আসে।...সলিলার জন্য কাপড় নেবে। কখানা কাপড় এনেছে ...স্থতির শাড়ী, সিল্ক-শাড়ী। পাঁচ-রকমের পাঁচখানা আর কি!

বিরজা বলিল,—দেখছি, মার খাওয়া চুকতে কত দেরী।

—হ্যাঁ, যা।

বিরজা চলিয়া গেল।

তারাচরণ রায় চাহিলেন লোকনাথের পানে। লোকনাথের হাতে কাপড়ের বাণ্ডিল। তারাচরণ বলিলেন,—রাখো তোমার কাপড়ের বাণ্ডিল। ঊষা আছে, দিদি আছে...দু'জনে ততক্ষণ দেখুক।...ছাখ্ তো ঊষা...সলিলা-দিদির জন্য কখানা শাড়ী বাছ্ তো!

আদরের এ উগ্রতায় বীণা অভিভূত হইয়া পড়িল। এ সব চাহিয়া সে এখানে আসে নাই...এখানে আসিবার বাসনা যা ছিল...

দানের এ ঘটায়, অভ্যর্থনার এ সমারোহে তার মন তাই ভয়ে-ভাবনায়-কুণ্ঠায় একেবারে এতটুকু হইয়া পড়িয়াছে!

বাণ্ডিল খুলিয়া ঊষাঙ্গিনী কহিল,—এসো সলিলা, পছন্দ করো...

লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া আ[illegible] কুণ্ঠিত স্বরে বীণা বলিল,—আমি জানি না পিশিমা।

তারাচরণ রায় এ-কথা শুনিলেন এবং বীণার এ কুণ্ঠা লক্ষ্য করিলেন। বুকের কোথায় বাণ-বেঁধার যাতনা অনুভব করিলেন।··বেচারী··· অবহেলায় [illegible]ভাবে মন একেবারে পঙ্গু হইয়া গিয়াছে! আপন-জনকে আপন করিয়া লইতে কতদিন যে এখন ও-মন পদে-পদে দ্বিধায় আতুর হইবে!

তিনি বলিলেন,—তুই ঢ্যাখ্ ঊষা···তোর পছন্দ হলেই দিদির পছন্দ হবে···কেমন দিদি?

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিলেন বীণার পানে। সে-দৃষ্টি বীণা দেখিল। দেখিয়া স্বস্তি বোধ করিল! ঘাড় নাড়িয়া বীণা জানাইল, হাঁ···

সন্ধ্যার আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে গৃহে উৎসবের সাড়া জাগিল। নিমন্ত্রিত নর-নারীর ভিড় জমিতে লাগিল।

তারাচরণ রায়ের কথায় বীণাকে সজ্জা-ভূষণ করিতে হইল। দামী শাড়ী·· গায়ে দামী গহনা···

তারাচরণ রায় বলিলেন—এ সব গহনা তোমার। কতক ছিল তোমার ঠাকুমার···আর কতক তিনি গড়িয়ে রেখেছিলেন তোমার মা এলে তোমার মাকে পরাবেন বলে!···তোমার বাবা এ-সব না বুঝে··· কিন্তু ও-সব কথা থাক্···

আবেগের মুখে অতীতের সব-কথা মনের দ্বারে খরস্রোতে ভাসিয়া

আছে! অনেক দেখিয়া অনেক সুহিয়া সে-কথাকে আজ দমন করিতে পারিয়াছেন!···যা গিয়াছে, তার উপর হাত নাই! মিথ্যা তার জন্য দুঃখ পুষিয়া অনুতাপ পুষিয়া এখনো যা আছে, কেন তাহা নষ্ট করি?···না, ও-চিন্তা আর নয়!···

নানা জনে আসিয়া বীণাকে দেখিতে লাগিল। দেখিয়া কেহ নীরব রহিল; কেহ বা ভালো-মন্দ দু'কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। সকলের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে নিজেকে মেলিয়া বীণা রহিল···যেন পুতুল! ···সকলে তাকে পরখ করিতে আসিয়াছে! তার যেন চেতনা নাই··· অনুভূতি নাই! তাকে দেখিয়া যার যেমন খুশী মন্তব্য প্রকাশেরও যেন মস্ত অধিকার আছে, এবং সে-সব মন্তব্যে তার বিচলিত হইবার উপায় নাই!

মেয়েদের মধ্যে কেহ বলিল—মেয়ে যদি মায়ের মতো হয়ে থাকে, তাহলে বলবো, আমার ভাইঝি পারু আরো সুন্দরী! দেখেছো তো, পারুর যে-মেয়ে হয়েছে···যেমন রঙ, তেমনি গড়ন···যেন দুর্গা-প্রতিমা!

কেহ বলিল—ডাগর ছেলে···বিয়ে না দিয়ে একলা ছেড়ে রাখলে··· যে-মেয়েকে দেখবে, তাকেই সে ভাববে পরী! এ না হয়ে যায় না!

বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া আছে···চারিদিকে এমনি গুঞ্জন-রব চলিয়াছে! ভালো কথা বড়-একটা শুনিল না।···ভাবিতেছিল, ভালো কথা বলিতে মানুষের কণ্ঠ সত্যই রুদ্ধ হয়? ভালো কথা বলা এমন অসম্ভব?

মেয়েদের ভিড় ঠেলিয়া তারাচরণ রায় ঘরে আসিলেন। সঙ্গে এক জন ভদ্রলোক।

তারাচরণ বলিলেন—নমস্কার করো দিদি।...হিরণ্ময়। তোমার বাবার ছেলেবেলার বন্ধু।

বীণা উঠিয়া প্রণাম করিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমার মার সঙ্গে তোমার বাবার যখন বিয়ে হয়, হিরণ্ময় তখন বিলেতে ছিল। আই-সি-এস্...কিন্তু দেখলে কে তা বুঝবে?...আচারে-ব্যবহারে খাঁটী বাঙালী।...হিরণ্ময় এখন আছে কলকাতায়।...ছ'জনে কি ভাবই ছিল! এ-বাড়ীতে হিরণ্ময় কত দিন এসেছে!...কলেজের ছুটী হলে অনেক-সময় ও দেশেই যেতো না...এই বাড়ীতে এসে থাকতো!...

হিরণ্ময়ের পানে বীণা চাহিয়া রহিল...সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি! দেখিলে মনের দুশ্চিন্তা-ভয় নিমেষে যেন অদৃশ্য হয়!

হিরণ্ময় বলিল,—কাল আমার ওখানে যেতে হবে, মা! তোমার কাকিমা...মানে, আমার স্ত্রীর অসুখ...তাই ওঁরা কেউ এখানে আসতে পারলেন না। তিনি বাতে ভুগছেন—গাউট...যখন ধরে, তখন আর তাঁর ওঠবার শক্তি থাকে না!...কি বলো?...যাবে তো? তোমার কাকিমা বলে দেছেন...

মাথা নাড়িয়া বীণা জানাইল, যাইবে।

তারাচরণ রায় হিরণ্ময়ের পানে চাহিলেন, বলিলেন—মৃণ্ময় এলো না যে?

মৃণ্ময় হিরণ্ময়ের পুত্র।

হিরণ্ময় বলিলেন,—সে এখানে নেই। সে গেছে বেরিলী। তার মেসোর ওখানে। মাস্তুতো ভাই-বোনেরা হু'দিন আমার এখানে এসে থাকতে চায়…তারা ছেলেমানুষ…কার সঙ্গে আসে…তাই তাদের আনতে গেছে। কাল সকালেই ওরা আসছে।

তারাচরণ রায় বলিলেন—ও…তার পর বীণার পানে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি আমার ঘরে এসো দিদি! তোমার হিরণ-কাকা তোমার জন্য কি-উপহার এনেছেন…আমার ঘরে আছে…দেখবে, এসো!

বীণাকে লইয়া তারাচরণ রায় ও হিরণ্ময় বাহিরে আসিলেন।

এবং আবার যখন বীণা এ-ঘরে ফিরিয়া আসিল…

দ্বারের কাছে আসিবামাত্র শুনিল, দাক্ষায়ণী দেবী সমবেতা মহিলাদের উদ্দেশে বলিতেছেন,—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে ছিল…একেবারে রাজার সিংহাসনে এসে বসলো!…যে-গর্ভে জন্ম, এ-বাড়ীর বাতাস সইলে হয়!

বীণার বুকে কে যেন পাথর ছুড়িয়া মারিল! মনে পড়িল ঊষাঙ্গিনীর কথা…ট্রেণের কামরায় বলিয়াছিল, বাড়ীতে যে-পিশিমাটি আছেন…

বেচারী বীণা! আসিবামাত্র এমন কথা শুনিবে, চারিদিকে ভয়-দুশ্চিন্তার কণ্টকারণ্য দেখিলেও এমনটি বীণা প্রত্যাশা করে নাই!

১২

ওদিকে তিন ছেলেকে লইয়া ক্ষীরোদাময়ী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন; ফিরিয়া দেখেন, বাড়ীর দ্বারে তালা বন্ধ।

দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। বীণা? বীণা কোথায়? ও-বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছে কোথা হইতে কে দাদু আসিয়াছে বলিয়া…দাদুর জন্য খাবার-দাবার পাঠাইয়া দিলেন, তার পর বীণা আর ও-বাড়ীতে যায় নাই! ক্ষীরোদাময়ী ভাবিয়াছিলেন, মেয়ে বুঝি বাড়ীতেই আছে…দাদু হয়তো অনেক রাত্রে চলিয়া গিয়াছেন, তাই বীণা আর কাতুদির বাড়ী ফেরে নাই!

এখন বাড়ী তালা-বন্ধ দেখিয়া তিনি রাগ করিলেন। চাবি দিয়া মেয়ে নিশ্চিন্ত-মনে কোথায় গেল? ক'দিন ও-বাড়ীর ঝক্কি ঠেলিয়া শরীর যা হইয়া আছে…উহাদের সাধ্য-সাধনা না মানিয়া এত-রাত্রে ঘুমন্ত ছেলে-তিনটাকে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন, কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া বিছানায় দেহ-ভার ঢালিয়া বিশ্রাম করিবেন…না, মেয়ে এদিকে দ্বারে তালা লাগাইয়া দাদুর সঙ্গে দাদুর বাড়ী গিয়াছে আমোদ করিতে!

ছেলেদের বলিলেন—দোরে তালা বন্ধ…ডাক্ তোর বীণাদিদিকে…

ঘুমের ঘোরে তিন ছেলে রীতিমত ঢুলিতেছে···যা করিয়া এতখানি পথ চলিয়া আসিয়াছে, তারাই জানে।

মিণ্টু ডাকিল—বীণাদি···বীণাদি···

পিণ্টু দ্বারে কড়া নাড়িল···

সিণ্টু রাগিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল···ডাকিল—বেশ মেয়ে তুমি বীণাদি! দরজা দিয়ে ঘুম হচ্ছে···আর আমরা পথে দাঁড়িয়ে···

এ-কোলাহলে মহাদেও বাহির হইয়া আসিল। ঘুমাইব না বলিয়া সে তুলসীদাসের রামায়ণ খুলিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়াছিল, তার পর দু'চোখে কখন ঘুমের ঘোর জড়াইয়া আসিয়াছে···

মহাদেও আসিয়া কহিল—চাবি আমার কাছে মা-জী···বীণাদিদি বোলিয়ে গেছে, তাঁর দাদু আসছে···বুড়া বাবু···বীণাদিদি তাঁর সঙ্গে তাঁর কোঠীমে গেছেন···

চাবি লইয়া ক্ষীরোদাময়ী মন্তব্য করিলেন,—বেশ মেয়ে তো! এই রাত্রে কোথাকার কে দাদু এলো···অমনি তার সঙ্গে চলে গেল···

চাবি খুলিয়া ছেলেদের লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিলেন···

বিছানা করা ছিল। মিণ্টু-সিণ্টু কোনোমতে গায়ের জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পিণ্টু চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল··· চাহিবামাত্র ক্ষীরোদাময়ীর বিছানায় বালিশের উপর দেখিল ভাঁজ-করা একখানা চিঠি।

চিঠি লইয়া মিণ্টু পড়িল। তার পর ডাকিল—মা···

ও বাড়ী হইতে চ্যাঙড়ায় করিয়া যে খাবার-দাবার আনিয়াছেন, হাত

ধুইয়া ক্ষীরোদাময়ী সযত্নে ...লি গুছাইয়া রাখিতে ছিলেন···মিণ্টুর ডাক কাণে গেল ; তিনি কোন সাড়া দিলেন না।

মিণ্টু আবার ডাকিল—ও মা···শুনচো ?

মা বলিলেন—এই রাত্রে এখন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন ? শুয়ে পড়ো না ! কাল আবার ইস্কুল আছে···সকালে উঠে পড়াশুনা করতে হবে তো ! না, পড়াশুনা না করলেও চলবে ?

মিণ্টু বলিল—বীণাদির চিঠি···

চিঠি ! ক্ষীরোদামযী বলিলেন,—বীণার চিঠি ?

মিণ্টু আসিল ক্ষীরোদাময়ীর কাছে, বলিল—বীণাদি যাবার সময় চিঠি লিখে রেখে গেছে। তোমার নামে চিঠি···

—কি চিঠি ? পড়ো···

মিণ্টু চিঠি পড়িল।

চিঠি শুনিয়া ক্ষীরোদামযী ক্ষণেকের জন্য কাঁটা হইয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন—কোথায় সে দাদুর বাড়ী, লিখেছে ?

মিণ্টু ভাল করিয়া কাগজখানার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখিল ; দেখিয়া বলিল,—না···

বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। ক্ষীরোদামযী বলিলেন,—জ্যালা মেয়ে যা হোক !···এ্যাদ্দিন খাইয়ে-দাইয়ে মানুষ করলুম···এখন পাখা উঠেছে কি না···কে দাদু এলো, আমাকে বলা নেই, কওয়া নেই···ধেই-ধেই নেচে মেয়ে তার সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল এই রাত্রে···

মিণ্টু বলিল,—এলে তুমি বীণাদিকে খুব বকো মা।

ক্ষীরোদামযী বলিলেন—তার জবাব তোমাকে দিতে পারছি না বাপু

এখন এই রাত্রে! ভালো জ্বালা হয়েছে আমার!·· তুমি এখন যাও, দয়া করে শোওগে···আমি কৃতার্থ হবো'খন···

মিণ্টু দাঁড়াইল না···শুইতে গেল।

ও-বাড়ীর খাবার-দাবার গুছাইয়া ক্ষীরোদাময়ী বাহিরে গেলেন। ডাকিলেন—মহাদেও···

মহাদেও সাড়া দিল,—মা-জী···

—একবার এসো তো বাবা···

মহাদেও আসিল।

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—যে-লোক এসেছিল, তাকে তুমি দেখেছো মহাদেও?

মহাদেও জবাব দিল, দেখিয়াছে···বুড়া বাবু···কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। ও বাড়ীতে যাইবার সময় বীণা দিদি বলিয়া গিয়াছিল, কোন ভদ্রলোক আসিলে মহাদেও যেন খপর দেয়; তাই সে তার বৌকে পাঠাইয়াছিল। বুড়া বাবু অনেকক্ষণ তার দোকানে বসিয়া ছিলেন,—কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। সেই কথাবার্ত্তায় মহাদেওকে বলিয়াছিলেন, কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন দিদিকে লইয়া যাইবার জন্য। দিদির কে দাদু আছেন কলিকাতায়—তাঁর কাছ হইতে বুড়া বাবু কাশীতে আসিয়াছেন···

এ-কথা শুনিয়া ক্ষীরোদাময়ী আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কলিকাতায় কে-দাদু থাকেন, তাঁর কাছ হইতে এ-বুড়া বাবু কাশীতে আসিয়াছিলেন বীণাকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য!···ও-বাড়ীতে যাইবার সময় মহা-

দেওকে বীণা বলিয়া গিয়াছিল, কোনো ভদ্রলোক আসিলে ও-বাড়ীতে মহাদেও যেন খপর দেয় !···

আগে হইতেই এ-ব্যবস্থা ছিল···

তাই মহাদেওয়ের বৌ গিয়া খপর দিবামাত্র মেয়ে তিড়বিড় করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া আসিল !···

তার পর ও বাড়ীতে বীণার আবার সেই ছুটিয়া যাওয়া···গিন্নী তাঁকে বলিল,—কাশীতে আসিয়াছেন···দাদু হন্···বীণা কাশীতে আছে খপর পাইয়া দেখিতে আসিয়াছেন···

কাশীতে বীণা আছে, এ খপর তিনি কোথায় পাইলেন ? তার পর বীণার আচরণ, বীণার কেমন এক-রকম ভাব···

বিস্ময়ে কৌতূহলে ক্ষীরোদাময়ীর মন ভরিয়া উঠিল ! তিনি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহাদেও বুঝিল, ব্যাপারখানা তা হইলে খুব সরল নয়···সে বলিল কি ভাবছো মা-জী ?

নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—কিছু নয়।

তার পর মনের উপর একটা প্রশ্ন কলরব তুলিল। ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—সে বাবুর বয়স কত হবে মহাদেও ?

মহাদেও বলিল,—তা পঞ্চাশের উপর···

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—হুঁ···

মহাদেও বলিল,—কোনো গোলমাল আছে মা-জী ?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—না।···আচ্ছা, গাড়ী করে গেল ? না হেঁটে ?

মহাদেও বলিল—তা আমি দেখিনি মা-জী। আমি তখন দোকানের হিসেব-পত্তর দেখছি…ও'র এ-গলিতে গাড়ী আসে না তো…

ক্ষীরোদাময়ী আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন, শ্রীপতি? না, তার কোনো চর?

কিন্তু না, তাহা হইতে পারে না। বীণা শ্রীপতিকে বাঘের মতো ভয় করে! তার সঙ্গে যাইবে না। শ্রীপতির চর? তাই বা কি করিয়া হইবে? বীণা তো কাহারো সঙ্গে মেলামেশা করে না…তাছাড়া শ্রীপতির বাতাস প্রাণপণে সে এড়াইয়া চলে!

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন—তুমি এসো মহাদেও…অনেক রাত হয়েছে। ঘুমোওগে…

মহাদেও বিনা-বাক্যে চলিয়া গেল।

ক্ষীরোদাময়ী দ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে আসিলেন। আসিয়া জিনিষ-পত্রগুলা দেখিলেন। একটা ট্রাঙ্ক শুধু নাই…আর সব যেমন, তেমন আছে।…বুঝিলেন, একটা ট্রাঙ্কই লইয়া গিয়াছে…

কিন্তু গেল কোথায়? যেখানে যাক, তাঁকে না বলিয়া যাওয়ার অর্থ কি?…কি বলিয়া এত রাত্রে গেল?

আগে হইতে পরামর্শ ছিল…নহিলে তিনিও ছেলেদের লইয়া বাড়ী-ছাড়া আর ঠিক সেই ক্ষণটিতে কোথা হইতে কোন সম্পর্কের দাদু আসিয়া দেখা দিল এবং দাদুর সঙ্গে এমন চকিতে চলিয়া গেল…

সত্যকার দাদু আসিয়া যদি লইয়া যাইবে তো এত রাত্রে না লইয়া গেলে চলিত না?…এত রাত্রে এমন অধীর-আকুলতা জাগিল…

সকালে তাঁকে বলিয়া লইয়া গেলে কি ক্ষতি ছিল? দাদু আসিয়া

যদি তাঁকে বলিতে, বীণা আমারি আপন-জন…আমি তাকে আমার ওখানে লইয়া যাইতে চাই, তাহা হইলে ক্ষীরোদাময়ী কোন আপত্তি করিতেন না! বীণা তাঁর কেহ নয়। তাঁর গৃহে ছিল ভাড়াটিয়া সন্তোষ বাবু…সেই সন্তোষ বাবুই বীণাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আজ সন্তোষ বাবু নাই, সন্তোষ বাবুর স্ত্রী নাই, কেহ নাই—এদিকে বীণারও কোনো কূলে কেহ নাই! আছে বরং ঐ আপদ শ্রীপতি! সেই শ্রীপতির হাতে অসম্ভব পীড়ন-অত্যাচার সহিত বলিয়াই মমতা-বশে বীণাকে তিনি এমন করিয়া নিজের সংসারে মেয়ের মত স্থান দিয়াছেন…আর সেই বীণা নিঃশব্দে এমন করিয়া চলিয়া গেল? ঘুণাক্ষরে এ-যাওয়ার পূর্ব্বাভাস তাঁকে না দিয়া?…এ-লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল?

শুইয়া এ-পাশ ফিরিলেন, ও-পাশ ফিরিলেন। দু'চোখ সবলে বুজিয়া রহিলেন, তবু ঘুম আর আসে না! যত মনে করেন, ও-কথা আর ভাবিবেন না, তবু এই ভাবনাই দুনিয়াকে চাপিয়া মনের উপর উত্তাল হইয়া ওঠে! এ যে কি অস্বস্তি…কতখানি অশান্তি!

সহসা এ-চিন্তার ফাঁকে একটা চিন্তা বিষাক্ত সাপের মতো ফণা তুলিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল!

যদি তাই হয়?

কাশীতে মা-অন্নপূর্ণার পায়ে মুক্তি-কামনায় বহু লোক যেমন মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে, কত দুরভিসন্ধি বুকে লইয়া তেমনি মায়ের পিছনে কত দুর্বৃত্ত…

বীণা যদি তাদের কারো হাতে পড়িয়া থাকে? বীণার কি-বা বয়স… দুনিয়ার কতটুকু সে জানে! যদি কোনো দুরাত্মার ছলনায় ভুলিয়া…

মনের মধ্যে সে-পাপটা ফণা তুলে বিস্তার করিয়া বলিল, কেমন মায়ের পেটে জন্মিয়াছে···

ক্ষীরোদাময়ীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া রোমাঞ্চরেখায় ভরিয়া উঠিল !···

সবলে সে-সাপের ফণা ধরিয়া তিনি তাকে মাটীতে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন,—না, না, বীণা তেমন হইতে পারে না !

প্রাণপণে মা-অন্নপূর্ণাকে ডাকিলেন। বাবা-বিশ্বনাথকে ডাকিলেন। ডাকিয়া মিনতি জানাইয়া বলিলেন,—আমি তাকে চাই না মা, ফিরে আর চাইনে বাবা···শুধু এইটুকু দয়া করিয়ো, এ যেন না হয় ! যে মেয়েকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম, এমন অপমান লাঞ্ছনার বিষ-বাষ্প যেন তার দেহে-মনে না লাগে ! এ-সর্ব্বনাশ হইতে তাকে রক্ষা করিয়ো...

চিন্তার বিরাম নাই। চোখে ঘুম আসিল না ! শুইয়া বৃশ্চিক-যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন···

শেষে এ যাতনা অসহ্য বোধ হইল। উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া, ঘর ছাড়িয়া ক্ষীরোদাময়ী বাহিরের ছোট ছাদে আসিলেন।

জ্যোৎস্নায় আকাশ ভরিয়া আছে। ক্ষীরোদাময়ী আকাশের পানে চাহিলেন···কালো মেঘের কটা টুকরা চাঁদের দিকে অগ্রসর হইতেছে··· চাঁদকে ধরিবার জন্য।···চাঁদ ভয়ে যেন তাই কাঁপিতেছে...

ক্ষীরোদাময়ীর মনে হইল, প্রাণপণে একবার আকাশ-বাতাশ চিরিয়া তিনি ডাকেন, বীণা, বীণা,—কোথায় আছিস্ ? যেখানে থাকিস্, একবার একটি কথা বলিয়া শুধু জবাব দে, তুই নিরাপদ-আশ্রয়ে আছিস্ !

১৩

পরের দিন ভোরের আলো ফুটিবামাত্র ক্ষীরোদাময়ী স্থির থাকিতে পারিলেন না, বেণীবাবুর গৃহে ছুটিলেন।

দাসী-চাকর ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া কাজ-কর্ম্মে লাগিয়াছে···আর উঠিয়াছে জ্যোতি। বাড়ীর আর-কাহারো ঘুম ভাঙে নাই।

এই ভোরে ক্ষীরোদাময়ীকে আসিতে দেখিয়া জ্যোতি আশ্চর্য্য হইল। বলিল,—ব্যাপার কি মাসিমা? এই ভোরে?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—বিপদে পড়েছি মা···বড্ড বিপদ!

জ্যোতি শিহরিয়া উঠিল। কহিল,—কারো অসুখ-বিসুখ করেছে না কি?

—না মা···অসুখ-বিসুখ নয়···তার চেয়েও ভারী বিপদ!

ছ'চোখ কপালে তুলিয়া জ্যোতি বলিল,—কি হয়েছে, শুনি?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—তোমার মা এখনো ওঠেন নি?

—না। মাকে ডাকবো?

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—পরে ডেকো। আগে তুমি শোনো মা··· তোমাকে সব বলি···

জ্যোতি বলিল,—বসো মাসিমা, তুমি কাঁপছো!

—কাঁপছি! এখনো বেঁচে আছি, পথে আসতে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে যাইনি কেন···ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি!

জ্যোতি কহিল,···বলো মাসিমা···

ক্ষীরোদাময়ী তখন বীণার কথা খুলিয়া বলিলেন। তাঁকে যে-চিঠি লিখিয়া বীণা চলিয়া গিয়াছে, সে চিঠি দেখাইলেন; তার সম্বন্ধে মনে যত রকম দুশ্চিন্তার কথা ভাবিয়া ক্ষীরোদাময়ীর রাত্রি কাটিয়াছে, তাহাও বলিলেন।

সুদীর্ঘ কাহিনী শেষ করিয়া ক্ষীরোদাময়ী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—দুর্ভাবনায় আমার হাত-পা পেটের মধ্যে গেছে জ্যোতি···কি এখন করি বলো তো মা?

কাহিনী শুনিয়া জ্যোতি একেবারে কাঠ! সে কোনো জবাব দিতে পারিল না।

বীণা···তার বিরুদ্ধে কোনো চিন্তা মনে জাগে না! তবে ক্ষীরোদাময়ী যে বলিলেন,—কাশী জায়গা, মা···কত লোক কত ফন্দী নিয়ে এখানে ঘুরছে···তাছাড়া সেই লক্ষ্মীছাড়া শ্রীপতি···তার দুরভিসন্ধি কোন দিক দিয়ে কি বেশে দেখা দেবে, তার কোনো ধারণা তুমি করতে পারবে না, মা···

জ্যোতি বলিল,—কিন্তু সে তো অনেকদিন আর তোমাদের জ্বালাতন করতে আসেনি মাসিমা···

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—বাড়ীতে না এলেও পাড়ায় ঘুরছে বৈ কি! এই কিছু-দিন আগে মন্দির থেকে বীণা একা ফিরছিল···তাকে ধরে

টানাটানি। বল্লে, আমার মেয়ে হয়ে তুই করবি সভা-পণ্ডিতী···আর আমি না খেয়ে মরবো?···তুমি জানো না মা, তার ভয়ে আমি কতখানি কাঁটা হয়ে থাকি!···অনেকে বলে, তোমার কেন এত মাথা-ব্যথা? পরের জন্য কেন এমন চোর হয়ে থাকো? তারা তো বোঝে না, একটা পাখী পুষলে তার উপরে মানুষের কত মায়া হয়···আর এ একটা রক্ত-মাংসর জীব···মেয়ে! তাকে এত-বড়টি করলুম···

জ্যোতি বলিল,—সে-কথা ঠিক বৈ কি!···তা এক কাজ করি, বাবাকে-মাকে বলি। বাবা পুলিশে খপর দিন···যদি শ্রীপতির কাজ হয়, তাহলে ওঁদের না বলে চুপ করে থাকা ঠিক হবে না মাসিমা···

ক্ষীরোদাময়ী বলিলেন,—আমার মাথায় কিছু আসছে না মা! যা ভালো বোঝো, তোমরা করো।···তোমরা ছাড়া আমার কে-বা আছে? তাই তোমাদের কাছে সব-তাতেই ছুটে আসি।···কাল সারা রাত দুর্ভাবনায় আমার চোখে এক-ফোঁটা ঘুম আসেনি জ্যোতি···সত্যি কথা বলছি তোমায়···

জ্যোতি বলিল,—ঘুম এতে আসে না, মাসিমা।···তুমি ভেবো না··· বসো। আমি দেখছি, বাবা উঠেছেন কি না···

ঘুম ভাঙিলে উঠিয়া বেণী-বাবু সব কথা শুনিলেন; শুনিয়া তখনি থানায় একটা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন এবং বেলা দু'টার সময় পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল আসামী শ্রীপতিকে গ্রেফ্‌তার করিয়া।

শ্রীপতি গর্জ্জন তুলিল—আমার মেয়েকে বড়লোকের হাতে তুলে দিয়ে টাকার রাশ আঁচলে বেঁধে আমার নামে নালিশ! আচ্ছা, আমিও আইন জানি···আমিও দিচ্ছি এক-নম্বর ফৌজদারী জুড়ে। আমার মেয়ে

এখনো সাবালক হয়নি…আইনের চোখে নাবালক…যাকে বলে, minor girl…

পুলিশ জোর-তদারক চালাইল…কিন্তু না পাওয়া গেল বীণাকে, না শ্রীপতির বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রমাণ! কাজেই সাত-আট দিনের পর পুলিশের হাত হইতে শ্রীপতি খালাশ পাইল।

খালাশ পাইয়া শ্রীপতি চুপ করিয়া রহিল না…মহাদেও পুলিশের কাছে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাতে বলিয়াছিল, কলিকাতা হইতে এক বুড়া বাবু আসিয়াছিল; বীণা তার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে…রাত্রে…

ক্ষীরোদাময়ীর নামে শ্রীপতি নালিশ করিল। নালিশ, ক্ষীরোদাময়ী বীণাকে বেচিয়া দিয়াছেন…

শ্রীপতির বহু ইতিহাস আদালতের নথীপত্রে লেখা ছিল; হাকিম তার এ-নালিশ মঞ্জুর না করিয়া প্রমাণাভাবে ডিস্‌মিস্‌ করিয়া দিলেন।

শ্রীপতি তখন রুখিয়া উঠিল…কোথায় গেছে বীণা, তাহার সন্ধান সংগ্রহ করিতে…

তদারকীর সময় পুলিশের কাছে মহাদেও আরো বলিয়াছে, রাত্রে চলিয়া যাইবার সময় ঘরে চাবি বন্ধ করিয়া সে-চাবি মহাদেওয়ের হাতে দিয়া বীণা বলিয়াছিল, মা-জী বাড়ী ফিরলে তাঁকে চাবি দিয়ো; আর বলিয়ো, বীণা গিয়াছে তার দাদুর সঙ্গে দাদুর বাড়ীতে। তার উপর ক্ষীরোদাময়ীকে চিঠিতে লিখিয়া গিয়াছে—হয়তো দু'দিন পরে আসিব। তবে তাঁরা যদি না ছাড়েন, জানি না, কবে আসিব!…

দু'দিনের জায়গায় দশ-বারো দিন কাটিয়া গেছে, তবু বীণা ফেরে

নাই। শুধু ফেরে নাই নয়—তার কোনো সংবাদ নাই! কাশীতে বীণা নাই···কাশীতে থাকিলে বারো দিনে বীণার সন্ধান মিলিত। পুলিশের কাছে এ-মামলা লইয়া কাশীতে এমন হুলুস্থুল বাধিয়া গেল, আর কাশীতে থাকিলে বীণা এ-মামলার বিন্দুবাষ্প জানিবে না?···অসম্ভব!

শ্রীপতির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। বিশেষ, দুরভিসন্ধি-রচনায় তার পটুতা অসাধারণ। বুদ্ধি খাটাইয়া সে অনুমান করিল, বীণা কাশীতে নাই...কাশী ছাড়িয়া কোথাও যদি গিয়া থাকে তো কলকাতায় গিয়াছে!

কিন্তু কলিকাতায় কোথায় যাইবে? কার কাছে?···দাদু!

দাদু তার কেহ নাই, এ-সংবাদ শ্রীপতি ভালো করিয়া জানে!···

এ-দাদুটি তবে কে?···

মহাদেও মিথ্যা বলে নাই। বলিয়াছে, একজন বুড়া বাবুর সঙ্গে গিয়াছে। বুড়ার কি স্বার্থ, পরের ঘরের কিশোরী কন্যাকে বাড়ীর কাহাকেও না বলিয়া না কহিয়া নিঃশব্দে এখান হইতে লইয়া যাইবে?···

এ স্বার্থ হয় শুধু একটি কারণে। এবং সে-কারণ···নিজের বুদ্ধিতে 'কারণ' অনুমান করিয়া শ্রীপতি পণ করিল, যেমন করিয়া হোক, বীণার সন্ধান করা চাই। সন্ধান পাইলে বীণাকে না পাক, মোটা টাকা আদায় করা অসম্ভব হইবে না!

১৪

মাসখানেক পরের কথা।

সে-দিন মৃণ্ময়ের জন্মতিথি। হিরণ্ময়ের গৃহে রীতিমত উৎসব। এ-উৎসবে তারাচরণ রায় আসিয়াছেন হিরণ্ময়ের গৃহে সপরিবারে··· মানে, দাক্ষায়ণী, বিরজা প্রভৃতিকে লইয়া।

হারা-মণি ফিরিয়া পাইয়াছেন—তারাচরণের একটিমাত্র অবলম্বন। হিরণ্ময় সন্তোষের চিরদিনের বন্ধু, বীণা তার কন্যা। কাজেই এ-বাড়ীতে বীণার আদরের সীমা নাই!

রাত্রি তখন ন'টা। আহারাদি শেষ হইয়াছে। হিরণ্ময়ের স্ত্রী প্রতিমা বলিল তারাচরণকে—ছেলেমেয়েরা মোটরে একটু বেড়িয়ে আসবে কাকাবাবু।···সলিলাকে ওরা সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। তার পর আপনার ওখানে ওকে পৌঁছে দেবে ফেরবার সময়। ছেলে-মেয়েরা ওকে ছাড়তে চাইছে না...

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বেশ মা...সলিলা যাক ওদের সঙ্গে...

মৃণ্ময়ের বোন কিরণ্ময়ী বলিল,—আপনার মন কেমন করছে, না ছোটদাদু?

তারাচরণ রায় হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে থাকলে মন কেমন করবে না দিদি···

তারাচরণ রায় গৃহে ফিরিলেন···দাক্ষায়ণীও ফিরিলেন বিরজাকে লইয়া। বীণা গেল এ-বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মোটরে বেড়াইতে···

রাত্রি প্রায় এগারোটা। মৃণ্ময় ড্রাইভ করিতেছিল···রেড রোড পার হইয়া গাড়ী উত্তর-দিকে আসিতেছে···হঠাৎ সেনোটাফের কাছে ওদিক্ হইতে নক্ষত্র-বেগে একখানা মোটর আসিয়া মৃণ্ময়ের গাড়ীর উপরে পড়িল···মৃণ্ময়ের গাড়ী উল্টাইয়া গেল···সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যয় কাণ্ড!

সকলের দেহে অল্পবিস্তর চোট্ আর জখম, বীণার জখম সকলের চেয়ে বেশী! তার গলার হাড় ভাঙ্গিয়া সে একেবারে অজ্ঞান!

হাসপাতাল···

ডাক্তাররা বলিলেন,—বীণার কলার-বোন্ ভাঙ্গিয়াছে, মাথায় চোট্···

সকলে ফিরিল রাত তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে···ফিরিল হিরণ্ময়ের গৃহে।

হিরণ্ময় যেন কাঠ! বলিল,—সলিলাকে এ-অবস্থায় আর ওখানে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই···এ-বাড়ীতেই থাকবে। আমি গিয়ে ওঁকে খপর দিয়ে আসি।

সেই রাত্রে হিরণ্ময় ছুটিল তারাচরণ রায়ের কাছে। তারাচরণের চোখে ঘুম নাই···এত রাত্রি হইল, সলিলা এখনো ফিরিতেছে না! কোথায় সব বেড়াইতে গেল? অজানা দুশ্চিন্তার ভারে থাকিয়া-থাকিয়া তাঁর নিশ্বাস কেমন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল! এমন সময়···

হিরণ্ময় আসিয়া যে-সংবাদ দিল···

তারাচরণ রায় তখনি ছুটিলেন হিরণ্ময়ের গৃহে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বীণা পড়িয়া আছে বিছানায়···পাশে আছে একজন ডাক্তার। দু'জন নার্শ আসিয়াছে। পরিচর্য্যার আয়োজন যতখানি করা যাইতে পারে, এ রাত্রে কোথাও তার এতটুকু ত্রুটি নাই।

বীণা বিছানায় পড়িয়া আছে—অবসন্নের মতো! তার মাথার কাছে বসিয়া কিরণ্ময়ী। কিরণ্ময়ীর মুখ মলিন, ম্লান···অশ্রু-বাষ্পে দু'চোখ ভরিয়া আছে!

তারাচরণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হিরণ্ময় বলিল—জ্বর হবে...এবং কিছুদিন ভুগবে···

প্রতিমা বলিল—মেয়েটাকে নিয়ে-গিয়ে আছড়ে আধ-মরা করে নিয়ে এলো, কাকাবাবু···

তাঁর স্বর অশ্রু গদ্‌গদ্ গাঢ়।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—অদৃষ্ট! তিনি চাহিলেন ডাক্তারের পানে, বলিলেন,—বাঁচবে?

ডাক্তার বলিলেন—বাঁচবে বৈ কি। মাথায় তেমন injury পায়নি ···দু'চারটে ছড়া-কাটা ছাড়া। মাথায় তেমন চোট্ লাগলে এ-চেহারা দেখতেন না। তা ছাড়া জ্ঞান হয়েছে। এখন ঘুমোচ্ছেন!

প্রতিমা বলিল—কলার-বোন জুড়বে?

ডাক্তার বলিলেন,—নিশ্চয়।···কলার-বোন আখ্‌চার ভাঙ্গছে, আখ্‌-চার জুড়ছে···বেমালুম হয়ে...

হিরণ্ময় বলিল—কোনো রকম permanent disfiguration কিম্বা deformity?

ডাক্তার বলিলেন—সে ভয় করবেন না। একটা অঙ্গ যদি বাদ যায়, তাহলে সে-অঙ্গও অন্য লোকের গা থেকে কেটে এনে বেমালুম এখন তা জোড়া দেওয়া হচ্ছে;...সার্জারির কি-উন্নতি যে হয়েছে!...তা ছাড়া এ-কেশে তার কোনো সম্ভাবনা নেই!...আজ যখন ড্রেস করা হয়েছে, তখন বেশ এগজামিন করেই তা করা হয়েছে!...তার পর এক্স'রে করবো...

তারাচরণ রায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিলেন।

হিরণ্ময় বলিল—এখন এই বাড়ীতেই সলিলা থাকুক কাকাবাবু! এঁরা বলচেন, এ-অবস্থায় নাড়াচাড়া করা ঠিক হবে না।

ডাক্তার বলিলেন···হ্যাঁ। এইটি আমাদের বিশেষ অনুরোধ...

তারাচরণ রায় বলিলেন—এ-বাড়ীতে থাকার কথা হচ্ছে না ডাক্তার বাবু...ওকে বাঁচিয়ে তোলা চাই! জানেন ডাক্তার বাবু...

তারাচরণ রায়ের কণ্ঠ বাষ্পভারে বিজড়িত হইল...এ-বয়সেও দু'চোখের পিছনে একরাশ অশ্রু ঠেলিয়া আসিল।

হিরণ্ময় বুঝিল...কোথায় এ-ব্যথা কতখানি বাজিতেছে...কেন বাজিতেছে!

হিরণ্ময় বলিল—জানেন ডাক্তার বাবু, এটি ওঁর নাৎনী···ছেলে সন্তোষ ছিল আমার বন্ধু। সে নেই...মেয়েটির মা-ও নেই। কাকাবাবু ঐ নাৎনীটিকে নিয়ে কোনমতে...

ডাক্তার বাবু বলিলেন—আপনাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। উনি সেরে উঠবেন...তবে কষ্টভোগ করতে হবে কিছু দিন। তাছাড়া জ্বর হবে...এবং বেশী জ্বর। এত বড় শক্...জ্বর না হয়ে উপায় নেই।

আমরা আছি,·· আমাদের উপর ভার রইলো যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দে রেখে ওঁকে সারিয়ে তোলবার।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—দেখুন। আমি আর ভাববো না···এ-ভাবনা ঘুচিয়ে দিয়েছি···আবার নতুন করে ভাবনা করবো, মনকে সে-রকম গড়ে-তুলতে এ-বয়সে বোধ হয় পারবো না!··· তবে একটা মায়া পড়েছে···তা ছাড়া এ শাস্তি আমার পাওয়া উচিত ছিল···আপনি জানেন না ডাক্তার বাবু···সেই জন্যই আমার যা-কিছু ভয়!

হিরণ্ময় বুঝিল, এত দিন ধরিয়া যে-ব্যথা মনে জড়ো করিয়া রাখিয়া ছিলেন, আজ এ-বিপদে···

তাড়াতাড়ি তিনি বলিলেন—আপনি শোবেন আসুন কাকাবাবু— পাশের ঘরে। মাঝের দরজা খোলা থাকবে···আমি এ-ঘরে আছি··· আপনার বৌমা আছেন···আপনি ও-ঘরে চলুন।

প্রতিমা বলিলেন—আসুন কাকাবাবু···

তারাচরণ রায় বলিলেন—থাক্ মা···আমি শোবো না। ঘুম আমার আসবে না। ঘুমোতে আমি পারবো না···

প্রতিমা কহিল,—না ঘুমোন, পাশের ঘরে বসবেন চলুন। সলিলা ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ এখন জেগে-উঠে ও যদি আপনাকে ত্মাখে, হয়তো খুব কাতর হয়ে পড়বে···

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ্ময়ী বলিল—জ্ঞান হতেই চার-দিকে চেয়ে ডাকলো—দাহ্! চোখে কি সে দৃষ্টি···

বাষ্প-জড়িত কণ্ঠ—কিরণ্ময়ীর কথা শেষ হইল না, রুদ্ধ হইয়া গেল।

১৫

তিন-চার দিন কোথা দিয়া কি করিয়া কাটিল—যমের সঙ্গে সারাক্ষণ যুদ্ধ চলিল! এ ক'দিন বীণা যেন কি হইয়া আছে! ডাকিলে মুখের পানে চায়, কথা কয় না! সে এক কেমন-ধারা মূর্ত্তি! জ্বরের ঝোঁকে কত রকমের কথা বলে! সে-কথায় কখনো ভয়, কখনো সংশয়, কখনো বা আনন্দের তীব্র উচ্ছ্বাস!

তারাচরণ রায় যেন পাগল! ডাক্তারের হাত ধরিয়া কথা বলিতে গিয়া দু'চোখ বাষ্পাকুল হইয়া ওঠে, কণ্ঠে স্বর বাহির হয় না! আবার কখনো নিজের সেই কঠিন আচরণের সবিস্তার কাহিনী বলিয়া শোকে জর্জ্জরিত হইয়া বলেন,—আমার অত বড় পাপ···তার শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। স্নেহকে অস্বীকার করে নিজের স্বার্থ আর অহঙ্কারকে বড় করে ছিলুম···

সকলে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। সান্ত্বনা দিয়া বলে—ভয় নেই! সলিলা সেরে উঠবে···আপনি এমন আকুল হবেন না!

কিন্তু তারাচরণ রায় মানুষ! এ-ঘটনায় মানুষ আকুল না হইয়া পারে না!

. চার-দিনের দিন। বেলা তখন প্রায় ন'টা বীণা চোখ মেলিয়া

চাহিল। ঘরে ছিল হিরণ্ময় আর প্রতিমা—তারাচরণকে লইয়া কিরণ্ময়ী ছিল পাশের ঘরে। জোর করিয়া তাঁকে এক-পেয়ালা চা খাওয়াইবে বলিয়া কিরণ পাশের ঘরে লইয়া গিয়াছিল। বীণা প্রতিমার পানে চাহিল, বলিল—আমি কোথায় আছি?

হিরণ্ময়ী ও প্রতিমা যেন বর্ত্তাইয়া গেল! সহজ কণ্ঠে এ যে স্বাভাবিক স্বর! চোখের দৃষ্টিতে সে আচ্ছন্ন-ভাব নাই···দেখিলে মনে হয় সুদীর্ঘ নিদ্রার পর বীণা যেন সগু জাগিয়া উঠিয়াছে।

প্রতিমা বলিল—তুমি আমাদের বাড়ী আছো। মনে নেই সেই কিরণ, মৃণ্ময়···মোটরে করে সকলে বেড়াতে গিয়েছিলে?

বীণা অবিচল নেত্রে প্রতিমার পানে চাহিয়া রহিল; কোনো জবাব দিল না। অনেকক্ষণ এমনি চাহিয়া রহিল।

প্রতিমা বলিল,—তোমার দাদু এ-বাড়ীতেই আছেন···তাঁকে ডাকবো?

দাদু! বীণার মাথায় সব কেমন এখনো সুস্পষ্ট হইল না! কোথায় অনেকখানি অস্পষ্টতার আবছায়া! বীণা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

হিরণ্ময় বলিল,—কাকাবাবুকে আমি ডাকি···

হিরণ্ময় উঠিয়া পাশের ঘরে গেল।

প্রতিমা বলিল,—এখন একটু ভালো বোধ করছো?

যেন স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন করিল, এমনিভাবে বীণা বলিল,—আমার কি অসুখ করেছে? আমাকে বেঁধে রেখেছে কেন?

প্রতিমা বলিল,—গাড়ীর ধাক্কা লেগে তোমার হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। হাড় জুড়ে ডাক্তার তাই বেঁধে রেখেছেন। ভয় নেই···শীগ্‌গির সেরে উঠবে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বীণার কপালে হাত রাখিয়া প্রতিমা বলিল,—জ্বর বোধ হয় ছাড়ছে…ঘাম হচ্ছে !

কপালের উপর বিস্রস্ত একরাশ কেশ…প্রতিমা সযত্নে সে-কেশগুলিতে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল।

আরাম বোধ করিয়া বীণা চোখ বুজিল।

সহসা কাণের কাছে তারাচরণের কণ্ঠস্বর,—সলিলা…দিদি…

চমকিয়া বীণা চোখ চাহিল। সলিলা…

তারাচরণ রায়ের পানে চাহিয়া বীণা কহিল,—কাকে ডাকছেন ?

—তোমাকে ডাকছি দিদি ! আমাকে চিনতে পারছো না ? আমি তোমার দাদু…

বীণার চোখে আবার সেই পলক-হীন দৃষ্টি…সে দৃষ্টি তারাচরণের মুখের উপর দৃঢ়-নিবদ্ধ।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কথা কও দিদি…আমাকে দাদু বলে ডাকো ! কেমন আছো, বলো…

বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর মৃদু স্বরে বীণা বলিল,—ভালো আছি।

তারাচরণ রায় আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। বুকের অতল গহনে কোথায় ছিল অশ্রুর সমুদ্র…সে-সমুদ্র হইতে এক-রাশ ঘন বাষ্প ঠেলিয়া একেবারে চোখের পিছনে আসিয়া জমিল।

বীণা আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না…চোখ বুজিল। তারাচরণ রায় হিরণ্ময়ের পানে চাহিলেন।

প্রতিমা বলিল,—চোখ চেয়ে দিব্যি কথা কইলে আমার সঙ্গে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, আমি কোথায় ? আমি সব বললুম। জ্ঞান

হয়েছে, কাকাবাবু! বুঝতে পেরেছে, এ ওর নিজের ঘর নয়, অন্য ঘরে শুয়ে আছে।...আপনি ভাববেন না!

হিরণ্ময় বলিল,—কথা বেশ সহজ! এমন সহজভাবে এ ক'দিন একটিবারও কথা কয়নি। জ্বরের ঘোরে শুধু যা-তা বকেছে! তা'ছাড়া ঘাম হচ্ছে...জ্বর এ্যাদ্দিনে ছাড়লো।

তারাচরণ রায় কোন কথা বলিলেন না; সুগভীর একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীণা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।...

ডাক্তার আসিলেন বেলা সাড়ে ন'টায়। দেখিয়া বলিলেন,—ভালোই আছে। এবার ওকে স্পঞ্জ করিয়ে দিন। তা'লে অনেকখানি আরাম পাবে।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এত ঘুমোচ্ছে কেন?

ডাক্তার বলিলেন,—ক'দিন কি ঘুমিয়েছিল? যে-ঘুম দেখেছেন, সে ঘুম নয়! জ্বরের যাতনায় আচ্ছন্ন ছিল! এখন ভিতরের যাতনা কমেছে...এবার সত্য-সত্য ঘুমোবে।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—ঘুমোক্! তাতে আমি তত উদ্বিগ্ন হবো না...মাঝে মাঝে শুধু যদি সহজভাবে কথা কয়!

ডাক্তার বলিলেন,—কথা কবে। কেন ব্যস্ত হচ্ছেন? দেখবেন'খন আজই বিকেলে আপনার সঙ্গে রাজ্যের গল্প পেড়ে বসবে।

তারাচরণ রায় কোনো কথা বলিলেন না...

স্পঞ্জিংয়ের পর বীণা খানিকক্ষণ বেশ আরামে ঘুমাইল। সে ঘুম ভাঙ্গিল বৈকালে।

চোখ চাহিয়া বীণা দেখে, সামনে চেয়ারে বসিয়া ঊষাঙ্গিনী···তার গায়ে হাত বুলাইতেছে। বীণা চিনিল। বলিল,—পিশিমা!

পরম পরিতৃপ্তি-ভরে ঊষাঙ্গিনী বলিল,—হঁ্যা।

বীণা বলিল,—ভালো আছো?

ঊষাঙ্গিনী কহিল,—হঁ্যা। তুমি কেমন আছো?

বীণা বলিল,—ভালো।···আমাকে তুমি দেখতে এসেছো আমার অসুখ করেছে, তাই?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—হঁ্যা।

বীণা কহিল,—আমার খুব জ্বর হয়েছিল?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—হঁ্যা····

বলিয়া বীণার ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিল; দিয়া বলিল,—এখন জ্বর নেই। জর সেরে গেছে।

বীণা কহিল,—হুঁ···

তার পর সে চারিদিকে চাহিল। ঘরে আর কেহ নাই। ঊষাঙ্গিনী বুঝিল। বলিল,—তোমার দাদু ক'দিন এইখানেই আছেন...কোথাও যদি একটু নড়েন! আজ তাই এঁরা তাঁকে নিয়ে একটু বেরিয়েছেন! আমি একা তোমার কাছে রয়েছি। হিরণবাবুর স্ত্রীও আছেন,...তিনি গা ধুতে গেছেন।

বীণা শুনিল...

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—এ চার দিন যে ক'রে কেটেছে! যেমন জ্বর, তেমনি তোমার বকুনি!

বীণা শিহরিয়া উঠিল। বলিল,—বকুনি! কাকে বকেছি পিশিমা?

উষাঙ্গিনী বলিল,—সে-বকুনি নয়...যা-তা কথা বলেছো!

বীণার বুকখানা ধ্বক করিয়া উঠিল। এ ক'দিন কি ভাবে কাটিয়েছে জানে না!...কেমন যেন স্বপ্নের আব্‌ছায়ার মতো কি কতকগুলা মনের উপর সারাক্ষণ ভাসিয়া বেড়াইত!

জ্বর ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব কথা মনে পড়িল...সে সলিলা!

উষাঙ্গিনী বলিল,—জ্বরের ঘোরে কাল বলছিলে,—বীণা নয়, বীণা নয়,—সলিলা!

শুনিয়া বীণা চমকিয়া উঠিল।

এই ভয়ই ছায়ার মতো মনের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে! জ্বরের ঘোরে অবসন্ন থাকিলেও মন কেবলি বলিতেছিল, সে যেন অনেক কথা বলিয়াছে! কাঁটার মতো মনের উপর যে দুশ্চিন্তা অহর্নিশি খচ্‌খচ করিতেছে, সে-কাঁটা যেন সকলে দেখিয়াছে! এখন জ্বরের ঘোর কাটিতে মন কেবলি বলিতেছিল, কি যেন হইয়া গিয়াছে! যত-কিছু গোপনতা ছিল, সব তার যেন প্রকাশ হইয়া গিয়াছে! এখন উষাঙ্গিনীর মুখে সে-কথা শুনিল...চকিতে মন ভয়ে পঙ্গু হইয়া গেল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—বীণা কে, সলিলা? কাশীর কোনো মেয়ে, বুঝি?

বীণা বলিল,—আমি কি বলেছিলুম?

উষাঙ্গিনী বলিল,—অনেক কথা বলতে। সব কথা তেমন স্পষ্ট নয়! তবে ঐ-কথাটা প্রায় বলতে,—না, না, বীণা নয়, বীণা নয়, সলিলা!

একাগ্র মনোযোগে বীণা শুনিল। বুকের উপরে কে যেন একখানা ভারী পাথর চাপাইয়া সেই পাথরে মনকে পিষিয়া দিতে উদ্যত হইল।

উষাঙ্গিনী বলিল,—বীণা কে?

সভয়ে বীণা কহিল,—জানি।

—এই বীণা!...তাকে যেন তোমার কত ভয়! সে-কথা শুনে মনে হয়েছিল!

একটা কম্পিত নিশ্বাস! বীণা বলিল,—বীণা...হ্যাঁ, কাশীতে।

উষাঙ্গিনী বলিল,—তার কথা কেন বলতে?

একাগ্র অবিচল দৃষ্টিতে বীণা চাহিয়া রহিল উষাঙ্গিনীর পানে...মুখে কথা নাই!

উষাঙ্গিনী সাগ্রহে তার মুখে-গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

সহসা বীণা ডাকিল,—পিশিমা...

—কি বলছো সলিলা?

—ও-কথা বলে আমি খুব চেঁচাতুম?

উষাঙ্গিনী বলিল,—চেঁচানো নয়। চমকে চমকে উঠতে আর বলতে, —বীণা...বীণা! যেন বীণাকে ডাকছো! আমরা বলতুম, কে,...কৈ বীণা? বীণা এখানে নেই!...তখন তুমি কেমন-চোখে চাইতে আর বলতে, না, বীণা নয়, বীণা নয়...সলিলা!

একটা সুগভীর নিশ্বাস! বীণা বলিল,—এ কথা আরো অনেকে শুনেছে?

উষাঙ্গিনী বলিল,—এ-ঘরে যারা থাকতো, তারা শুনেছে বৈ কি!

বীণা বলিল,—দাদু?

উষাঙ্গিনী বলিল,—শুনেছেন।

বীণা কোনো কথা বলিল না...অসহ্য নিরুপায়তায় বুক ভরিয়া উঠিল ...চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল দেখা দিল।

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—বীণা বলে সত্যি কেউ আছে?

বীণা সভয়-দৃষ্টিতে চাহিল; বলিল,—না, না···বীণা তো মরে গেছে। সত্যি, পিশিমা···বীণা বেঁচে নেই!

ঊষাঙ্গিনী ভাবিল, হয়তো খেলার সাথী, সহচরী···মারা গিয়াছে! জ্বরের ঘোরে তাকেই স্বপ্ন দেখিয়াছে! ঊষাঙ্গিনী কহিল,—না, বীণা নেই! তোমার কোনো ভয় নেই। বীণা তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা ঊষাঙ্গিনীর পানে চাহিয়া রহিল, বলিল, —তুমি আমার কাছে থেকো পিশিমা···এখানে তোমাকেই শুধু আমি চিনি। আর সকলকে দেখে আমার কেমন ভয় করে! মনে হয়···

ঊষাঙ্গিনী কহিল,—কি মনে হয়?

—কত কি···

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—না সলিলা। কারো সম্বন্ধে কিছু মনে করো না। এখানে সকলে তোমাকে ভালোবাসেন। খুব ভালোবাসেন! এখানে তুমি সকলের কতখানি আদরের···বিশেষ তোমার দাদুর·· তোমাকে পেয়ে তিনি যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছেন!

বীণা চক্ষু মুদিল।

১৬

আরো দু'-তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে।

তারাচরণ রায়ের স্নেহে-যত্নে বীণার মনের ভাব অনেকখানি হাল্‌কা হইয়াছে। বীণার লেখাপড়ার জন্য বাড়ীতে মাষ্টার রাখা হইয়াছে··· গান শিখাইবার জন্য তারাচরণ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন···তার উপর তারাচরণ রায় পাত্রের সন্ধান করিতেছেন। খুবশ ভালো পাত্র। তবে ঘটকদের বলিয়া দিয়াছেন, পৌত্রীর বিবাহ দিয়া তিনি জামাতাকে গৃহপোষ্যরূপে না রাখিলেও বাড়ীর কাছাকাছি তাকে রাখিতে চান। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি পাইবে এই পৌত্রী এবং পৌত্রীর স্বামী ; সুতরাং খুব ধনাঢ্য ঘরের পাত্রে তাঁর রুচি নাই। তিনি চান মানুষের মতো পাত্র— যে-পাত্র তাঁর মন বুঝিয়া চলিবে,—দরদ করিবে—সলিলাকে এখান হইতে উপ্‌ড়াইয়া ছিঁড়িয়া দূরে লইয়া যাইবে না···

সেদিন গানের মাষ্টার চলিয়া গেলে বীণা একা বসিয়া স্বরলিপির বই দেখিতেছিল, এমন সময় দাক্ষায়ণী আসিয়া দেখা দিলেন। দাক্ষায়ণীর মুখ গম্ভীর। তাঁর সে-মুখ দেখিয়া বীণার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল।

কোনো রকম ভূমিকা না করিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন,—মাষ্টার আসে গান শেখাতে, তার কাছে গান শিখবে! তার সঙ্গে অত হাসাহাসি হচ্ছিল কিসের?

হাসাহাসি? ঠিক!

বীণা বলিল,—একটা গানের সুর লইয়া কোন্ গানের মজলিসে গায়কের দলে কত-রকম কশরতি চলিয়াছিল, মাষ্টার মশাই তাহারি গল্প বলিতেছিলেন! সুরের খাতির করিতে গিয়া একটা কথাকে ভাঙ্গিয়া দু'দিকে চালাইয়া গানের যে-অর্থ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা শুনিয়া বীণা হাসি চাপিতে পারে নাই! অর্থাৎ গানে কথা ছিল—প্রভু সাধনা মোর তোমার লাগি! সুরের খাতিরে আসরে বসিয়া একজন গাহিতেছিল, প্রভু সাধনা-মোর-তো···তার পর গাহিল, মার লাগি, মার লাগি, মার লাগি,—তাই শুনিয়া সে হাসিয়াছিল।

দু'চোখে আক্রোশের আগুন···দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এত বয়স পর্য্যন্ত তো শিক্ষা পাওনি—এ-বংশের শিক্ষা! তাই জানো না! না'হলে মাইনের চাকর গানের মাষ্টার—তার সামনে এ-বংশের এত বড় ধাড়ী মেয়ে অমন ক'রে হাসে না! মামাবাবুর ভীমরতি হয়েছে···নাৎনি পেয়ে এমন মেতে উঠেছেন, এ-সবে নজর নেই!···কিন্তু এ আদেখালে ভাব কাটলে আস্ত রাখবে না! তাই বলে হুঁশিয়ার করছি বাছা···এ-বংশের আদব-কায়দা বজায় রাখা চাই। জানো তো নিজের ছেলেকে মামাবাবু ত্যাগ করেছিল···শুধু এই বংশের মান-ইজ্জতের জন্য।

কথা শুনিয়া বীণা ভয়ে কাঠ হইয়া গেল! মনে পড়িল, ট্রেণে ঊষাঙ্গিনী বলিয়াছিল এমনি কাহিনী। দাক্ষায়ণীর পুত্রবধূ ঐ বৌদি···

বিবাহের নব-বধূ···পোগাল ভাঁড়ের গল্প শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়াছিল বলিয়া তাকে কি কথা না শুনাইয়া দিয়াছিলেন···

কথা শুনাইয়া মনের অনেকখানি জ্বালা শান্ত করিয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন,···আর একটা কথা ছিল বাছা···

ভয়ার্ত্ত চোখে দাক্ষায়ণীর পানে চাহিয়া বীণা বলিল,—কি কথা পিশিমা ?

পিশিমা বলিলেন,—বিরজার সঙ্গে মেশো না কেন ? সেধে সে গল্প করতে আসে, তুমি বই নিয়ে, গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকো। সে এই বাড়ীরই ভাগনী···এ বংশের রক্ত তার দেহে···তাকে এমন অবজ্ঞা করো কিসের দর্পে···বলতে পারো ?

বীণার যেমন ভয়, তেমনি বিস্ময়! এ সব কথা কি করিয়া বলেন! বংশের মর্য্যাদা ধরিয়া যাঁর মনে এত গর্ব্ব—তাঁর মুখে এ কি ভাষা! মনের যত বিষ ভাষায় নিঃশেষে এমন ঢালিয়া দেন!

বীণা কোনো জবাব দিল না; আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—সে তোমার দিদি হয়, এ-কথা মনে রেখো। আমাদের বংশে দেইজীগিরি নেই। ও ভাগনী, আর তুমি তারাচরণ রায়ের পৌত্রী বলে তুমিই এ রাজ্যের সব, আর ও দাসী-বাঁদী—তা যদি মনে করে থাকো, তা'হলে ভারী ভুল করেছো বাছা! এসে ইস্তক অসুখ করে পড়ে রইলে,—না'হলে এ-বাড়ীর আদব-কায়দাগুলো শেখাতে পারতুম!···ধেড়ে-বয়সে শিখবে কি না, জানি না! তবু আমার কর্ত্তব্য করতে হবে তো!

এ-কথার পর দাক্ষায়ণী দেবী এক-মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না। বীণার মলিন মুখের উপর দু'চোখের রুক্ষ দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। অকারণে এ-সব অপ্রিয় কথা কেন বলিল? সে এ-বাড়ীর দাসী-চাকরকে পর্য্যন্ত সম্মান-সম্ভ্রম করিয়া চলে! অপরে না জানুক, সে তো জানে, এ-বাড়ীতে দাসী-চাকরের যে অধিকারটুকু আছে, তার তাও নাই! আর সে করিবে বিরজাকে অবজ্ঞা-অবহেলা! বিরজা তার কাছে আসে কৈ? যখন সে বই কিম্বা স্বরলিপি লইয়া বসে, তখন হয়তো ক্ষণেকের জন্য আসিয়া দেখা দেয়! বলে, গান শিখছো! বই পড়ছো! এ-কথা বলিয়া কেমন-এক দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া থাকে, তার পর নিজের খেয়াল-ভরে চলিয়া যায়! ডাকিয়া তাকে বসিতে বলিবে, সে-সাহস বীণার নাই!

সে ভাবে, যে-দুঃখ যে-ঝড়-বিদ্যুতের মাঝে বীণা এত বড় হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারে, এখানে তার এ-আবির্ভাবে দাক্ষায়ণী দেবী বিরক্তিতে জ্বলিয়া আছেন; এবং সে বিরক্তির হেতুও তার অবিদিত নয়! ট্রেণে প্রথম পরিচয়ের সূচনায় উষাঙ্গিনীর কথায় দাক্ষায়ণী দেবীর সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত পাইয়াছিল...

ভাবিল, তাকে কেন্দ্র করিয়া পিশিমার সে আক্রোশ আজ সুস্পষ্ট ভাষায় এই প্রথম সূচিত হইল! এ আক্রোশ এখন নানা-বেশে নানা-রূপে হয়তো উৎসারিত হইবে। দাক্ষায়ণী দেবী ভাবিয়াছেন, এত দিন নির্ব্বিবাদে এখানে বাস করিতেছিলেন, কোথা হইতে পৌত্রী সাজিয়া এ-মেয়েটা আসিয়া উদয় হইল,—তাঁর সব কল্পনা ফাঁশাইয়া চূর্ণ করিয়া দিবে!

একটা নিশ্বাস সে রোধ করিতে পারিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা ভাবিল, কি করিয়া দাক্ষায়ণীকে বুঝাইবে, এ-বাড়ীর ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করিয়া

সে এখানে আসে নাই! এ-বাড়ীর কে কোথায় আপন-জন আছে, সে সংবাদ সে জানিত না; জানিবার বাসনা তার মনে কোনো দিন উদয় হয় নাই। যে-ভাবে কাশীতে পড়িয়াছিল,—কল্পনা-নেত্রে সামনে যতদূর চাহিত, দেখিত, অন্ধকার···শুধুই অন্ধকার! থাকিয়া থাকিয়া সে-অন্ধকারে মন কেমন হাঁফাইয়া উঠিত! এমন সময়ে দৈবাৎ তারাচরণের চিঠি গিয়া পৌঁছিল—স্নেহের সুমধুর আহ্বান! সে-চিঠি পড়িয়া কি যে তার মনে হইয়াছিল! না বুঝিয়া, না ভাবিয়া নিমিষের খেয়াল-বশে সে-আহ্বানে সাড়া দিয়া বীণা চিঠি লিখিল। যাহা লিখিয়াছিল, সে-কথা মনে হইলে ভয়ে লজ্জায় ধিক্কারে আজ সে মাটীতে মিশিয়া যাইতে চায়!···

বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যে-অন্ধকারে বাস করিত, সে-অন্ধকার ছাড়িয়া যেখানে আসিয়াছে, এখানে ভয়ে প্রতিক্ষণে চোর হইয়া আছে! চোর সে···সত্য! চোরে মানুষেব কি চুরি করে? টাকা-পয়সা, গহনা, ঘড়ি-চেন! আর সে···?

তারাচরণ রায়ের অগাধ স্নেহ-প্রীতি, মমতা···তাঁর মনের এই সুগভীর পরিতৃপ্তি···বীণাকে লইয়া তারাচরণের এই যে আনন্দ···বীণা তাহাতে মরমে মরিয়া যায়! তারাচরণ দুঃখ করেন, বলেন—বুঝি দিদি, তোমার মা'র উপর, বাবার উপর যে দুর্ব্যবহার করেছি, তুমি তা ভুলতে পারছো না ···তাঁদের কথা মনে করে আমার এ-স্নেহে তোমার মনে ঘৃণা হয়···

এ কথায় বীণার দু'চোখ জলে ভরিয়া ওঠে! সে বলিতে পারে না —না, না, তা নয়! এ-কুণ্ঠা···তার মনে কতখানি গ্লানি···তোমার সঙ্গে কতখানি কি হীন প্রবঞ্চনা বীণা করিয়াছে! তুমি তার কোনো অনিষ্ট করো নাই, তবু বীণা তোমাকে লইয়া এ ছলনা কেন করিতে আসিল···

থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যাই··· ঐ পথে···ছ'চোখের দৃষ্টি যে-দিকে তাকে লইয়া যায়! এ গৃহে এত স্নেহ, এত আদর···তার বুকে যে-ব্যথা বাজে, সে-ব্যথা কে বুঝিবে? কাহাকে সে বুঝাইয়া বলিবে?

এখন বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতেছিল···দুপ্-দাপ শব্দে কিরণ্ময়ী আসিয়া উপস্থিত। কিরণ্ময়ী বলিল,—চুপ করে বসে আছো যে সলিল!

ম্লান ছুটি চোখ তুলিয়া বীণা চাহিল, বলিল,—হ্যাঁ···

কিরণ্ময়ী বলিল,—দাছু কোথায়? দেখলুম না তো! বেরিয়েছেন বুঝি?

বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

কিরণ্ময়ী বলিল,—বুঝেছি। বাড়ী থাকলে এখানে বসে তোমার গান শুনতেন···তা, আমি একটা কাজে এসেছি···

বীণা নিরুত্তরে কিরণ্ময়ীর পানে চাহিয়া রহিল।

কিরণ্ময়ী বলিল,—দাদার জন্য একটি কনে দেখতে যাচ্ছি। মেয়েকে তাঁরা আনবেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে মাঠে। আমি আর মা যাচ্ছি। মা বললে, সলিলাকে নিয়ে আয় রে! তাকেও নিয়ে যাবো···একসঙ্গে মেয়ে দেখবো। তা ভয় নেই, ভাই···এবারে দাদা গাড়ী চালাবে না। ড্রাইভার গাড়ী চালাবে। ধাক্কা লাগবে না!

কথাটা বলিয়া কিরণ্ময়ী হাসিল। তার পর বলিল,—তুমি ওঠো, তৈরী হয়ে নাও। তৈরী মানে, বেনারসী পরতে হবে না। আমাদের কেউ দেখতে আসবে না···আমরা যাচ্ছি কনে দেখতে···

বীণা বলিল,—কিন্তু দাছু তো বাড়ী নেই!

কিরণ্ময়ী বলিল,—অনুমতি? ও! সে আমি করে নেবো ঠিক। এখন যিনি বাড়ীর চার্জ্জে আছেন, পিশিমা…তাঁকে ব'লে যাবো। তার পর একখানা চিঠি লিখে রেখে যাবো দাদুর নামে। আমার আব্দার দাদু কোনো দিন নামঞ্জুর করেন নি, কোনো দিন নামঞ্জুর করবেন না। সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

বীণা আপত্তি তুলিল না। মনটা যা হইয়া আছে,…বাহির হইতে পারিলে যেন বাঁচে!

বীণাকে লইয়া কিরণ্ময়ী বাড়ী আসিল। এবং সেখান হইতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল…

১৭

মেয়েটি দেখিতে বেশ !

কিরণ বলিল,—বৌদি ব'লে ডাকতে পারবো···না সলিল ?

মৃদু হাসিয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

কিরণ বলিল,—তোমার নাম কি ভাই, বৌদি ?

মেয়েটি বলিল,—আমার নাম নন্দরাণী।

কিরণ বলিল,—সত্যি ?···বেশ নাম। আজ-কাল যে সব নাম রাখা হয়···নাম শুনে আমাদের মতো মানুষ ব'লে মনে হয় না। মনে হয়, যেন নভেল থেকে নায়িকা বেরিয়ে এসেছে ! নন্দরাণী বেশ নাম। আমার নাম কিরণ···আমি হলুম তোমার বাঘিনী ননদিনী···আমার সঙ্গে তোমাকে বাস করতে হবে···কত বাক্য-যাতনা সইতে হবে ! কত গঞ্জনা দেবো ! আর এ হলো সলিল···এও তোমার ননদ। তবে ভালো ননদ। ও মাঝে-মাঝে বেড়াতে আসবে, আদর করবে, মিষ্টি কথা কইবে···বুঝলে···আমাদের দু'টিকে চিনে রাখো। একজন তোমার লক্ষ্মী সরস্বতী, আর এক জন দুষ্টু-সরস্বতী !

নন্দরাণী হাসিল ; কোনো কথা বলিল না।

প্রতিমা এ-দল হইতে একটু দূরে বসিয়া নন্দরাণীর মার সঙ্গে, পিশিমার সঙ্গে গল্প করিতেছিল।

কিরণ বলিল,—তুমি গান গাইতে পারো বৌদি···নিশ্চয় ?

নন্দরাণী বলিল,—শিখছি···

কিরণ বলিল,—গান তো আমরা সকলেই শিখি...মা-বাবা ছাড়ে না, কাজেই! কিন্তু গাইতে পারে ক'জন, বলো তো! শুনেছি, তুমি রেডিয়োতে মাঝে মাঝে গান গাও। আগে জানতুম না তো তুমি বৌদি হবে! জানলে···শুনতুম। বাড়ীতে রিডিয়ো আছে—সে শুধু ফ্যাশনের খাতিরে! না থাকলে লোকে নিন্দে করবে, তাই। না হলে রেডিয়োয় যা-সব প্রোগ্রাম হয়···সত্যি ভাই বৌদি, রেডিয়ো খুলতে আমার ভয় করে!

নন্দরাণী বলিল,—ভালোই করো! নাহলে আমার গান শুনে রেডিয়োর উপর রাগ আরো বাড়তো!

কিরণ বলিল,—কখ্খনো না। তোমার গান শুনলে তোমার প্রোগ্রামের সময় রেডিয়ো খুলে বসতুম! বৌদির গান!

বীণার খুব ভালো লাগিতেছিল এই সহজ সরল কথাবার্ত্তা।

বীণা বলিল,—রেডিয়োয় যা হতো, তা নিয়ে তর্ক করে কোনো লাভ নেই! তার চেয়ে যদি গান শুনতে চাও কিরণ-দি···

কিরণ বলিল,—সত্যি···গাও ভাই বৌদি। গিয়ে দাদাকে রিপোর্ট যা দেবো, দাদা চমৎকৃত হয়ে যাবে। সেই ফাঁকে দাদার কাছ থেকে কিছু আদায় করা চলবে! কি বলো সলিল ?

বীণা বলিল, হুঁ!

কিরণ বলিল,—গাও···

নন্দরাণী বলিল,—লজ্জা করছে···ভারী তো আমি গাই!

কিরণ বলিল,—হাল্‌কা গানই গাও। কে তোমার ভারী গান শুনতে চায়! ভারী গান মানে সেই রাগিণী ভাঁজা! সে ভাই পণ্ডিতের দল রাগিণী নিয়ে ডাম্বেল ভাঁজুন্! আমরা শুনতে চাই গান···যে-গান শুনে আরাম পাবো, যে-গান কাণে ভালো লাগবে!···

কুণ্ঠিত স্বরে নন্দরাণী বলিল,—ওঁরা রয়েছেন···

হাসিয়া কিরণ বলিল,—ওঁরা গানের উপর চটা, এ-ধারণা তোমার মনে হলো কি করে?...কোনো ভয় নেই···মা খুব গান ভালোবাসে··· মা নিজে গান গায়—এখনো···জানলে।

নন্দরাণী নিস্তার পাইল না। তাকে গান গাহিতে হইল।

নন্দরাণী গাহিল—

> কেন বাজাও কাঁকণ কণ-কণ কত ছল-ভরে!
> ওগো ঘরে ফিরে চলো কনক-কলসে জল ভরে!···

গান শেষ হইলে নন্দরাণী বলিল,—এবারে তোমাদের গান শুনবো··· তোমরা গাও।

কিরণ বলিল,—তোমার ও-গলা শুনে আমার গলা কাণ-মলা খাবে ভাই বৌদি। সলিলকে জিজ্ঞাসা করো, ও কখনো শুনেছে আমার গান?···আমি সত্যি গান গাইতে পারি না। সলিল গান গাইবে। ও গান শিখছে ভালো লোকের কাছে। গাও তো সলিল...

লজ্জায় সঙ্কোচে বীণা এতটুকু হইয়া গেল! বীণা বলিল,—আগে গান শিখি, তার পর গেয়ে শোনাবো···সত্যি শোনাবো। আমার গান

শোনার চেয়ে চলো ভাই, একটু বেড়াই—এ-জায়গা আমার এত ভালো লাগছে! কখনো মাঠে আসিনা তো···

কিরণ বলিল,—এ-মাঠটি আমার খুব ভালো লাগে। ফাঁকা ফর্দা··· তাই তো আজ বৌদিকে কোথায় দেখবো এ নিয়ে যখন কথা উঠলো, আমি বললুম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চলো, মা। আমার কথাতেই এ মাঠ ঠিক হয়েছে!

নন্দরাণী চাহিল বীণার পানে, বলিল,—তুমি কাশীতে থাকতে?

বীণার বুকে চমক! কাশীর কথা কেন?

বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

কিরণ বলিল,—ওর ইতিহাস যদি শোনো বৌদি, রীতিমত রোমান্স! কত ঝড়-জল ওর মাথার-উপর দিয়ে বয়ে গেছে···আহা, বেচারী! ওর কথা যখন ভাবি, এত দুঃখ হয়!···সন্তোষ কাকার মেয়ে। খুব ছোট-বেলায় সন্তোষ কাকাকে দেখেছি। কি চমৎকার মানুষ ছিলেন! আমাকে কত লজেঞ্জেস, কত পুতুল-খেলনা দিতেন! আজো সে পুতুল আমার আছে। চমৎকার মেয়ে সলিল···কিন্তু আমার সঙ্গে ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-দাগে ওকে দেগে দিয়েছি, এ-জন্মে আর ও আমাকে ভুলতে পারবে না...শত চেষ্টা করলেও নয়!

দু'চোখে কুতূহলী দৃষ্টি লইয়া নন্দরাণী চাহিল কিরণের পানে, তার পর বীণার পানে।

কিরণ বলিল,—মোটরে চড়ে সকলে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। দাদা মানে, তোমার বর···গাড়ী চালাচ্ছিল।···এক সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে দিলে আমাদের গাড়ীর ধাক্কা লাগিয়ে···গাড়ী উল্টে গেল। সবাই ছোটখাট

চোট খেয়ে সে-যাত্রা স্বরে গেলুম। সলিলের কলার-বোন্ ভেঙ্গে গেল! উঃ, সে কি দিন গেছে···

নন্দরাণী শুনিল···বীণার পানে চাহিয়া সে বলিল,—কাশীতে কোথায় তোমরা থাকতে?

আবার কাশী!

কোনোমতে ঢোক গিলিয়া বীণা বলিল,—কোদাইচৌকী।

নন্দরাণী বলিল,—আমার এক খুড়ীমা কাশীতে থাকেন। কাশীতে আমি দু'বার গিয়েছি। তাঁর বাড়ীতেই থেকেছি। খুড়ীমা থাকেন গোধূলিয়ায়। কোদাইচৌকীর নাম শুনেছি। এক্কা চ'ড়ে একা আমি কি ঘোরা ঘুরতুম! সকলে ঠাট্টা করতো, বলতো, বর্গী এসেছিস যেন!

কথাটা বলিয়া নন্দরাণী হাসিল।

কিরণ বলিল,—ও···দৌরাত্ম্যপনা তাহলে জানো! তোমার সঙ্গে আমার খুব বন্‌বে ভাই বৌদি···আমিও কম হুড়ে নই।···মা বলে, মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে তোকে মানাতো! সত্যি, দাদা···মানে, তোমার বর খুব শান্ত-শিষ্ট। আমি কিন্তু···যাকে বলে দজ্জাল মেয়ে!

হাসিয়া বীণা বলিল,—আমি কিন্তু সে পরিচয় পাইনি। এ্যাদ্দিন এসেছি...

হাসিয়া কিরণ বলিল,—বোনের সঙ্গে কি দজ্জালপনা করবো বলো?

প্রতিমা ডাকিল,—কিরণ···

কিরণ বলিল,—মা...

প্রতিমা বলিল,—বসে বসে শুধু গল্প করছিস ক'জনে! গাড়ীতে

চকোলেট, কেক, লেবু, আপেল—এ-সব আনলি কেন? সেগুলোতে মাঠের হাওয়া লাগাবি বলে?

কিরণ বলিল,—তোমার বৌ এমন গুণ করেছে যে, সে-কথা ভুলে গেছি মা···সত্যি! বৌ করছো বটে, কিন্তু এ মেয়ে যাদু জানে। যাদুকরী···বুঝলে! ভয় হচ্ছে, মায়ের স্নেহে শেষে বঞ্চিত না হই!

নন্দরাণীর মা হাসিলেন, বলিলেন,—বালাই তাছাড়া তুমি যেখানকার স্নেহের সামগ্রী, সেখানে গিয়ে সব লুটে নেবে মা···হলেই বা মায়ের স্নেহে বঞ্চিত!

প্রতিমা বলিল,—যা, যা, গাড়ী থেকে সেগুলো আন্। এনে তিন জনে মিলে-মিশে খা। গাড়ী করে সে সব আর বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না, বাছা···

কিরণ চাহিল নন্দর আর বীণার পানে, বলিল,···তোমরা বসে গল্প করো ভাই, আমি ফলটলগুলো নিয়ে আসি।

নন্দরাণী বলিল,—আমরাও যদি সঙ্গে যাই, আপত্তি আছে?

দু'চোখ কপালে তুলিয়া বিস্ময়ের ভঙ্গী নকল করিয়া কিরণ বলিল,—খুব আপত্তি আছে। দেখে ড্রাইভার কি ভাববে! ভাববে, ওমা, বৌ হতে না হতে এতখানি গিন্নিপনা···

হাসিয়া নন্দরাণী বলিল,—গিন্নিপনা করবো না···সত্যি বলছি ভাই। শুধু সঙ্গে যাবো আর সঙ্গে ফিরে আসবো। ফলটল যা আনতে হয়, তুমিই এনো···

—ও···তাহলে এসো। বুঝেছি। ভাবছো, আনতে আনতে ক্রীম-চকোলেটগুলো যদি আগে-ভাগে খেয়ে ফেলি!

হাস্য-পরিহাসে তুফান তুলিয়া তিন জনে আসিল মেমোরিয়াল গ্রাউণ্ডসের বাহিরে···

পথে গাড়ী। কিরণ গেল খাবার আনিতে···

নন্দরাণী আর বীণা ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল···নন্দরাণী বলিল,—কত দূর পর্য্যন্ত···কি চমৎকার দেখাচ্ছে!

বীণা বলিল,—হ্যাঁ···

বিমুগ্ধ নয়নে বীণা চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ঝাউ-গাছের পিছনে বহুদূরে ঐ সব জাহাজের মাস্তুল···ঘোড়দৌড়ের মাঠ···ও-দিকে বহু দূরে ঐ অক্টার্লনি মনুমেণ্ট···চলন্ত গাড়ীর অবিরাম-গম্ভীর ধ্বনি···

হঠাৎ চোখ পড়িল একটু দূরে···পথের ও ধারে একটা বেঞ্চে···

ঠ্যালা-গাড়ী লইয়া একটা লোক হ্যাপি-বয় বিক্রয় করিতেছে এবং বেঞ্চে বসিয়া আর-একটি লোক সে হ্যাপি-বয় কিনিতেছে! লোকটার চেহারা···

তার মুখের পানে চাহিবামাত্র বীণার মাথায় যেন বাজ পড়িল! সর্ব্বনাশ! ও যে শ্রীপতি!

মাথা ঝিম-ঝিম করিয়া উঠিল। বীণা তাড়াতাড়ি ফিরিল...বলিল,—আমার বড্ড মাথা ধরেছে···হঠাৎ! আমি এগুই ভাই···

নন্দরাণী বলিল,—চলো, আমি সঙ্গে যাই। কিরণ তো আস্‌ছে।

ফিরিয়া দুজনে খানিকদূর অগ্রসর হইয়া আসিল···বীণার বুকের কাঁপন থামিতে চায় না!

চকিতের জন্য দাঁড়াইয়া বীণা চাহিল সেই বেঞ্চের দিকে। শ্রীপতি এ-দিকে দেখে নাই, হ্যাপি-বয় লইয়া পরমানন্দে কাঠি চুষিতেছে!

১৮

বীণার হাসি-খুশী কোথায় ভাসিয়া গেল···

তবু তাকে হাসিতে হইল, কথা কহিতে হইল। কিন্তু সে হাসি, সে কথার সঙ্গে প্রাণের যোগ রহিল না। অক্ষম অভিনেতা যেমন নাটকের কথা মুখস্থ করিয়া গ্রামোফোন-রেকর্ডের মতো সে-কথা উদ্গীরণ করিয়া যায়, বীণার এ কথা, এ হাসি ঠিক সেই রেকর্ডের মতো প্রাণহীন!

কিরণ বলিল,—তোমার কি হলো সলিল? হাসছো, কথা কইছো··· কিন্তু যেন আর-এক মানুষ!

বীণার বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বলিল,—মাথাটা হঠাৎ কেমন ধরে উঠলো···

প্রতিমা ও নন্দরাণীর মা কাছে বসিয়া খাওয়াইতেছিলেন; বীণার এ কথা প্রতিমার কানে গেল। তিনি বলিলেন,—মাথা ধরেছে?

অপ্রতিভ কণ্ঠে কোনো মতে বীণা বলিল,—একটু···

প্রতিমা বলিলেন,—এখনো সম্পূর্ণ সারতে পারোনি মা! তা এক কাজ করো, খাও—খেয়ে তিন জনে একটু পায়চারি করো। বাতাসে মাথা-ধরা সেরে যাবে। তা ছাড়া সন্ধ্যা হলো, এখনি আমরা ফিরবো।

বীণা উঠিতে চায় না। মনের মধ্যে যেন অন্ধকারের বন্যা বহিয়া

চলিয়াছে! সে অন্ধকারে ছায়া-মূর্ত্তির মতো কত দৈত্য, কত প্রেত হুহুঙ্কার করিতেছে! তারা যেন বলিতেছে, একবার যখন আমাদের খর্পরে পড়িয়াছ, পড়িয়া আমাদের গণ্ডীতে পা দিয়াছ, তখন কত দুর্ভোগ সহিতে হইবে, তার কি আর হিসাব আছে!

বীণা ভাবিতেছিল, ইহার চেয়ে কাশীতে বেশ ছিল! কেন যে এমন সাধ হইয়াছিল···এমন অদ্ভূত খেয়াল···

সেই শ্রীপতি কলকাতায় আসিয়া উঠিয়াছে! নিশ্চয় তাহারি সন্ধানে! বীণা জানে, শ্রীপতি কেমন লোক! গল্পে-উপন্যাসে পড়িয়াছে villain! আগে ভাবিত, মানুষ নাকি অমন কখনো হয়? ও-সব মিথ্যা কল্পনা! লেখকদের বাড়াবাড়ি করা স্বভাব, তাই এমন সব লোকের কথা তাঁরা গল্পে লেখেন! কিন্তু শ্রীপতি···আগাগোড়া যে ভাবে বিব্রত করিয়া আসিতেছে, গল্প-উপন্যাসের কোনো villain তার সিকির সিকি করিতে জানে না!

কিরণ বলিল,—সলিলা কিছু খেলে না মা···

নন্দরাণী বলিল,—আইস-ক্রীমটা খাও ভাই···

বীণা বলিল,—সত্যি, পারছি না···

প্রতিমা বলিল,—না খেতে চায়, ওকে জেদ করো না মা। সত্যি, মাথা ধরলে এক-এক জনের শরীরের যে-অবস্থা হয়, আমি নিজে ঐ-দলের ···জানি তো!

তিন জনে উঠিল। কিরণ বলিল,—কোন্ দিকে যাবে? বাইরের দিকে?

বীণা শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—না, না…ও-দিকে ভারী ভিড়…তার চেয়ে এ-দিকে…ঐ সব গাছপালা…

—বেশ…৷

তিন জনে ঘুরিতে বাহির হইল। নন্দরাণী বলিল—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হবার আগে কলকাতার লোক কোথায় গিয়ে নিশ্বাস ফেলতো, সত্যি ভাই, মাঝে মাঝে আমি সে-কথা ভাবি।

কিরণ বলিল,—বাবা বলেন, তোদের কলকাতা তো চমৎকার হয়েছে রে…আমাদের ছেলেবেলায় কলকাতা যা ছিল…গড়ের মাঠ ছাড়া এমন একটু জায়গা ছিল না যেখানে গিয়ে মানুষ হাঁফ ছাড়তে পারে! এখন তোদের আমলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, লেক, ষ্ট্রাণ্ড! বাবা বলেন, তখনকার ইডেন গার্ডেনে ব্যাণ্ড-ষ্টাণ্ডের সামনে ধুতি-চাদর পরে যাওয়া বারণ ছিল! ওঁদের ছেলেবেলায় কত দিকে কত বিধি-নিষেধ যে ছিল! বাবার কাছে সে-কালের কলকাতার গল্প শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই! ভাবি, আমাদের এ কলকাতা…সে-কলকাতা বাঙালীর কাছে ছিল যেন সাউথ-আফ্রিকার কেনিয়া। গোরারা পথে বেরুলে বাঙালী-ভদ্রলোক তাদের কাছ থেকে দেড়শো হাত দূরে সরে যেতো…পাছে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়!

হাসিয়া নন্দরাণী বলিল,—সত্যি?

কিরণ বলিল,—বাবার কাছে শুনি। বাবাকে মাঝে-মাঝে আমরা ধরি, ধরে বলি, তোমাদের সে-কালের কলকাতার রূপ-কথা বলো বাবা… বাবা বলেন।

এ-কথায় বীণার মন নাই। তার মন ভরিয়া শ্রীপতি সেই হ্যাপি-

বয়ের কাঠি-চোষা মূর্ত্তি লইয়া বসিয়া আছে! সে-মনে আর কোনো-কিছু প্রবেশ করিবে, তার ঠাঁই নাই!

ফিরিবার সময় কাঁটা হইয়া বীণা চলিল সকলের পিছনে। সকলের আড়ালে নিজেকে রাখিয়া বাহিরে আসিল। বাগান, দীঘি, গাড়ী-ঘোড়া, মানুষ-জন ছাড়িয়া দু' চোখের দৃষ্টি গাছতলায় সেই সাপের সন্ধানে আকুল, অধীর!...ঐ সে গাছ-তলা...ও গাছ-তলায় ঐ সে-বেঞ্চ...

কিন্তু বেঞ্চে সে নাই!...মনের উপর দিয়া যেন এক-ঝলক বসন্ত-বাতাস বহিয়া গেল!

এবার গাড়ীতে উঠিবার পালা...তার পূর্ব্বে নূতন সখিত্বের আবেগ-প্রীতির কত উচ্ছ্বাস যে বিকীর্ণ হইল!

নন্দরাণী বলিল,—এক দিন এসো ভাই আমাদের বাড়ী বেড়াতে...

মুখে শুষ্ক হাসি...বীণা বলিল,—যাবো।

কিরণ বলিল,—যাবে কি! আগে বিয়ে হোক...

নন্দরাণী বলিল—কেন, এখন যেতে দোষ আছে?

কিরণ বলিল—দোষ নেই। কিন্তু বিয়ে যদি না হয়, ভাব করে শেষে তোমার অভাবে পস্তাবো না কি? কি বলো ভাই সলিল?

নন্দরাণী কোনো কথা কহিল না...সরমের রক্ত-রাগে তার মুখ একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল।

প্রতিমা বলিলেন—ওকে ছেড়ে দে কিরণ।

কিরণ বলিল—সেই তো দু'দিন বাদে বাড়ীতে নিয়ে যাবে মা...তার চেয়ে আমি বলি, আজই নিয়ে চলো না কেন!

প্রতিমা বলিলেন,—দিন-ক্ষণ দেখে নিয়ে যেতে হয় রে!

কিরণ বলিল—ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য আবার দিন-ক্ষণ দেখবে কি!...লক্ষ্মীর জন্য সব সময়ে ঘরের দোর খোলা থাকবে!

নন্দরাণীর মা বলিলেন—লক্ষ্মীপূজাও সব-বারে হয় না, মা। লক্ষ্মী-পূজার জন্য আলাদা তিথি-বার ঠিক করা আছে।

কিরণ বলিল,—এ-লক্ষ্মীকে আমরা জল-চৌকির উপর কলার পেটোয় বসিয়ে ধান দিয়ে পূজা করবো না তো!

নন্দরাণীর মা বলিলেন—দু'দিন সবুর করো মা...ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের ঘরে ও যেন লক্ষ্মী হয়ে কলার পেটোটুকুতেই বসতে পায়!...

প্রতিমা বলিল—আয় কিরণ, আর দেরী করিস্‌নে...

কিরণ বলিল—আসি ভাই বৌদি। কত দোষ-ত্রুটি করেছি, সে-সব ক্ষমা করো...বুঝলে?

নন্দরাণী হাসিয়া বলিল—আমার দোষ-ত্রুটিও তুমি ক্ষমা করো...

বীণা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল! ভয়ে সে কাঁটা হইয়া আছে! এখানে দাঁড়াইয়া এ-সব কথাবার্ত্তা তার ভালো লাগিতেছিল না! গাড়ীতে বসিয়া নিজেকে নিরাপদ করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যায়! শ্রীপতি যদি কাছাকাছি কোথাও থাকে?...হঠাৎ যদি আবার এখানে আসিয়া পড়ে?...

প্রতিক্ষণ এই চিন্তা। এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে রোমাঞ্চ...

কিরণ তাকে ছোট একটা ধাক্কা দিল, দিয়া বলিল—তুমি নীরব হয়ে রইলে যে সলিল! বৌদির সঙ্গে বিদায়-সম্ভাষণ করো। না হলে বাড়ী গিয়ে বৌদি বলবে, সলিলা মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়নি!

সপ্রতিভ হইয়া বীণা চাহিল নন্দরাণীর দিকে। মৃদু কণ্ঠে কহিল,—আসি ভাই…

—আমিও আসি…

প্রতিমা আবার তাড়া দিল, বলিল—আয় রে কিরণ…সলিলার মাথা ধরেছে, শুনছিস্! তা'ছাড়া ওঁদেরো রাত হয়ে যাচ্ছে, আজকের মতো ছেড়ে দে! এক দিন যাস বরং ক'জনে মিলে লেকে কিম্বা বায়োস্কোপ দেখতে কিম্বা শিবপুরের বাগানে…তখন প্রাণ খুলে আলাপ করিস!

কিরণ বলিল—সত্যি?

প্রতিমা বলিল—হ্যাঁ।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিগলিত হইয়া কিরণ বলিল—হ্যাঁ মা, সে বেশ হবে। সে-দিন দাদাকেও বরং সঙ্গে নেবো…আমাদের গাইড হবে। তাহলে…নাঃ, সত্যি এবাব আসি ভাই বৌদি…

ও-বাড়ীতে বিবাহের কথাবার্ত্তা দিনে-দিনে পুঞ্জিত ঘনীভূত হইয়া অবশেষে একদিন পাকা হইয়া উঠিল। এবং বিবাহের আয়োজন স্বরু হইয়া গেল।

সে আয়োজনের ঢেউ আসিয়া তারাচরণের গৃহকে রীতিমত আঘাত করিল। তারাচরণ রায়কে নানা পরামর্শের জন্য ও-বাড়ীতে ছুটিতে হয়। হিরণ্ময়, প্রতিমা, কিরণ—তারাও এ-বাড়ীতে নিত্যক্ষণ ছুটিয়া আসে।

কিরণ আসিয়া সলিলাকে ধরে, বলে—এসো ভাই, দাদাকে নিয়ে জু'তে যাবার ব্যবস্থা করেছি। মস্ত একটা চক্রান্ত করেছি…যাকে বলে, রীতিমত প্লট।

এ-বাড়ীর এই হাসি-কলরবের মধ্যে ডুব দিয়া বীণা তার মনের আশঙ্কা ও সংশয় ধুইয়া-মুছিয়া সাফ্ করিতে চায়!

বীণা বলিল—কি প্লট, শুনি?

কিরণ বলিল—কারো কাছে বলবে না, বলো? ঘুণাক্ষরে এতটুকু ইঙ্গিত অবধি নয়?

বীণার মন কৌতূহলে ভরিয়া ওঠে। বীণা বলে—সত্যি বলবো না…

কিরণ বলিল—ও-দিকে বৌদিকে টেলিফোন্ করেছি, তোমার জন্য বড্ড মন কেমন করছে ভাই, তোমাকে ভারী দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে…তা আসবে একবার জুয়ে? আমি যাবো সলিলাকে নিয়ে। বৌদি বলেছে, আচ্ছা।

কিরণ হাসিল।

বীণা বলিল—তার পর?

কিরণ বলিল—দাদা তো আমার এ ব্যবস্থার কথা জানেন না…দাদাকে বলিনি। দাদাকে শুধু বলেছি,—চুপচাপ বসে শুধু বৌয়ের মুখ ধ্যান করছো…কাজ-কর্ম্ম নেই…চলো দিকিনি আমাদের নিয়ে চিড়িয়াখানায়। দাদা বললে, বেশ, চ।…দাদা জানে না যে, ও-দিকে বৌদিকে জুয়ে আসতে বলেছি…আবার বৌদিকেও বলিনি যে, দাদাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে আমরা জুয়ে যাচ্ছি…

বীণা কোনো জবাব দিল না…নিষ্পলক নেত্রে শুধু কিরণের পানে চাহিয়া রহিল।

মনে হইতেছিল, কি সুখে আছে কিরণ! শুধু কিরণ কেন, কিরণের বাড়ীর দাসী-চাকরগুলা পর্য্যন্ত। নিজের মনে হাসি-গল্প করিতেছে…

ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে···কোনো দিকে বাধা নাই, দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, ভয় নাই! আর সে···?

এ সংশয়, এ ভয়ের ভার মাঝে মাঝে এমন ভারী হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসে যে, বীণা ভাবে, আর পারি না! ভাবে, তারাচরণের পায়ের উপরে পড়িয়া কাঁদিয়া সব কথা খুলিয়া বলি···সব অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাই! ক্ষমা চাহিয়া বলি, আমি সলিলা নই, আমি বীণা! আমি চোর, আমি ঠক, আমি প্রবঞ্চক···আমি···আমি···কিন্তু আমাকে তাড়াইয়া দিয়ো না! তোমার পায়ের নীচে আমার জন্য একটু নিরাপদ আশ্রয় দিয়ো। পায়ের নীচে সে-আশ্রয়টুকু ছাড়া আর আমি কিছু চাই না···কিছু না...তোমার ধন, দৌলত, তোমার শাড়ী-সেমিজ, গাড়ী···স্নেহ কিছু চাই না! এ-সব চাহিবার দাবী আমার নাই! এ-সবের লোভও কখনো করিব না···

তার বিরসমুখ, বাকহীন মূর্ত্তি দেখিয়া তারাচরণ তাকে বুকে টানিয়া লন, বলেন—মুখ এমন মলিন কেন দিদি? অসুখ করেনি তো?

কম্পিত কণ্ঠে বীণা জবাব দেয়—না···

—তবে?

বীণার দুই চোখ জলে ভরিয়া ওঠে। তারাচরণের পানে সে চাহিয়া থাকে। মুখে কথা নাই···মনের দ্বারে শ্রীপতি আসিয়া দাঁড়ায়··· মাঠের ধারে বেঞ্চে বসিয়া হ্যাপি-বয়ের কাঠি চুষিতেছে!

এখানে কোনমতে হয়তো মনকে সে ঠিক করিয়া লইতে পারিত··· কিন্তু কোথা হইতে যে লক্ষ্মীছাড়া শ্রীপতিটা দুষ্ট গ্রহের মতো তার পিছনে আসিয়া উদয় হইল!

১৯

মনের উপর রৌদ্র-মেঘের বিরাম রহিল না! এবং এই রৌদ্র-মেঘের অবিরাম ছন্দের মধ্য দিয়া এক দিন কিরণ আসিয়া বীণাকে বলিল,—দাদার আজ পাকা-দেখা, সলিলা। সাত দিন পরে বিয়ে।

বীণা শুনিল, কোনো কথা বলিল না।

কিরণ বলিল,—আমি তোমাকে নিতে এসেছি। দাদুর অনুমতি নিয়ে তবে এসেছি···

বীণার বুকে মৃদু একটু কাঁপন! ও-বাড়ীর বিবাহ···তার মানে, প্রচণ্ড ভিড়···কত-রকমের কত লোক কত দিক হইতে আসিয়া জমিবে!

ভিড়ের নামে বীণার ভয় এখন এত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে···

ছ'দিন কাটিয়া বিবাহের দিন আসিয়া দেখা দিল।

সকালের দিকে বীণা চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিল। কিরণ ভালোবাসে, প্রতিমা ভালোবাসে, ও-বাড়ীতে তার কত আদর, বীণা বোঝে। বুঝিলে কি হইবে? ও-বাড়ীতে লোকের ভিড়···সে যেন ভয়ে আকুল হইয়া আছে! কে হয়তো এমন লোক আসিয়া উপস্থিত হইবে,

বীণাকে দেখিয়া বলিয়া বসিবে ওমা, তুমি না কাশীতে থাকিতে—সেই ক্ষীরোদাময়ীর বাড়ীতে ?

এমন ঘটে নাই! এমন ঘটিতে পারে না বলিয়া কাশীর কথা এত দিন সে কল্পনা করে নাই! কিন্তু সে-দিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে শ্রীপতিকে দেখিয়া অবধি এ ভয় মনকে এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, এক দিনের জন্য সে সুস্থির হইতে পারে না!

দাক্ষায়ণী আসিয়া ডাকিলেন,—সলিলা···

বীণা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কেন পিশিমা ?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এখনো চুপচাপ বসে আছো! ওরা সব তৈরী হয়েছে। মামাবাবু বল্‌লেন, একসঙ্গে তোমরা তিন জনে ও-বাড়ীতে যাবে···

কুণ্ঠিত স্বরে বীণা বলিল—আমি জানতুম না পিশিমা···

মুখ বাঁকাইয়া দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এর আবার জানান দিতে হবে না কি! কি যে ভাবো, বুঝিনে বাছা! তা, হ্যাঁ, আমি এসেছিলুম তোমার বৌদির বেনারসী-শাড়ীখানা ময়লা হয়ে গেছে···আমি দেখিনি, তাই কাচানো হয়নি। যেটি না দেখবো, সেটির আর কিছু হবে না তো! হুঁঃ! হ্যাঁ, তা ভালো কথা, তোমার একখানা বেনারসী ওকে দাও, বুঝলে! না হলে ঐ ময়লা শাড়ী পরে গেলে এ-বাড়ীর মান থাকবে না!

বীণা বলিল,—আমি বার করছি পিশিমা, যেখানা পছন্দ হয়—

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—যে পরবে, তাকেই বরং ডেকে দি। তোমরা

হচ্ছো বাড়ীর মেয়ে—তোমরা স্াদাসিধে শাড়ী পরে গেলে ক্ষতি হবে না ...কিন্তু ও বৌ-মানুষ কি না, তাই, মানে,...

দাক্ষায়ণী গেলেন বৌমাকে ডাকিতে ; বীণা তার দেরাজ খুলিল।

বৌমার পছন্দ ভালো...দেখিয়া-শুনিয়া সন্থ-কেনা দেড়শো টাকা দামের পেঁয়াজী রঙের বেনারসী পছন্দ করিল। বীণা বলিল,—বেশ, এটাই নাও বৌদি...

বৌদি বলিল,—কিন্তু ব্লাউশ্? তোমার জামা কি আমার গায়ে হবে ছোট-ঠাকুরঝি?

বীণা বলিল,—গায়ে দিয়ে ছাখো...

গোটা দেরাজটা বৌদির চার্জ্জে দিয়া বীণা সরিয়া দাঁড়াইল।

বৌদি বলিল,—তুমি শীগ্গির নাও ভাই! কত আর দেরী করবে?

বীণা একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে কি সাধ করিয়া দেরী করিতেছে? কিরণ অত ভালোবাসে...তারো মন পড়িয়া আছে সেই কিরণের কাছে! প্রতিক্ষণে মন বলিতেছে, ছুটিয়া যাই, চলো! কিন্তু পা সরিতে চাহিতেছে না! কেন সরিতেছে না, তা যদি কাহাকেও আজ খুলিয়া বলিতে পারিত! হায় রে, তা পারে না, পারে না, পারে না...

তারাচরণ রায় আসিলেন, বলিলেন,—শুনছো সলিলা-দিদিমণি...

বীণা বলিল,—দাদু—

তারাচরণ বলিলেন,—কি হচ্ছে তোমাদের? তিনজনে মিলে শাড়ীর দোকান খুলে বসেছো...

বিরজা তাড়াতাড়ি বলিল,—বৌদিকে একখানা ভালো শাড়ী

বেছে দিচ্ছে কি না···বললে, তিনজনে এক সঙ্গে যাচ্ছি এক-বাড়ী থেকে···

কথাটা শুনিয়া বীণা চমকিয়া উঠিল! এ-কথার অর্থ? বীণা যেন যাচিয়া ডাকিয়া আনিয়া শাড়ী দিতেছে—কেন বিরজা এ কথা বলিল?

কিন্তু তারাচরণ এ-কথায় যেমন খুশী হইলেন, তেমনি তাঁর মনের কোণে একটু বিরক্তি না ধরিল, এমন নয়! সলিলার এতখানি বিবেচনা ···পরের জন্য এমন ত্যাগ-স্বীকার! সে জন্য তার উপর খুশী হইলেন। বিরক্তির কারণ, বীণা ভালো, মুখে কথা নাই, তাই তার দেরাজ খুলিয়া ভালো শাড়ী-জামাগুলা তচনচ করিয়া দিবার কি প্রয়োজন ইহাদের ছিল?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—শীগ্‌গির করে নাও সব। ও-বাড়ী থেকে দু'বার তাগিদ এসেছিল···এখনি না গেলে দুর্জ্জয়ময়ীর বেশে কিরণময়ী এসে বাক্যবাণ ছুড়বে—কিরণকে জানো তো দিদি···

বীণা জানে, বীণাকে কিরণ কতখানি ভালোবাসে···

বীণা বলিল,—আমি এখনি তৈরী হয়ে নেবো দাদু।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—হ্যাঁ, নাও।···কি পরে তুমি যাচ্ছো··· আমাকে সে-সাজ দেখিয়ো। তাড়াতাড়ি চলে যেয়ো না, বুঝলে দিদি···

তার পর তিনি চাহিলেন বিরজার পানে; বলিলেন,—সলিলা গা ধুতে যাক্। তোরা দু'জনে ততক্ষণে ওর জামা-কাপড়গুলো দেরাজে তোল্···আমি দেখি।

বিরজা প্রমাদ গণিল। বৌদির শাড়ী-জামা বাছিতে আসিয়া সেই অবসরে সেও একখানা শাড়ী বাছিয়া লইয়াছে···নিজের শাড়ীর চেয়ে

এ শাড়ী দামী ; তার উপর কাজের বাড়ীতে কে জানে, সকড়ি লাগিতে পারে, কত বিভ্রাট ঘটিতে পারে! শাড়ী যদি নষ্ট হইয়া যায়? তার চেয়ে যদি কিছু ঘটে, বীণার শাড়ীর উপর দিয়া ঘটিয়া যাক্!

ইহা ভাবিয়া দেরাজ হইতে শাড়ী-জামার স্তূপ বাহির করিয়া ডাঁই করিয়া তুলিয়াছে! এ-সব এমনি রাখিয়া সরিয়া পড়িবে, ভাবিয়াছিল! কোথা হইতে অকস্মাৎ তারাচরণ রায় আসিয়া এমন আদেশ দিলেন··· একখানি-একখানি করিয়া এ-শাড়ী-জামা তুলিতে প্রাণ এখন বাহির হইয়া যাইবে!

কিন্তু উপায় নাই।

এ-দিককার কাজ সারিয়া তিনজনের ও-বাড়ীতে যাইতে আরো আধ-ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তারাচরণ রায় দাঁড়াইয়া বীণার বেশভূষা দেখিলেন···এমন বেশভূষায় সাজিলেও বীণার মনে সেই আতঙ্ক··· এ-আতঙ্ক এ ক'দিনে তার মনে শিকড় গাড়িয়া ডালপালা মেলিয়া বাড়িয়া এমন কায়েমী ঠাঁই গ্রহণ করিয়াছে···

তার মলিন মুখ দেখিয়া তারাচরণ রায়ের মনে আঘাত লাগিল। মনের মধ্যে যেন সপ্তসিন্ধু উথলিয়া উঠিল! সব কাড়িয়া লইয়া দুঃখী-কাঙালকে ঘরে আনিয়া আজ তিনি মণির আসন পাতিয়া তাহাতে বসাইতে চান! যে-দিন তার সব ছিল···মা···বাপ···

দাক্ষায়ণী আসিয়া বলিলেন,—ব্যাপার কি? এখনো তোমাদের হলো না বাছা? ও-দিকে বর বেরুবার সময় হয়ে এলো যে! এসো, এসো···

তারাচরণ রায়কে দেখিয়া বলিলেন,—মামাবাবু!

তারাচরণ রায় বলিলেন—তুইও যাচ্ছিস নাকি দাক্ষে?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—বৌ অনেক করে বলে গেছে… তুমি যাবে না মামাবাবু?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—যাবো। তবে বরযাত্রী যাবো না… হিরণ্ময়ের ওখানে ঘুরে আসবো বৈ কি। তা তোরা এক সঙ্গেই যা… তোরা ও-বাড়ীতে গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দিলে সে-গাড়ীতে আমি যাবো…

বর-বরযাত্রী বাহির হইয়া গেলে কিরণ বলিল—তোমার-আমার নেমন্তন্ন হয়েছে সলিলা…

নিমন্ত্রণ!

বীণা কহিল—কোথায়?

কিরণ বলিল—কনের বাড়ীতে। দাদার শাশুড়ী অনেক করে মাকে বলে পাঠিয়েছেন…তা' ছাড়া আরো একটা জিনিষ দেখাচ্ছি…

বলিয়া কিরণ ড্রয়ার হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া আনিল। কহিল—পড়ে গ্যাখো…

বীণা চিঠি পড়িল।

এ চিঠি নন্দরাণী লিখিয়াছে…বিবাহের বধূ নিজে। নন্দরাণী লিখিয়াছে—

প্রিয়তমাসু

ভাই কিরণময়ী

লক্ষ্মী ভাই, তোমার সঙ্গে আজ থেকে যে-সম্পর্কই হোক, তুমি আমার

বন্ধু। আগে থেকেই আমাদের এ বন্ধুত্ব হয়েছে। শুধু তুমি কেন, সলিলাও আমার বন্ধু। আমার ইচ্ছা, আমার বিয়েতে তোমরা দুই বন্ধুতে এখানে আসবে। তাই তোমাদের দুই বন্ধুকে আজকের এ রাত্রে বিশেষ করে নেমন্তন্ন করছি। গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসবো, সে উপায় হবার জো নেই! এ-চিঠিতে মনের কতখানি আগ্রহ ভালোবাসা পাঠাচ্ছি, যদি বুঝতে পারো, আমার বিশ্বাস, তাহলে তোমরা দু'জনে নিশ্চয় আসবে—কোন বাধাকে বাধা ব'লে মানবে না।

তুমি আর সলিলা আমার সত্যিকারের ভালোবাসা নিয়ো ভাই!

তোমাদের আদর-ভালোবাসার
নন্দরাণী।

চিঠি পাইয়া বীণা কিরণের পানে চাহিল।

কিরণ বলিল—যাবে তো? এমন ক'রে লিখেছে! না যাওয়া ভালো দেখায় না।

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল—মাকে চিঠি দেখিয়েছি। চিঠি দেখে মা বলেছে,—যা!···তোমার যাওয়া? দাদু দোতলায় আছেন···মা'র সঙ্গে কথা কইছেন। এ-চিঠি দেখিয়ে এখনি আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে আসছি···

অনুমতি আসিল। সঙ্গে সঙ্গে, তারাচরণ রায় আসিলেন, প্রতিমা আসিল।

'তারাচরণ রায় বলিলেন,—চমৎকার মেয়ে…বুঝলে মা! এই যে চিঠি লিখে এদের ছ'জনকে নেমন্তন্ন করেছে, এ থেকে বুঝছি, মেয়েটি সত্যি-সত্যি ঘরের লক্ষ্মী হবার মতো…

প্রতিমা কহিলেন,—ওরা যাবে কাকা বাবু? পাঁচজনে যদি কিছু বলে যে, মেয়েরা বরযাত্রী এসেছে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—স্নেহকে কখনো অস্বীকার করো না মা। স্নেহের ব্যাপারে পাঁচ জনের কথা গ্রাহ্য করতে নেই। নিজের জীবন দিয়ে আমি সে-শিক্ষা পেয়েছি! স্নেহর চেয়ে বড় সম্বল মানুষের জগতে আর কিছু নেই! ওরা যাবে…নিশ্চয় যাবে। এই জন্য কেউ যদি কিছু বলে, তাতে কান দিও না, মা।

২০

বিবাহের পর ও-বাড়ীতে বাসরের আমোদ।

বধূ নন্দরাণী ডাকিল—মা...

মা বলিলেন,—কেন ?

নন্দরাণী বলিল—তোমার কুটুম-বাড়ীর দু'টি মেয়ে এসেছে, মনে রেখো। বিয়ে দেখলেই তাদের পেট ভরবে না! তুমি বসে থেকে তাদের খাইয়ো···ভিড়ের মধ্যে ওদের গুঁজে দিয়ো না যেন!

মা বলিলেন,—না রে, তোরা তিন জনে একসঙ্গে বসে খাবি। সে ব্যবস্থা আমি কি না করেছি ?

তিন জনে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিল; আহারের সঙ্গে হাসি-গল্প···

হঠাৎ কিরণ চাহিল নন্দরাণীর মায়ের পানে, বলিল,—এ কি রকম হলো মাসিমা! কনেকে তো আজ বরের সঙ্গে বাসরে এক-পাতে খেতে হয়। আমাদের চিরকালের সে-রীতি ত্যাগ করলেন কি বলে ?

মা হাসিলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

ঠাকু'মা-সম্পর্কীয়া একজন বিধবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—লোক দেখিয়ে নন্দরাণী আজ খেলে না গো! এর পর থেকে তাই খাবে। আজ তোমাদের কৃতার্থ করে দিচ্ছে আর কি! তোমরা আর পাশাপাশি আসনে বসে একসঙ্গে খাবার জন্যে ওকে পাবে না কি?

কিরণ চাহিল নন্দরাণীর পানে, কহিল—তাই না কি বৌদি? কিন্তু শাস্ত্রে পুরাণে এমন কথা লেখা নেই! লেখা আছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনে মায়ের অন্নে টান পড়ে। ননদের অন্নের কথা কৈ, কোনো পুরাণে পড়িনি, বা এমন গল্প কোনো দিদিমা-ঠাকু'মার মুখেও শুনিনি কোনো দিন!

বীণা যেন লুচি-তরকারী লইয়া খেলা করিতেছে···

নন্দরাণীর মা বলিলেন—তুমি কিছু খাচ্ছো না কেন মা?···লজ্জা করছে বুঝি?

কিরণ বলিল—লজ্জা কিসের সলিলা? খাও···

মৃদু স্বরে বীণা বলিল—খাচ্ছি···

নন্দরাণীর মাসিমা-সম্পর্কীয়া আর একটি মহিলা বলিলেন—এইটি বুঝি তারাচরণ বাবুর নাতনী?

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—হ্যাঁ...

মাসিমা বলিলেন,—বরাত বটে! তারাচরণ বাবুর এ সুবুদ্ধি যদি আর ক' বছর আগে হতো! আহা তা হলে ছেলেটা দুঃখ পেয়ে যেতো না···বৌ-চারুও সুখের মুখ দেখতো! তাই ভাবি, মেয়েটির মায়ের কথা! বিয়ে করে যেন চোর হয়ে ছিল বেচারী!···আমি তাকে জানতুম কি না! স্বামীর অত ভালোবাসা···মুখখানি মলিন করে বলতো,

আমার জন্য উনি দারিদ্র্য-দুঃখ মাথায় নেছেন। এ-দুঃখ কখনো যাবে না আমার!

তিনি বীণার পানে চাহিলেন; বলিলেন—তোমার মার নাম ছিল চারু…না?

বীণার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। আবার ঐ কথা!

কোনো মতে মাথা নাড়িয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ।

মাসিমা বলিলেন,—ভাগলপুরে আমরা ক' বছর ছিলুম যে! উনি তখন ভাগলপুরের মুন্সেফ। আমরা থাকতুম খঞ্জরপুরে। আমাদের বাঙ্লার পাশে ছোট্ট দোতলা বাড়ী…সেই বাড়ীতে থাকতেন বিশ্বনাথ-বাবু। ওখানকার কলেজে প্রোফেসরি করতেন। চারু ছিল সেই বিশ্বনাথ বাবুর বোন।…তখন তার বয়স হবে সতেরো-আঠারো বছর… যেমন লেখাপড়া জানতো, তেমনি চমৎকার গান গাইতে পারতো। চমৎকার মেয়ে! হঠাৎ বিশ্বনাথ বাবুর বসন্ত হলো—সাত দিনের দিন ভদ্রলোক মারা গেলেন। সলিলার বাবা সন্তোষবাবু তাঁর কি সেবাই না করেছিলেন! বিশ্বনাথ বাবু মারা যাবার পর সংসার অচল হলো। তখন এই সলিলার বাবা সন্তোষবাবুই সে-সংসারকে আপনার করে বাঁচিয়ে রাখলেন!…কি চমৎকার মানুষ ছিলেন এই সন্তোষবাবু…

এ-কথায় আনন্দ-উৎসবের আলো যেন ম্লান হইয়া গেল!

নন্দরাণী বলিল,—সলিলার মুখ কি ওর মার মত হয়েছে মাসিমা?

মাসিমা চাহিলেন বীণার পানে। ভয়ে লজ্জায় বীণার মাথা যেন পাতের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! ঘামিয়া সে একশা…

মাসিমা বলিলেন,—মুখখানি তোলো তো মা, দেখি।

মুখ কি তোলা যায়! অপরাধের কালিতে মুখ ভরিয়া আছে।, অথচ মুখ না তুলিলে নয়!

অতি, কষ্টে বীণা মুখ তুলিল।

মাসিমা অনেকক্ষণ ঠাহর করিয়া দেখিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—না। এ-মুখ দেখে কে বলবে, সেই মায়ের মেয়ে! মায়ের মুখখানি ছিল যেন প্রতিমার মতো! মাথায় থোলো-থোলো কোঁকড়া চুল···চোখ দু'টি টানা-টানা···যেন হরিণের চোখ!···তবে মায়ের চেয়ে মেয়ের রঙে জেল্লার জোর আছে···চারু ছিল শ্যামবর্ণ!

কিরণ বলিল,—বিয়েতে আপনি গেছলেন মাসিমা?···সন্তোষ কাকার যখন বিয়ে হয়···

মাসিমা বলিলেন,—গেছলুম বৈ কি!···আমরা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দি···আমি বরণ করেছিলুম।···আচ্ছা সলিলা, তোমার দিদিমাকে তুমি ভাখোনি?···না?

বীণার মুখে কথা নাই!

মাসিমা বলিলেন,—কি করেই বা দেখবে? চারুর বিয়ের আট মাস পরেই তিনি মারা যান।···তার পর সলিলার মাকে নিয়ে সন্তোষবাবু কাশীর কলেজে প্রোফেসরি নিয়ে চলে গেলেন।···বিয়ের আগে তারাচরণ বাবু লোক পাঠিয়ে ছিলেন—বিয়ে যাতে না হয়—ছেলেকে বারণ করে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম! নিজে চিঠি লিখেছিলেন—ত্যজ্যপুত্র করবেন বলে শাসিয়ে! খুব রাগ করেছিলেন। ভাগলপুরে এ-কথা নিয়ে একেবারে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল!

বীণার খাওয়া মাথায় উঠিল!···ভয়ে তার যা হইতেছিল···

তার সে স্তম্ভিত ভাব লক্ষ্য করিয়া নন্দরাণীর মা বলিলেন,—তোর এ-সব কথা এখন রাখ ভাই শিবানী,···মেয়ের মন দুঃখে-ব্যথায় ভরে কি রকম হয়ে গেল, ছাখ্ দিকিন!···না মা, তুমি খাও!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাসিমা বলিলেন,—সে-দিন যখন শুনলুম, তারাচরণ বাবুর সুবুদ্ধি হয়েছে···মা-বাপ-হারা নাত্‌নিটিকে ঘরে এনেছেন, নাত্‌নি বলে বুকে নেছেন,—শুনে তখন আমার কি আহ্লাদ যে হলো! মাকে জানতুম কি না! চমৎকার মানুষ ছিল সলিলার মা, আহা! শ্বশুরের আদর-যত্ন পেতো যদি! অজস্র দুঃখ-কষ্ট ভোগ করলেও মুখখানি হাসিতে ভরে থাকতো সব সময়ে। সকলকে কত দরদ-যত্ন! মনখানি ছিল স্নেহের সুমুদ্দুর! সেই মায়ের মেয়ে···ভগবান ভালো করুন!

এত দরদ···এমন প্রার্থনা···

বীণার বুকের মধ্যে তবু আগুন জ্বলিতেছে!···সলিলার মায়ের কথা মনে হইতেছিল! সে-বুকে স্নেহের কি সমুদ্র ছিল, বীণাও তা জানে! নহিলে বীণার আজ অস্তিত্ব থাকিত না!

তাঁর সে স্নেহের খুব প্রতিদান বীণা দিতে বসিয়াছে!···পুণ্যবতী সাধ্বী সতী চারুলতা···তাঁর পাশে বীণার মা অতসী?···এখানে আজ তার এত আদর···সকলে তাকে এত স্নেহ করেন, এমন ভালোবাসেন! ঘুণাক্ষরে যদি এঁরা জানিতে পারেন, সে সলিলা নয়, বীণা! শুধু তাই নয়, কি-মায়ের মেয়ে এই বীণা! যদি শোনেন, তার মা অতসী এক দিন···

ঐ শ্রীপতি···

হায় রে, সব ভুলিয়া মানুষের মতো বাঁচিবে ভাবিয়া কি দুঃসাহসে ভর করিয়া বীণা এখানে আসিয়াছে! স্বপ্নে ভাবে নাই, এখানে এত

দিক দিয়া তার এ তুঃসাহসিকতার, তার এ সুগভীর প্রতারণা-অভিসন্ধির রহস্য-ভেদের এমন বিপুল ইঙ্গিত এ-বাড়তেও এই মাসিমার হাতে আছে! কথায়-কথায় মাসিমা যদি চারুলতা দেবীর সম্বন্ধে, সন্তোষবাবুর সম্বন্ধে আরো পাঁচটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন? বীণা তার কি জবাব দিবে? তাঁদের কত কথা—সে তার কি জানে! এঁরা তাদের কথা জানেন অনেক-বেশী!...

মনে মনে ঠাকুর-দেবতাদের ডাকিয়া বীণা বলিল,—কোনো মতে এ সঙ্কটে উদ্ধার করো, ঠাকুর! এখান হইতে কোনো মতে নিরাপদে আমায় বাহির করিয়া দাও! এত আদর, এত ভালোবাসা আমার কেন সহিবে? এ ভালোবাসা সলিলার জন্য! চোর সাজিয়া আদর-ভালোবাসা আদায় করা কঠিন, তা সে জানিত না!

নিত্য-দিন নব-নব উপসর্গ...

সে-দিন কতখানি সুখ, কতখানি আনন্দের মাঝখানে ঐ শ্রীপতি আসিয়া দেখা দিয়াছে! সে আতঙ্ক মনের উপর জমাট বাঁধিয়া আছে... এখনো মিলাইবার অবসর মিলে নাই! ইহারি মধ্যে এখানে আবার এ কি আজ নূতন উপসর্গ!

ভয়ে সে কাঁটা হইয়া গেল! কে জানে, কাল সকালে কোথা হইতে আবার কি নূতন উপসর্গ আসিয়া দেখা দিবে!

কেন সে এখানে আসিয়াছিল?

ক্ষীরোদাময়ী তাকে অনাদর করেন নাই...অবহেলা করেন নাই। নিজের ছেলেদের সঙ্গে সমান-আসন দিয়া তাকে নিজের মেয়ের মতোই দেখিতেন। তার মাকে লইয়া শ্রীপতির যে সব পীড়ন-অত্যাচার সহ্য

করিয়াছেন, সে পীড়ন সহিবার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? যাচিয়া এতখানি অত্যাচার পরের জন্য কেহ সহে না—সহিতে পারে না!

সেই ক্ষীরোদাময়ীর স্নেহ ভুলিয়া, দুশ্চিন্তার পাথরে তাঁর মনকে পিষিয়া-ছেঁচিয়া চোরের মতো সে পলাইয়া আসিয়াছে! এতখানি অকৃতজ্ঞতা…ভগবান তার শাস্তি দিবেন না, এ কখনো সম্ভব?

বীণা ভাবিতেছিল, আর নয়! চোর সাজিয়া যদি বা দিন কাটানো সম্ভব হয়…সে-চৌর্য্য ধরা পড়িলে যে-লাঞ্ছনা…সে-লাঞ্ছনার মতো দুর্ভোগ আর নাই!…

ভাবিল, ঘটনাচক্র যে-ভাবে ঘুরিতে সুরু করিয়াছে, তাহাতে দু'-এক দিনের পরে তার চৌর্য্য যদি ধরা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বীণা তাহাতে বিন্দু-মাত্র আশ্চর্য্য হইবে না!

সে দুর্ভোগ ঘটিবার পূর্ব্বে এখান হইতে পালানো যদি সম্ভব হয়!

কিন্তু কোথায় যাইবে? এখানে এই সহর…সে চেনে না…জানে না! …কাশী তার চেনা জায়গা!

কাশীতেই যাইবে!

ক্ষীরোদাময়ীর কাছে?

তাই! গিয়া তাঁর পায়ের উপরে পড়িয়া বলিবে, বড় লোভ হইয়াছিল …তাই গিয়াছিলাম, মাসিমা!…আর কখনো যাইব না! তোমার পায়ে পড়িয়া থাকিব…যত দিন তুমি পায়ে রাখিবে!

সেই ঠিক…

এখানে এই নন্দরাণী…কিরণ—কিরণের মা প্রতিমা দেবী…বাবা হিরণ্ময়…এরা তার কোনো অনিষ্ট করেন নাই! ইঁহাদের সঙ্গে

এ প্রতারণা করিবার তার প্রয়োজন ছিল না! সাধ করিয়া ইঁহাদের সে প্রতারিত করিতে আসে নাই! কিন্তু এ-কথা কে বিশ্বাস করিবে? কে বুঝিবে, কি ঘটনা-চক্রে…

এ ঘটনা…ইহাও বীণা সৃষ্টি করিয়াছে…এঁরা সৃষ্টি করেন নাই! তার উপর ঐ বৃদ্ধ তারাচরণ রায়…

সন্তোষ মামা…চারুলতা দেবী…সলিলা…তাঁদের প্রতি তারাচরণ রায় যত রূঢ় আচরণ করুন, বীণার উনি কোনো ক্ষতি, কোনো অনিষ্ট করেন নাই! উঁহার সঙ্গে এ ছলনা, এত-বড় প্রতারণা কি বলিয়া বীণা করিতে আসিল? উঁহার বুকের উপর যে-আসনে বীণাকে উনি বসাইয়াছেন… ওঁর এই অগাধ ঐশ্বর্য্য…এ সব উনি বীণাকে দিবেন। এ প্রতারণায় বীণা কত লোককে ঠকাইয়া তাদের কত কি ছিনাইয়া লইতেছে! এ প্রতারণায় বঞ্চিত হইবেন প্রথমে ঐ দাক্ষায়ণী দেবী…দাক্ষায়ণী দেবীর মেয়ে বিরজা…তাঁর ছেলে…

মাথার মধ্যে দপ-দপ করিতে লাগিল। চারি-দিককার কল-কোলাহল, উৎসব-রব সব মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বীণার চেতনাও যেন লুপ্তপ্রায়! সে কি করিতেছে…কি করি[illegible]ব, খেয়াল নাই, হুঁশ নাই!

কিরণের কথায় হুঁশ হইল। কিরণ ব[illegible]—ঘুমে পাতের উপর ঢুলে পড়ছো যে সলিলা! ওঠো…আঁচিয়ে বিছানায় একটু গড়িয়ে নাও না হয়…

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—রাত্রে এইখানেই থাকো মা। এত ঘুম পাচ্ছে—

কিরণ বলিল—দাদু ভাববেন…

নন্দরাণীর মা বলিলেন,—তাঁকে খবর পাঠিয়ে দেবো। তুমিও থাকো কিরণ…সলিলাও থাকবে। খানিকটা ঘুমিয়ে নিলেই ওর এ-ভাব কেটে যাবে'খন…কি বলো মা? শুধু ঘুম পাচ্ছে? না, শরীর অসুস্থ বোধ করছো?

কম্পিত কণ্ঠে বীণা বলিল—বড্ড মাথা ধরেছে…

নন্দরাণী বলিল—তা হলে শুয়ে পড়ো'গে…

নন্দরাণীর মা বলিলেন, আমার ঘরে ভিড় নেই। ও-ঘরে কাকেও যেতে দেবো না। আমার ঘরে আমার বিছানায় তুমি শোবে চলো মা। বাড়ী যদি যেতে হয়, বেশ, একটু ঘুমোও…ঘুমুলে মাথা যদি ছাড়ে, শরীর সুস্থ বোধ করো, তা হলে যেয়ো। আজকের দিনে ফিরতে বেশী রাত হলে দাদু ভাববেন না…কেমন?

২১

পরের দিন সকালে বধূ-বরণ দেখিতে বীণা আর ও-বাড়ীতে গেল না! তার মন ভরিয়া যে-আতঙ্ক···

রাত্রি বলিয়া নিজের মনকে কোন রকমে কাল লুকাইয়া রাখিয়াছিল! তার হীনতা···তার ছলনা কারো চোখে ধরা পড়ে নাই! কিন্তু আজ যদি এ দিনের আলোয়···

কে জানে, কোথা হইতে কারা সব আত্মীয়-জন বা অন্য পাঁচ রকমের লোক আসিয়া হাজির হইবে···মস্ত ভিড়! সে ভিড়ে কারো চোখে তার এ মিথ্যা বেশ, মিথ্যা পরিচয়, তার সব মিথ্যা ধরা পড়িয়া যদি বিপর্য্যয় গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া তোলে? রাত্রে কাল তার চোখে ঘুমের ছায়া আসিয়া দেখা দেয় নাই! যে-দুশ্চিন্তায় রাত্রি কাটিয়াছে···

সকালে দাদু আসিয়া তার পানে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! বলিলেন,—এ কি চেহারা দিদি! অসুখ করেনি তো?

—না···

তারাচরণ রায় একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। বীণার

কপালে হাত রাখিয়া দেখিলেন, বলিলেন,—অনেক রাত্তির অবধি জাগা …এর মধ্যে উঠলে কেন, দিদি? আর একটু ঘুমোও

—না…

উঠিয়া মুখ-হাত ধুইবার পর হইতে কেবলি মনে হইতেছে, এ-ভাবে এখানে থাকা চলে না! থাকা উচিত নয়!…ধরা পড়ার কথা নয়! মানুষকে ঠকাইয়া তার টাকা-পয়সা আদায় করা…তাহাতে যে-অপরাধ, যতখানি পাপ হয়, এ-ভাবে প্রতারণা করিয়া স্নেহ-আদর আদায় করাতেও তেমনি অপরাধ, ঠিক ততখানি পাপ…

তাই সে স্থির করিয়াছে, তারাচরণকে সব কথা লিখিয়া এ অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিবে। তার পর চলিয়া যাইবে। কাশীতে নয়! কোথায় যাইবে জানে না, তবে এখানে আর থাকিবে না…

না…না…থাকিবে না।

চিঠিতে ভালো করিয়া বুঝাইয়া লিখিবে যে, ধন-ঐশ্বর্য্যের লোভে সলিলা সাজিয়া সে এখানে আসে নাই। সে আসিয়াছিল স্নেহের কাঙাল হইয়া। সেই সঙ্গে এ-ইচ্ছাও মনে ছিল…তারাচরণ রায়ের যে পরিচয় সন্তোষবাবুর কাছে ও চারুলতা দেবীর কাছে একদিন শুনিয়াছে, শুনিয়া অবধি তার ইচ্ছা হইত, তাঁর স্নেহাতুর হৃদয়ের শূন্যতা সে যদি একটুও পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে…

তখন ভাবে নাই, স্নেহের এ পিপাসা মিটাইতে গেলে কত দিক দিয়া কতখানি বিরোধ, কতখানি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়…আর পাঁচ জনকে কতখানি বঞ্চনায় নিক্ষেপ করিতে হয়! তার উপর স্নেহের ধারা…সে

ধারা রক্ত-মাংসের সম্পর্ক-খাত ধরিয়া যেমন সাবলীল সহজ ভাবে প্রবাহিত হয়, এমন ভাবে নিঃসম্পর্কীয়তার খাত ধরিয়া বহিতে গেলে কত বিরোধ, কত দ্বন্দ্ব, কত দিকে কত কোলাহলের যে সৃষ্টি হয়!

সে তা জানিত না...জানিলে কখনো এমন করিয়া এ-ইচ্ছা লইয়া...

ও-বাড়ীতে বধূ লইয়া বর আসিতেছে...লোক আসিয়া বায়-বার তাগিদ দিয়া গিয়াছে—সলিলা দিদিমণি এসো!

বীণা জবাব দিয়াছে, শরীর অসুস্থ বোধ হইতেছে...

এ-কথা না শুনিয়া কিরণ নিজে আসিল। ডাকিল,—সলিলা...

খোলা জানালার পাশে বসিয়া বীণা আকাশের পানে চাহিয়াছিল... আকাশের গায়ে পেঁজা-তুলার মতো অসংখ্য ছোট মেঘ। হাল্কা স্বচ্ছ মেঘের রাশি...রৌদ্র-কিরণে মনে হইতেছিল যেন নানা রঙের প্রলেপ! বাতাসের ভরে সেগুলা ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে।

মেঘের পানে চাহিয়া বীণা ভাবিতেছিল, সে যদি হঠাৎ আজ ওমনি মেঘ হইয়া এখানকার লোক-জন, বাড়ী-ঘর ছাড়িয়া আকাশে গিয়া উঠিতে পারিত...

সে চলিয়া গেলে এখানে কারো বুকের কোনোখানে একটুও দাগ পড়ে কি না, আকাশে বসিয়া দেখিত!...

তার উপর এই যে মায়া...

এ-মায়া মনে জমিয়া কতখানি প্রসারিত হইয়াছে! তারাচরণ রায়কে সত্যই মনে হয়; যেন কত আপন-জন...বুঝি, এত আপন পৃথিবীতে আর কেহ নাই! বীণাকে তিনি এত ভালোবাসেন...

মনে হইতেছিল, সে সলিলা নয়। সে বীণা···এ-কথা জানিতে পারিলে উনি তখন কি করবেন? বকিয়া মারিয়া বীণাকে নির্ব্বাসন দিবেন? না, সুগভীর স্নেহের একটি কণা···

কিরণ আসিয়া বলিল,—বেশ লোক তুমি সলিলা! বৌ ও-দিকে এলো বলে···বাবা কখন বেরিয়ে গেছেন বৌ আনতে! আর তুমি এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো!···নাও, তাড়াতাড়ি সেজে নাও···

দু'চোখে করুণ মিনতি···বীণা বলিল,—আমার বড্ড মাথা ধরেছে ভাই।

কিরণ বলিল,—সত্যি? কিন্তু···

বীণা বলিল,—একটু সুস্থ হলেই আমি যাবো।

কিরণ কোনো জবাব দিল না···নিরুপায় দৃষ্টিতে বীণার পানে চাহিয়া রহিল।

দাক্ষায়ণী দেবী আসিলেন, বলিলেন,—এ কি সলিলা! এখনও বসে আছো!···বিরজা, বৌমা ওরা কখন তৈরী হয়েছে!

কিরণ বলিল—সলিলার শরীরটা ভালো নয়, পিশিমা!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—ও···তা হলে কি করে ও যাবে? চলো মা কিরণ, আর দেরী করে না। ও-দিকে বৌ আসবার সময় হয়েছে···

নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ বীণার পানে চাহিল, কহিল—বৌ এলে একটু পরে আবার আমি আসবো। তুমি একটা ওষুধ-বিষুধ খাও বরং···বুঝলে সলিলা। আমি দাদুকে বলে যাচ্ছি।—এ-সময়ে অসুখ করলে চলবে না, ভাই। তুমি অসুখ করে এ-বাড়ীতে পড়ে থাকলে বিয়ের আদ্ধেক আমোদ মাটি হয়ে যাবে।

কিরণ চলিয়া গেল। দাক্ষায়ণী দেবীও সেই সঙ্গে·

বীণা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল···তার পর কি মনে হইল, টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া মোটা একখানা রাইটিং-প্যাড বাহির করিয়া লিখিতে বসিল···নিজের প্রতারণার কাহিনী। লিখিল—

শ্রীচরণ-কমলেষু,

দাদু···

কিন্তু কি লিখিবে? কোনখান হইতে এ-কাহিনী সুরু করিবে? মা-অতসীর দুর্ভাগ্যের কাহিনী? কিন্তু মা···মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী মেয়ে হইয়া লিখিবে? ছি!

দু'চোখ জলে ভরিয়া আসিল; এবং চোখের ঘন-বাষ্পের আবরণে বাহিরের পৃথিবী ধুইয়া ভাসিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

ও-বাড়ীর ফুলশয্যার রাত্রে একা এ-বাড়ীতে পড়িয়া থাকা কিন্তু সম্ভব হইল না। কিরণ আসিয়া নিজের হাতে সাজাইয়া-গুছাইয়া বীণাকে লইয়া গেল।

বীণাকে যাইতে হইল। সে গেল যেন বিচিত্র সাজ-পোষাক-পরা কাঁচের পুতুল! প্রাণ যেন বুকের কোটর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

সেখানকার আনন্দ-উৎসবে নিজেকে সে সকলের আড়ালে মৌনতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিল···

নন্দরাণী বলিল—কি হয়েছে ভাই?···এমন মলিন মুখ···

মুখে ম্লান হাসি···বীণা বলিল—শরীরটা ভালো নেই।

কিরণ বলিল,—সত্যি সলিলা···খুব কষ্ট হচ্ছে?

বীণা ছোট্ট জবাব দিল। বলিল,—না···

গান-বাজনা···হাসি-গল্প···কত লোক-জন...কত আসা-যাওয়া...যেন আলো-আঁধারের চমক্ বহিয়া চলিয়াছে!

বীণা যেন ও-সবের বাহিরে আর-এক জগতে বসিয়া লহরের লীলা-রহস্য দেখিতেছে! ও-জগতের সহিত তার যেন কোনো যোগ নাই! সে যেন ও-জগৎ-ছাড়া জীব! তার জগতে আছে সে একা···তার জগতে তার আশে-পাশে কেহ নাই···কিছু নাই!

পরের দিন এক কাণ্ড ঘটিল।

বেলা তখন বারোটা...

কিরণ আসিয়া তারাচরণ রায়কে ডাকিল,—দাদু···

তারাচরণ রায় খাইতে বসিয়াছেন···সামনে বসিয়া বীণা। দাক্ষায়ণী দেবীও সে ঘরে বসিয়াছেন।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কি দিদি? সলিলাকে নিতে এসেছো?

কিরণ বলিল,—না। ঘটকালী করতে এসেছি।

—তার মানে?

—সলিলার সম্বন্ধ এনেছি। বিয়ে দিলে কি ঘটকালী পাবো, বলো দাদু···

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাকে আমার অদেয় কি আছে···বলো? তোমার গলায় মালা দেবো···তাতে হবে?

হাসির উচ্ছ্বাসে মুখ ভরিয়া কিরণ বলিল,—নিশ্চয়। তবে সে মালা

হবে মুক্তোর মালা ! আর তার এক-একটী মুক্তো হবে রক-পাখীর ডিমের মতো বড় !

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তাই হবে দিদি···

কিরণ বলিল,—নতুন বৌদি এসেছে। এই বৌদির পিশ্‌তুতো ভাই ...বুঝলে দাদু ! ছেলে বিলেত থেকে এ্যাকাউন্‌টান্সি পাশ করে এসেছে। এ্যাসিষ্টাণ্ট এ্যাকাউন্‌টাণ্ট জেনারেলের চাকরি পেয়েছে। বৌদির পিশিমা সে-দিন সলিলাকে দেখেছেন কি না···দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। কাল রাত্রে মার সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল। আমি শুনে ফেলেছি। ওঁরা লোক পাঠাবেন কাল-পরশুর মধ্যে। আমি তাই আগে থেকে প্রজাপতির দূত হয়ে এসেছি। এ ঘটকালীর ক্লেম্ কিন্তু আমার !

তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিশ্চয়। তুমি আগে তোমার ক্লেম্ ফাইল করে গেলে যখন...

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন···দাঁড়া। বিয়ে বললেই কি বিয়ে হয় ! কোষ্ঠী আছে···রাশিচক্র আছে। সে সব মিলুক !

উচ্ছ্বসিত ভাষায় কিরণ বলিল,—সে সব মিলবে, পিশিমা...এত ভালো ছেলে ! সলিলার সঙ্গে সব মিলবে, নিশ্চয় ! তার পর কিরণ চাহিল বীণার পানে ; বলিল,—তোমার কাছ থেকে কি আদায় করি, তখন দেখো। জানলে দাদু, বর দেখতে যেন রাজপুত্তুর। বিলেত থেকে এলেও বাঙালী আছে···ট্যাঁশ্ হয়নি ! আর বরের কি নাম, জানো ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কি নাম ?

কিরণ বলিল,—স্বর্ণদ্যুতি রায়···

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—ও কি নাম রে, বাবা! কবিরাজী ওষুধেরই এমন নাম হয়, শুনেছি! কি নাম বললি?

কিরণ বলিল,—স্বর্ণদ্যুতি রায়…

তার পর কিরণ বীণার পানে চাহিল, বলিল,—নামটা বেশ নূতন-রকমের, না দাদু? আর খাশা মিল হবে...সলিলা আর স্বর্ণদ্যুতি! শুনছো সলিলা, এ নাম জপ করো আজ থেকে…বুঝলে!

বীণার মুখে হাসি নাই, কথা নাই! বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল!

২২

বিধাতার হাতে বোধ হয় তেমন কাজ ছিল না, তাই মৃদু হাস্যে তিনি বীণার ভাগ্য-চক্র লইয়া তাহাতে দম্ দিয়া সেটিকে চালাইতে উদ্যত হইলেন!

ও-বাড়ীর বিবাহের গোলমাল থামিবামাত্র কিরণ আর নন্দরাণী দু'জনে মাতিয়া উঠিল—স্বর্ণদ্যুতির সঙ্গে বীণাকে বিবাহ-সূত্রে বাঁধিয়া দিবার উদ্দেশ্যে। দু'পক্ষে পাত্র-পাত্রী দেখা চুকিল। কোষ্ঠীর যেমন বালাই ছিল না, তেমনি কোনো পক্ষেই মতান্তর ঘটিবার কারণ ছিল না। বর-পক্ষ পয়সার কথা মুখে উচ্চারণ করিল না; বোঝে, তারাচরণ রায়ের বিপুল সম্পত্তি এই পৌত্রীর সহিত তাদের কুলেই আসিয়া পৌঁছিবে! একমাত্র পৌত্রী—আর কোনো ভাগীদার নাই! তারাচরণ রায় দেখিলেন, ছেলেটি যেমন কৃতী; তেমনি নরম আর সহজ আচার ব্যবহার!

সে-দিন খাইতে বসিয়া দাক্ষায়ণী দেবীর কাছে তারাচরণ কথাটা পাড়িলেন।

দাক্ষায়ণী কাছে বসিয়াছিলেন,—বীণাও ছিল সামনে।

তারাচরণ বলিলেন—এখনি বিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু ছেলেটি ভালো···অত করে ধরেছে···

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—বিয়ে তো দিতেই হবে। আজ দিলে, দেবে, কাল দিলেও দেবে। ছেলে নয় যে ঘরে রাখবে! তা ছাড়া ডাগর মেয়ে···এর চেয়ে বুড়ো বয়সে বিয়ে দিলে লোকে বলবে কি!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—হুঁ!···কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, এমন পাত্র যদি পাই, যে এইখানেই আমাদের সঙ্গে থাকবে···

দাক্ষায়ণী দেবী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন—না, না। ঘর-জামাই! মাগো! সব সময় সরকার-গোমস্তার মতো চোর হয়ে থাকবে! ভেতুড়ে হয়ে মানুষ থাকতে চায়?···লোকের কাছে পরিচয় দেবে কি? এই ভালো···বিয়ে করে বৌ নিয়ে চলে গেল···মাঝে মাঝে আসবে-যাবে···

বুকের যে-জায়গাটা বীণা ভরিয়া তুলিয়াছে, সে-জায়গাটা আবার তেমনি খালি হইয়া যাইবে, এ চিন্তা তারাচরণ রায়ের মনে কাঁটার মতো বিঁধিতেছিল! তিনি জানেন, পৌত্রী···ছেলে নয়, মেয়ে! পরের জন্যই মেয়েকে লোক মানুষ করে! তাই বীণার বিবাহের চিন্তায় তিনি বুকে ব্যথা বোধ করিতেছেন!···পাঁচ জনের কাছে পাছে এ দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে, এজন্য ঘুণাক্ষরে মনের এ-কথা কারো কাছে কোনো দিন প্রকাশ করেন নাই,—বিবাহের কথায় হাঁ-হুঁ বলিয়া সায় দিয়াছেন! ভাবিয়াছিলেন, কহিতে কহিতে এ-কথা যদি এক দিন সহসা মন্থর হইয়া পড়ে, তিনি যেন মুক্তি পান! কিন্তু তাহা ঘটিল না!

তারাচরণ রায় বীণার পানে চাহিলেন। একান্ত সঙ্কোচভরে বীণা

বাসয়া আছে…মুখে কথা নাই, চোখে হাসির আভাস নাই! যেন, কতখানি অপরাধ করিয়াছে, এমন ভাব!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—পারবে দিদি আমায় ছেড়ে বরের কাছে থাকতে?

এ-কথায় বীণার সঙ্কোচ আরো বাড়িল। সে মাথা আরো নীচু করিল।

দাক্ষায়ণী দেবীর হাড় জ্বলিয়া গেল। আদিখ্যেতা! দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—তোমায় ক'দিন বা দেখছে ক'দিন বা পেয়েছে যে, তোমার কাছ থেকে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে থাকলে পৃথিবী অন্ধকার দেখবে?…সে বরং বলতে পারো বিরজাকে! সে-বারে সেই দিনাজপুর থেকে সম্বন্ধ এসেছিল না? বিরজা গুম্ হয়ে রইলো…নাওয়া নেই, খাওয়া নেই…মেয়ে কি রকম যেন হয়ে গেল! খুব বকলুম…তখন ফোঁপাতে, ফোঁপাতে বললে, এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও আমি যাবো না, যেতে পারবো না…দাদুকে কে দেখবে? তখন তো ওই তোমার এটা-ওটা কাজ করতো—ফাই ফরমাশ্ খাটতো। চিরদিন তোমার কোলেই ও বড় হয়েছে! কথায় বলে, অপ্লে না নোয়ায় বাঁশ,—বাঁশ করে টাঁশ-টাঁশ!…কচি বয়স থেকে সলিলা যদি তোমার কাছে থাকতো, তা হলে বটে, সলিলা তোমাকে ছেড়ে শ্বশুর-ঘর করতে যেতে কাঁদতো!…কি বলো সলিলা? আমার বাপু স্পষ্ট কথা…

স্পষ্ট হইলেও এ-কথা তারাচরণ রায়ের ভালো লাগিল না! তিনি বলিলেন,—বিরজার বিয়ের সম্বন্ধে তুমি চুপচাপ আছো বলেই আমি কোনো কথা কই না।…পাছে ভাবো, তাড়াতে চাই!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—কিন্তু তোমাকেই তো বিয়ে দিতে হবে। হাজার হোক, সলিলার চেয়ে বিরজা বয়সে বড়। বিরজার বিয়ের আগে সলিলার বিয়ে দিচ্ছ তুমি, এতে পাঁচ জনে এরি মধ্যে পাঁচটা কথা বলতে সুরু করেছে! আমি তাদের বলি, তোরা চুপ কর্ বাপু... বিরজা আমার মেয়ে...আমি আশ্রিতা বৈ নই! তারা বলে, এ-ছেলেটির সঙ্গে কর্ত্তাবাবু তো বিরজার বিয়ের কথা বলতে পারতেন! আমি তাদের বলি, বিরজাকে ওদের পছন্দ' হবে কেন? জানে, সলিলার সঙ্গে বিয়ে দিলে ছেলে একদিন এখানকার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য পাবে...

কথাটা বাজের মতো তারাচরণের মনে বাজিল...তাই কি?

মনকে তারাচরণ রায় চকিতে শাসন করিলেন। যদি তাই হয়... সত্য-কথা! এ সত্যকে তিনি চাপা দিয়া রাখিতে পারেন না! কিন্তু... এ কথায় দাক্ষায়ণীর মনে প্রচ্ছন্ন আক্রোশের যে হুল্...

তারাচরণ বলিলেন—বেশ, ঘটকদের ডেকে বলে দি, বিরজার জন্য পাত্র আনুক। এঁদেরো বলি, বিরজা বড়...তার বিয়ে হলে তবে সলিলার বিয়ে দেবো এঁরা দু'দিন সবুর করুন্।

বীণাকে চট্ করিয়া পর-গৃহে বিদায় করিতে হইবে না, এ চিন্তায় তারাচরণ যেন একটু আরাম বোধ করিলেন!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন—বিরজার বিয়ের হাঙ্গাম তো কিছু নাই। একটা ছেলে ধরে এনে তার হাতে ধরে দেওয়া...

তারাচরণ রায় বলিলেন—এ কথার মানে? আমার কাছে আছে... আমার আপন-জন...তোমাদের ভার যখন নিয়েছি, তখন দেখতে পারো কি আমি করি...

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন···আমি তা জানি। ঐ মেয়ের জন্যই আমার যা-কিছু ভাবনা। ওর বিয়ে হয়ে গেলে আমার আর ভাবনার কিছু থাকে না!...তোমারো বয়স হচ্ছে...ভগবান না করুন, যে দুঃখ-কষ্ট মনে-মনে ভোগ করছো এত বছর ধরে', তোমার যদি কিছু হয়... মেয়েটার ইহ-জন্ম নষ্ট হয়ে যাবে! তাই আমার বলা!

তারাচরণ রায় বলিলেন—হুঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দেছো দাক্ষে! মেয়ে-দুটোর বিয়ে দিলে আমারো ইহ-জন্মের কাজ শেষ হয়। ভালো কথা, তোমার শশিকান্তকে বলো, হেসেখেলে বেড়ালে আর চলবে না। তার চাকরির ব্যবস্থা আমি করছি। শশীকে বলো, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে। একটা চাকরি আছে। ভালো চাকরি। মাসে এখন একশো টাকা করে পাবে। তার পর ভালো কাজ করতে পারলে উন্নতির আশা আছে!...এই বেলা নিজের-নিজের গুছিয়ে নিক্। আমিও সব গোছগাছ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চাই, বুঝলে?

দাক্ষায়ণী দেবী এ-কথায় কোনো উত্তর দিলেন না,—একবার শুধু বীণার পানে চাহিলেন। বীণা যেন মাটী হইয়া মাটীতে মিশিয়া যাইতেছে!

তারাচরণ রায় বলিলেন—একটা নাৎনী···সত্যি, তার বিয়ে দিয়ে যে কটা দিন থাকি, ওদের ভালো!...আমি তো চিরদিন বাঁচবো ব'লে এখানে আসিনি...

কথার শেষে তারাচরণ রায় মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর ক্ষীরের বাটীতে ভাত ফেলিলেন।

বৈকালের দিকে বীণা নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল সামনে খড়খড়ি খোলা। খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরে অনেকখানি আকাশ দেখা যাইতেছে, বীণা সেই আকাশের পানে চাহিয়া আছে। তার মনের উপর যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলিয়াছে। মনে তেমনি কোলাহল, তেমনি অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা!

কিরণ আসিল, আসিয়া ডাকিল—সলিলা···

বীণা ফিরিয়া চাহিল।

কিরণ বলিল,—একলাটি ঘরের কোণে বসে আছো যে···

মুখে ম্লান হাসি···বীণা বলিল,—এমনি···

কিরণ বলিল,—আমি এসেছিলুম তোমার হু'চারটে সেমিজ-ব্লাউশ নিতে। বৌদির পিশিমা লোক পাঠিয়েছেন,—বৌমার হু'-তিনটে সেমিজ-ব্লাউশ চাই বলে। তৈরী করতে দেবেন কি না!

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল,—দাহুর কাছে গিয়েছিলুম। দাহু রাজ্যের দলিল-পত্র খুলে বসেছেন। বললেন, সলিলাকে বলে চেয়ে নিয়ে যাও...

বীণার যেন চেতনা নাই! কথাগুলা সে শুনিল...কিরণ যেন তাকে এ-কথা বলিতেছে না, আর-কাকে বলিতেছে!

কিরণ বিস্ময় বোধ করিল, বলিল,—বাঃ! চুপ করে বসে রইলে যে! ওঠো···উঠে আলমারি খুলে বার করে দাও···

এ-কথায় বীণা যন্ত্র-চালিতের মতো উঠিল···উঠিয়া যন্ত্র-চালিতের মতোই চাবি দিয়া আলমারি খুলিল; খুলিয়া কিরণের পানে চাহিল···

কিরণ বলিল,—কি! পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে!

এবার বীণা কথা কহিল,—কোনো মতে বলিল,—তুমি নাও ভাই···

কিরণ বলিল,—বেশ···

নানা প্যাটার্ণের ব্লাউশ-সেমিজ নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া কিরণ কটা বাছিল; বাছিয়া বলিল,—মাপ ঠিক আছে তো?

মাথা নাড়িয়া বীণা জানাইল, হাঁ।

কিরণ বলিল,—দেরাজ বন্ধ করো

বীণা আলমারি বন্ধ করিল।

কিরণ বীণার পানে চাহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল; তার পর—ডাকিল,—সলিলা···

বীণা চাহিল কিরণের পানে। চোখের দৃষ্টি যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতো!

একটা কথা কিরণের মনে বিদ্যুতের শিখার মতো চকিতে জাগিয়া মিলাইয়া গেল।

কিরণ বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? সত্যি জবাব দেবে?

বীণা শুধু নিশ্বাস ফেলিল।

কিরণ বলিল,—এ বিয়েয় তোমার অমত আছে?

বীণার দেহে-মনে কিরণ যেন কাঁটার চাবুক মারিয়াছে! বেদনায় বীণার দেহ-মন নুইয়া বাঁকিয়া দুমড়াইয়া যেন কেমন হইয়া গেল! তার মুখে কথা ফুটিল না।

কিরণ লক্ষ্য করিল···বীণার মুখ কাগজের মত সাদা!

কেন?

ছোট এই 'কেন' প্রশ্নটুকুকে ঘিরিয়া কিরণের মনে অসংখ্য ঢেউ···

এত বয়স পর্য্যন্ত সলিলা কাশীতে পরাশ্রয়ে কোথায় পড়িয়াছিল··· সেখানে এমন কোনো বন্ধু?···হয়তো দরদে-প্রীতিতে সলিলার মনে কুসুমরাশি ফুটাইয়া তুলিতেছিল···

ছ'চোখের গভীর দৃষ্টিতে কিরণ অনেকক্ষণ বীণার পানে চাহিয়া রহিল। সে-দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া বীণা চোখ নামাইল।

ব্লাউশ-সেমিজগুলা বিছানার উপর রাখিয়া কিরণ বীণার হাত ধরিল, ডাকিল,—সলিলা···

বীণা আবার চাহিল কিরণের পানে···

কিরণ বলিল,—সত্যি বলো···আমাকে তোমার বন্ধু বলে জেনো সলিলা। এমন বন্ধু,···যে-বন্ধু তোমার জন্য সকলকে অগ্রাহ্য করতে পারে···

বীণার বুকে মৃদু কাঁপন!

কিরণ বলিল,—এখানে বিয়ে করতে যদি তোমার এতটুকু আপত্তি থাকে, বলো···কেউ কারণ জানবে না। বিয়ে আমি বন্ধ করে দেবো।

বীণা এ-কথার জবাব দিল না। কি জবাব দিবে? তার মনের মধ্যে যা হইতেছিল···কথায় তা কাহাকেও বুঝানো যায় না!

কিরণ বলিল—আর-কাকেও পছন্দ করেছো বিয়ের জন্য?

বীণার সমস্ত মন ভরিয়া একটা আর্ত্ত ক্রন্দন··

বীণা বলিল,—না, না তা নয়···

—তবে?

বীণা ভাবিল, মনের এ-ভার সে আর বহিতে পারে না। চোরের মতো এমন করিয়া পরের সৌভাগ্য, পরের সম্পদ চুরি করিয়া···ওঃ!

সে একেবারে হুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তার দু'চোখের পিছনে জল!

সে-দৃশ্যে কিরণ অভিভূত হইল, বলিল—সন্তোষ কাকার জন্য মন কেমন করছে?···মার জন্য···?

বীণার চোখে জল-ধারা তখন উচ্ছ্বসিত হইয়াছে!

বীণাকে কিরণ জড়াইয়া ধরিল। কাহারো মুখে কথা নাই।

বীণা যেন অকূলে কূল পাইয়াছে! কিরণও দরদে গলিয়া বীণার দুঃখ যতখানি পারে, নিজের বুকে তাহা যেন অনুভব করিতেছে!

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ কাটিল···

হঠাৎ বীণার মনে হইল, এ সে কি করিতেছে? তার চেয়ে কিরণকে সব কথা প্রকাশ করিয়া···

বলিলে···সকলের ঘৃণা লাঞ্ছনা বহিয়া কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, সত্য! কিন্তু তারাচরণ রায় আজ যে-কথা বলিয়াছেন, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বীণাকে ···এবং এই সম্পত্তির জন্যই রাজপুত্র-মন্ত্রিপুত্র আসিয়া আজ তার কণ্ঠে বরমাল্য দিতে উদ্যত হইয়াছে! বীণা যদি এ-পরিচয়ে এ-বাড়ীতে না আসিত, তাহা হইলে তারাচরণ রায়ের সম্পত্তি পাইত ঐ দাক্ষায়ণী দেবীর ছেলেমেয়ে! এবং তাহা হইলে হয়তো এ-রাজপুত্র বিরজার কণ্ঠ-ভূষার জন্য বরমাল্য লইয়া উদয় হইত!

বীণার মনে এই যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, এ দ্বন্দ্ব এক নিমেষ বিরাম জানে না! সব কথা সে খুলিয়া বলিতে চায়··· কিন্তু তার কথা শুনিয়া যদি সকলে মনে করেন, বিষয়-সম্পত্তি, বিলাস-ঐশ্বর্য্যের লোভে কোথাকার এক ভিখারিণীর কন্যা বীণা···বীণা ঐশ্বর্য্য চায় না, সম্পদ চায় না···চায়

শুধু নিরাপদ আশ্রয়! কি করিয়া কি করিয়া সে তাহা বুঝাইবে? এমন যদি সম্ভব হয়…এ-বিবাহে স্বামীর উপর নিশ্চিন্ত-নির্ভর রাখিতে পারে…এমন নির্ভর যে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি বুঝিবেন, বীণা কেন এ কাজ করিয়াছে…

বীণার দু'চোখে জল…

কিরণ বলিল,—কেঁদো না সলিলা। তোমার দুঃখ আমি বুঝি, কিন্তু দাদুর কথা ভাবো…ওঁর দুঃখ তোমার-আমার দুঃখের চেয়ে কত বেশী!

সজল চোখে বীণা কিরণের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল,—অমন করে চেয়ে আছো যে! একা থাকলে মন খুব খারাপ হবে, জানি। আমার সঙ্গে বরং আমাদের ওখানে চলো… বুঝলে! আমার এ-কথায় 'না' বলো না…লক্ষ্মীটি।

বীণা কোনো জবাব দিল না।

কিরণ বলিল—যাবে?

এত আদর, এমন ভালোবাসা…না বলা চলে না! বীণা না বলিতে পারিল না, বলিল,—যাবো।

—এসো…

বীণাকে লইয়া কিরণ ফিরিল।

ফিরিবার সময় একবার তারাচরণের ঘরে উঁকি দিল। বলিল— সলিলাকে নিয়ে যাচ্ছি দাদু…

তারাচরণ বলিলেন—কোথায়?

—আমাদের ওখানে।

তারাচরণ বলিলেন—তাই ভালো। আমি ভাবলুম, বুঝি, তোমার সেই স্বর্ণদ্যুতির বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছো!

হাসিয়া কিরণ বলিল—বড্ড হিংসে হচ্ছে তার ওপর—না? সলিলাকে সে এসে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে চায়!

তারাচরণ বলিল—হচ্ছে বৈ কি! দু'দিন আমার কাছে থাকবে, তা কারো সইছে না! না তোমাদের, না তোমাদের সেই মিষ্টার স্বর্ণদ্যুতি সাহেবের!

কিরণ বলিল—সলিলারো সইছে না, না কি?

এ-প্রশ্নে তারাচরণ রায় চাহিলেন বীণার পানে। বীণার মুখ মলিন …আনন্দের একটু কণাও ও-মুখে নাই! দেখিয়া তারাচরণ কোনো কথা বলিলেন না; চুপ করিয়া রহিলেন।

২৩

ঘটকের অসাধ্য কাজ নাই! তারা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া হৈ-হৈ শব্দে পাঁচ-সাতটি পাত্র আনিয়া হাজির করিল। তাদের মধ্য হইতে তারাচরণ রায় বাছিয়া ঠিক করিলেন সদ্য ডাক্তারী-পাশ-করা অরবিন্দকে। অরবিন্দ শুধু পাশই করিয়াছে! মুরুব্বি নাই যে চাকরি জোগাড় করিয়া দিবে! পয়সা নাই যে ডিসপেন্সারি খুলিয়া ব্যবসা সুরু করিবে।

তারাচরণ বলিলেন,—নগদ পাঁচ হাজার টাকা দেবো। ডিস্পেন্সারি খুলে বসো, বাপু। তার পর বিরজার ভাগ্য আর তোমার হাতযশ!

অরবিন্দর মা নাই, বাপ নাই, এক দাদা আছে। সে দাদা বর্মায় চাকরি করে। কাজেই বিবাহের জন্য তার আয়োজন করিবার কিছু ছিল না। শুধু পাঁজি দেখিয়া একটা দিন স্থির করিলেই হয়···

ভিতর বাড়ীতে আসিয়া তারাচরণ ডাকিলেন,—দাক্ষে···

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—কেন?

তারাচরণ বলিলেন,—এই ছেলেটিকে পছন্দ করেছি। তৈরী ছেলে। এর পিছনে কাট-খড় খরচ করতে হবে না!

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—তুমি যা ভালো মনে করবে, তাতে আমি কোনো কথা বলতে পারি? বিশেষ কে আমার আছে যে দেখবে!

কথার মধ্যে সেই প্রচ্ছন্ন হুল! তারাচরণ রায়ের মনে এ-হুল দাক্ষায়ণী দেবী অনেক ফুটাইয়াছেন; কাজেই এ-হুল তাঁকে আর বিঁধে না! তিনি বলিলেন,—আবার কি চাও? ডাক্তার-জামাই! এই যে তোমার শশিকান্ত—ডাক্তার হবার সামর্থ্য তার আছে? হুঁঃ, না ডাক্তার, না মোক্তার! শশীর জন্য কোন্ ব্যবস্থাটা করা হয়নি? তোমার জামাইকে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছি তার উপর গহনা কোন্ হাজার-তুত্তিনের না দেবো!…আবার কি চাও? বাজারে এ ছেলের দাম আছে—দশ-পনেরো হাজার হাঁকলে অনায়াসে তা পায়।…বিয়ের একটা দিন ঠিক করিয়ে ফ্যালো ভটচায্যি মশাইকে ডাকিয়ে এনে। দিন স্থির হলে আমায় জানিয়ো, ছেলেটিকে আমি খপর পাঠাবো। সে তৈরী হয়ে বসে আছে। যে-দিন বলবো, এসে বিয়ে করবে।

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় দাঁড়াইলেন না, বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দাক্ষায়ণী দেবী গুম্ হইয়া রহিলেন। তাঁর মুখে যেন বৈশাখী মেঘের ভীষণ ছায়া!

শশিকান্ত আসিয়া ডাকিল,—মা…

দাক্ষায়ণী কথা কহিলেন না।

শশিকান্ত বলিল—চাকরিতে তো জয়েন করেছি, এ-দিকে বিপদ…

বিপদের কথায় দাক্ষায়ণী মুখ তুলিয়া ছেলের পানে চাহিলেন।

শশিকান্ত বলিল,—আমার সম্বন্ধীর বিয়ে দিন-আষ্টেক পরে। ও তো যাবে বলে ক্ষেপেছে।

দাক্ষায়ণী দেবী বলিলেন,—কে? বৌমা? তা বেশ, তোমার দাদুকে গিয়ে বলো। এ-দিকে বিরজার বিয়ের দিনও তিনি ঠিক করেছেন…

শশিকান্ত বলিল,—সে তো এক রাত্তিরের ব্যাপার। ছেলের কেউ কোথোও নেই…নিঃশব্দে আসবে, এসে বিয়ে করে বৌ নিয়ে চলে যাবে। ব্যস্!

দাক্ষায়ণী দেবীর মনের মধ্যে আগুনের সাগর ফুঁশিতেছিল!

তিনি বলিলেন,—তোমার যা-খুশী করোগে বাপু…আমায় মিছে বলা! আমি যদি মায়ের মতো মা হতে পারতুম, টাকা পয়সা দিতে পারতুম… তা হলে বটে অন্য কথা ছিল! আমি হলুম পর-ঘরী…পরের হাত-তোলায় বাস করছি!

শশিকান্ত দেখিল, মায়ের যে মেজাজ…বলিল,—তা হলে আমি তাদের লিখে দিতে বলি, কেউ এসে যেন নিয়ে যায়…

শশিকান্ত চলিয়া যাইতেছিল দাক্ষায়ণী বলিলেন,—এখানে ওঁর ননদের বিয়ে…তাতে থাকা উনি দরকার মনে করছেন না বুঝি?

শশিকান্ত বলিল,—সেখানে ঘটার বিয়ে…ওর ঐ একটি ভাই!

দাক্ষায়ণীর মনে হইল, পৃথিবীতে কি একটা যেন হইয়া গিয়াছে… অকস্মাৎ! না হইলে তাঁকে এমন নিঃসহায় হইতে হইবে কেন? ছেলে-মেয়ে…যাদের জন্য তিনি জ্বলিয়া মরিতেছেন, দুনিয়ার অবিচার দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছেন…সে ছেলেমেয়ে তাঁর মুখ চাহিতে জানে না!

বিশ্ব-সংসারের উপর রাগ হইল। স্বর্গগত মা বাপ, স্বর্গগত স্বামী…

শ্বশুর-বাড়ী নিঃস্বতা···এমন ভাগ্যও তিনি করিয়াছিলেন! বিধবা আরো পাঁচজনে হয়···কিন্তু তাঁর মতো এতখানি দুর্গতি তাদের মধ্যে কে ভোগ করিতেছে! হতভাগা স্বামী···স্বামীটা যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত! বাঁচিয়া না থাকুক্, পয়সা-কড়ি রাখিয়া যাইত যদি···

ও-দিকে আদরের পৌত্রীর বিবাহের জন্য কি সমারোহে আয়োজন চলিয়াছে! আর বিরজার বেলায় কোনো মতে নমো-নমো করিয়া কাজ সারা! বিরজা সত্যই কিছু ভাসিয়া আসে নাই!···ঐ সলিলা···কোথায় পাঁদাড়ে পড়িয়াছিল···তার সর্ব্বনাশ করিতে ধেড়ে-বয়সে এখানে আসিল টশ্ কুড়াইতে!···তারাচরণ রায়ের বা কি আক্কেল!···পারিতেন না উনি এই দামী ডাক্তার পাত্রের হাতে আদরের পৌত্রীকে সমর্পণ করিতে! নগদ পাঁচ হাজার টাকা! কেন, এই দামী ডাক্তার-পাত্রের হাতে সলিলাকে দিতে কি হইয়াছিল? তোমার বিষয়-সম্পত্তির মালিক হইয়া একটা ছোট্ ডিস্পেন্সারি কেন, মস্ত-গোটা হাসপাতাল বানাইতে পারিত যে!···তা নয়···

কিন্তু এ-তর্ক কার সঙ্গে করিবেন? এ পক্ষপাতিতার কথা কাকে বুঝাইয়া বলিবেন?

রাগে তিনি জ্বলিতে লাগিলেন। সে রাগ কথায় ফুটিল না। তার কারণ, কথায় ফুটিলে এমন চীৎকার তুলিবেন যে, তার ফলে হয়তো বা তারাচরণ রায় এ-বিবাহ ছাঁটিয়া নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার হইয়া উঠিবেন! যদি বা সাত-দেবতার দ্বার ধরিয়া এ-মতি হইয়াছে...

এখন কি আর সে তারাচরণ আছেন...আদরের নাৎনী আসিয়াছে! তাকে লইয়া মাতন চলিয়াছে! ভুলিয়া গিয়াছেন, দুঃখে-দুর্দ্দিনে

এত-বড় সংসারটাকে মাথায় করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এই দাক্ষায়ণী বাম্‌নী !

মা'কে নিরুত্তর দেখিয়া শশিকান্ত চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার ঠিক আগে তারাচরণ রায় আসিয়া বীণার সঙ্গে দেখা করিলেন।

বীণা চুপচাপ বসিয়াছিল। তারাচরণ রায় বলিলেন,—একটা গান শুনতে এলুম দিদি···গাইবে ?

তারাচরণের কণ্ঠ আর্দ্র···বীণার মন সে আর্দ্রতায় ভিজিয়া গেল। মনে হইল, অতি দুশ্চিন্তায় বীণা কাতর···তার মনে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক বাসা বাঁধিয়া দংশনে তাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, সত্য ! কিন্তু এই নিরীহ স্নেহ-পাগল বৃদ্ধ ! তাঁর বুকে আর-এক রকমের যাতনা ! সে যাতনা কতখানি তীব্র, বীণা তা জানে ! তারাচরণকে সে চিনিয়াছে ···তাকে পাইয়া তারাচরণ কত দিনের কত দুঃখ ভুলিয়াছেন, বীণা তাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করে বলিয়া কোনো দিন তাঁর পায়ের উপরে পড়িয়া মনের কপাট খুলিয়া বলিতে পারিল না, দাদু···আমি সলিলা নই···আমি বীণা !

বীণাকে নিরুত্তর দেখিয়া তারাচরণ রায় ইজিচেয়ারে বসিলেন, বলিলেন—কাছে এসো দিদি।

বীণা কাছে আসিল।

তারাচরণ রায় তাকে প্রায় বুকের উপরে টানিয়া লইলেন। বীণা তাঁর বুকে মুখ লুকাইল।

বীণার পিঠে হাত রাখিয়া তারাচরণ রায় সস্নেহে বলিলেন—দুঃখ

করো না দিদি। মেয়ে-মানুষকে স্বামীর ঘরই করতে হয়…স্বামীর ঘরই তার নিজের ঘর। আজ তোমার মা-বাবা যদি বেঁচে থাকতো, তা হলে তারাও তোমার বিয়ে দিয়ে স্বামীর ঘরেই তোমাকে পাঠিয়ে দিত। কাছে চিরদিন ধরে রাখতে পারতো না! আমাকেও তাই করতে হচ্ছে, দিদি আমি একা থাকবো, কেউ আমার কাছে থাকবে না, এতে আমার কষ্ট হবে খুব।…কিন্তু এ কষ্ট সইতে হবে দিদি। আমার আগে আমার বাবা-ঠাকুর্দা এমন দুঃখ সয়ে গেছেন…আমি সইবো…আবার তোমার যখন মেয়ে হবে, বিয়ে দিয়ে তাকে পরের ঘরে পাঠিয়ে তোমাকেও এমনি দুঃখ সইতে হবে ভাই।…এর জন্য কাঁদে না… কাঁদতে নেই। যে-ঘরে তোমায় পাঠাচ্ছি, সেই ঘর আলো করে তুমি চিরদিন থাকো। তোমার মায়ের মতো সব গুণ তোমার হোক...শুধু তার ভাগ্য তুমি পেয়ো না দিদি...ভগবানের কাছে কায়মনে আমি এই প্রার্থনা করি…

সুগভীর স্নেহের এ-কথা বীণার বুকে জমাট বেদনার স্তূপে আঘাত দিল। সে আঘাতে বেদনার স্তূপ ভাঙ্গিয়া অশ্রু-ধারায় বিগলিত হইল।

তারাচরণ রায় বীণার মাথায়-গায়ে হাত বুলাইলেন। অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন—তুমি যদি কথা না শোনো দিদি...তা হলে আমারো কান্না পাবে।

চোখ মুছিয়া মুখ তুলিয়া মলিন হাস্যে বীণা ডাকিল,—দাদু...

তারাচরণ রায় বলিলেন—দিদি...

বীণা বলিল—তার চেয়ে আমি যদি বরাবর তোমার কাছে থাকি?

—বিয়ে করবে না? বিয়ে না করে'?

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

তারাচরণ রায় বলিলেন—তা কি হয় দিদি?

—বিলেতে অনেক মেয়ে যে সারা-জীবন বিয়ে করে না।

তারাচরণ রায় হাসিলেন; বলিলেন—বিলেতের কথা আলাদা। এ তো বিলেত-দেশ নয় যে, তা হবে।

বীণা কোনো কথা কহিল না…চুপ করিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় নিশ্বাস ফেলিলেন…তাঁর ছ'চোখে মেঘের মলিন ছায়া!

বীণা ডাকিল—দাছ…

তারাচরণ রায় বীণার পানে চাহিলেন।

বীণা বলিল—ক'দিনে কেন তুমি আমায় এত ভালো-বাসলে দাছ?

একটা নিশ্বাস! তারাচরণ রায় সে-নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ভগবান এ ভালোবাসা বুকে দেছেন, দিদি। এ ভালোবাসা তিনি মা-বাপ, ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সবার বুকে দেছেন বলেই তাঁর সৃষ্টিধারা যুগ-যুগ ধ'রে চলে আসছে! না হলে পৃথিবীতে আজ মানুষের চিহ্ন থাকতো না!

বীণা এ কথার জবাব দিল না। তার মনের মধ্যে একরাশ প্রশ্ন ধোঁয়ার মতো কুণ্ডলী পাকাইতেছিল…

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তুমি যে আমাকে এত ভালোবাসো! তোমার মা, তোমার বাবা…কত দুঃখ-কষ্ট তাদের আমি দিয়েছি… তবু তুমি আমায় এত ভালোবাসো কেন, বলতে পারো?

কথাটা বলিয়া তারাচরণ বীণার পানে চাহিয়া রহিলেন। বীণা

চাহিয়াছিল খোলা খড়খড়ি দিয়া বাহিরে যে-আকাশ দেখা যাইতেছিল··· সেই সঙ্গে ও-দিককার বারান্দার যে ঝিলমিলি, ঝিলমিলির গায়ে দুটো পায়রা বসিয়া আছে, সে-সবের পানে! দৃষ্টি সে-দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও মন কিন্তু···

বীণা ফিরিয়া চাহিল তারাচরণ রায়ের পানে, ডাকিল,—দাদু···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—দিদি···

বীণা কহিল,—আচ্ছা, আমি যদি সলিলা না হয়ে আর কেউ হই?

কথাটা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ আতঙ্কে কেমন ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল···মাথা ঘুরিয়া গেল···দু'চোখের সামনে সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী! কাণে শুধু ভাসিয়া আসিল তারাচরণ রায়ের কণ্ঠস্বর। তারাচরণ রায় বলিলেন,—তার মানে?

বীণা কহিল—বলো না···ধরো···কেউ যদি এসে তোমায় বলে, আমি সলিলা নই···আমি আর-এক জনদের মেয়ে! আমার মা নেই, বাপ নেই, পৃথিবীতে আপন-জন কেউ নেই তোমার এখানে সলিলা সেজে এসে তোমার স্নেহ-ভালোবাসা চুরি করে আদায় করছি? যদি সত্যি-সত্যি তাই হয়? বলো না, যদি···

কথার শেষ-দিকে বীণার স্বর জড়াইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন সবলে বীণার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে! তার কণ্ঠে কথা আর বাহির হইল না···

মাথা আরো ঘুরিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ঘরটা যেন দুলিতেছে··· ভূমিকম্পের বেগ!

বাহিরে গোধূলির ঐ স্নিগ্ধ আলোর উচ্ছ্বাসটুকু যেন নিবিয়া

আসিতেছে। চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করিয়া সেই শ্রীপতির মুখ···সে মুখে বিকট হাসির রেখা! ভয়ে বীণা চক্ষু মুদিল।

তার পর···

চোখ মেলিয়া চাহিয়া বীণা দেখে, বিছানায় সে শুইয়া আছে···পাশে বসিয়া তারাচরণ রায়। তাঁর দু'-চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এখন ভালো বোধ করছো দিদি?

বীণা এবাব ভালো করিয়া চাহিল। বলিল,—বিছানায় এলুম কখন, দাদু?

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিজে এসেছো কি! আমি এনে শুইয়ে দিয়েছি। মাথা ঘুরে আমার কোলে লুটিয়ে পড়লে···যত ডাকি, জবাব নেই!···যে ভয় হয়েছিল!

কুণ্ঠাভরে বীণা বলিল,—আর কাকেও ডাকোনি তো দাদু?

—না।

আঃ! ডাকিলে সকলে কি মনে করিত? ভাবিত, মেয়েটা যেন কি! কথায়-কথায় কি কীর্ত্তিই করে!

বীণা উঠিয়া বসিল।

মনে পড়িল, যে-প্রশ্ন করিয়াছিল! মনে পড়িল, চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে শ্রীপতির মুখ···রূপকথার গল্পে ধোঁয়া হইতে যেমন দৈত্যের আবির্ভাব হয়, তেমনি! মনে মনে হাসিল। এমন নিরাপদ নীড়ে বসিয়াও যদি এমন করিয়া এ-ভয় মনে জাগে, তাহা হইলে বাঁচা কেন!

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব পায় নাই! আবার প্রশ্ন করিবে ?

বীণা চমকিয়া উঠিল!...না...থাক্!

বীণা বলিল,—আমি গান গাই, দাদু। তুমি গান শুনতে চাইলে!

তারাচরণ বলিলেন,—কষ্ট হবে না ?

—না। তুমি ভাবছো, আমি অজ্ঞান হয়ে গেছলুম? তা নয়। দিন-রাত শুধু ভাবি কি না...

তারাচরণ রায় বলিলেন,—আর ভেবো না। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, তোমার ভাবনার কোনো কারণ নেই, জেনো।

বীণা মাথা নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

তার পর সে উঠিয়া অর্গানের সামনে বসিল। বলিল,—কি গান গাইবো ?

—যে-গান তোমার ইচ্ছা।...বিয়ে হয়ে গেলে আর তোমার গান শুনতে পাবো না তো...

বীণা কহিল,—আবার ঐ কথা! তা হলে আবার আমি ভাবতে বসবো।

—না দিদি, আর ভেবো না। তুমি গান গাও...

বীণা গাহিল,—

"দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না,
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।)
কান্না-হাসির বাঁধন তারা সইলো না
(সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)
আমার প্রাণে গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা,

উড়ে গেল, সকল কথা কইলো না।
সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)"

চমৎকার গান···চমৎকার কণ্ঠ!

তারাচরণের মনের মধ্যে যেন সিন্ধু উথলিয়া উঠিল!

গান শেষ হইলে তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমার নানা-রঙের দিন তোমার বুকে সোনার খাঁচায় চিরদিন থাকবে!···কিন্তু এ-দুঃখের গান কেন গাইলে, দিদি?

বীণা কহিল,—নতুন শিখেছি। বড্ড ভালো লেগেছে এ-গানটি···

—রবীন্দ্রনাথের গান?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এ-গানে খুশী হলুম না। আনন্দের গান শুনতে চাই আমি।

বীণা কহিল,—দুঃখের গান আমার ভালো লাগে দাদু···

—না···এবার একটা সুখের গান গাও দিকি···রবীন্দ্রনাথ সে-গানও অনেক লিখেছেন।

বীণা কহিল,—সুখের গান? আচ্ছা···

বীণা গাহিল—

আজ কি তাহার বারতা পেলো কিশলয়?
ওরা কার কথা কয় বনময়?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
সুরে-সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয়?···

তারাচরণ কহিলেন—বেশ, বেশ, বেশ গান দিদি। সেই পথিকের জয়-গান গাও…জয়…জয়…

বীণা গাহিতে লাগিল,—

চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লী-মুখর ঘন বনতলে…

এমন সময় দাক্ষায়ণী দেবী ঘরে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন,—আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছে, এ সময় বিরক্ত করবো?

কথা শুনিয়া বীণার কণ্ঠ নীরব…তারাচরণ চাহিলেন দাক্ষায়ণীর পানে।

দাক্ষায়ণী বলিলেন—তুমিই বলেছিলে, তাই ভটচাযিা মশাইকে ডাকিয়ে এনেছিলুম। এসে পাঁজি দেখে তিনি দিন ঠিক করেছেন…পঁচিশে আষাঢ়।

তারাচরণ কহিলেন,—পঁচিশে আষাঢ়! ও! আজ হলো ক' তারিখ?

দাক্ষায়ণী বলিলেন,—আষাঢ় মাসের আজ আঠারো তারিখ।

—মাঝে সাত দিন বাকী! তা বেশ, ঐ তারিখই ঠিক রইলো। ছেলেটিকে আমি চিঠি লিখে জানাই।

দাক্ষায়ণী দেবী কহিলেন—তোমার ইচ্ছা…

২৪

ডাক্তার-পাত্রের সঙ্গে বিরজার বিবাহ চুকিতে না চুকিতে পাত্র স্বর্ণদ্যুতি রায়ের দিক হইতে তাগিদ আসিল। স্বর্ণদ্যুতিকে দিন-পনোরোর মধ্যে এলাহাবাদে যাইতে হইবে। সেইখানেই তার চাকরি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাজেই বিবাহ যদি এখন না হয়, তাহা হইলে কত কাল পরে এ বিবাহের সুযোগ মিলিবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই!

তারাচরণ রায় ভাবিয়াছিলেন, এ-বিবাহের ছুতা করিয়া সলিলার বিবাহের তারিখ আরো কিছুকাল পিছাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন! কিন্তু তাহা ঘটিল না।

তাঁকে কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইল।

ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দিবেন, বাসনা ছিল। কিন্তু দেওয়া দূরের কথা, সে-বিবাহ লইয়া যে-ব্যাপার ঘটিয়া গেছে, তার আঘাতে বুক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আছে। সে-ক্ষত মিলায় নাই, ইহজন্মে মিলাইবে না! সে-বিবাহের ফলে মনে এমন আগুন জ্বালিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে-আগুনে তাঁর সারা পৃথিবী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে! নাৎনীর বিবাহ দিয়া সে-বাসনাকে তাই আজ পরিমাণে চরিতার্থ করিবার

জন্য তিনি কোমর বাঁধিলেন। পুরানো রীতি মানিয়া সামাজিক-বিতরণ, বাঁধা রোশ্‌নাই এবং যেখানে যত আত্মীয়-বন্ধু আছে, সকলকে নিমন্ত্রণ—কোনোদিকে এতটুকু খুঁত রাখিলেন না। ভাবিলেন, ছেলে সন্তোষ আর বধূ চারুলতা অন্তরীক্ষে থাকিয়া যদি দেখে, নিমেষের সে মহাভ্রান্তির কতখানি তিনি সংশোধন করিতেছেন, তাহা হইলে তাঁর মনের পরিচয় পাইয়া নিশ্চয় তাঁর সব অপরাধ ভুলিয়া তাদের আত্মা তৃপ্তি লাভ করিবে!

মহা সমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। তার পর বিবাহের আনুসঙ্গিক ব্যাপারগুলা। সে-সব চুকিবার সঙ্গে সঙ্গে···

স্বর্ণহ্যুতির যাত্রার আয়োজন। পরশু স্বর্ণহ্যুতি এলাহাবাদ যাত্রা করিবে। সলিলাকে সে সঙ্গে লইয়া যাইবে, স্থির হইয়াছে।

তারাচরণ রায়ের পৃথিবী আবার তাই দুলিতে সুরু করিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি গম্ভীর মুখে বসিয়াছিলেন।

কিরণ আসিয়া বলিল—সলিলাকেও পরশু পাঠাচ্ছেন দাদু?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—উপায় কি বলো, দিদি? তোমরা মেয়ে ···তোমাদের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই তো। অধিকার পরের।

কিরণ বলিল,—অধিকার···মানে? আমরা কুকুর, না, বেরাল? না, আসবাব-পত্র যে অপরে আমাদের উপর অধিকার চালাবে?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—অধিকার কথাটা চল্‌তি বলেই বললুম, দিদি! আসলে সলিলা আর স্বর্ণহ্যুতি—ওরা নিজেদের ঘর-সংসার গড়বে তো দু'জনে মিলে!

কিরণ বলিল,—এখানকার ঘর-সংসার ভেঙ্গে সে-ঘর গড়ার বিধান আছে, বুঝি ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এর মধ্যে ভাঙ্গা-গড়া নেই, দিদি। এখানে আমাদের কাছে তোমরা থাকো…সে শুধু নিজেদের ঘর যতদিন হয় না, ততদিন ! তার পর বর এসে ঘরের সন্ধান দিলে এখানে আর কেন তোমরা থাকবে, বলো ? এ ঘর হলো যেন ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুম ! বর হলো ট্রেণ ! তার পথ চেয়ে তোমাদের এ-ওয়েটিং-রুমে বসে থাকা বৈ নয় ! ট্রেণ এলে সেই ট্রেণে চড়ে তখনি বাড়ী ছুটতে হয়।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া কিরণ বলিল—বা রে, এ্যাদ্দিন বুঝি স্বর্ণদ্যুতি সাহেবের ঘর চলছিল না ? যেমন বিয়ে হওয়া, অমনি…

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—আমাকে বললে, দুজনে একসঙ্গে এলাহাবাদ যাবো, দাদু ! স্বর্ণদ্যুতির মনের তাই ইচ্ছা, বুঝলুম। বললেন, ছোটখাট কনেবৌ হলে আলাদা কথা ছিল।

কথাটা বলিয়া তারাচরণ রায় নিশ্বাস ফেলিলেন।

কিরণ বলিল,—সলিলা কি বললে ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সে কোনো কথা বলেনি। সে শুধু জল-ভরা দু'টি চোখ মেলে আমার পানে চেয়ে ছিল।

কিরণ বলিল,—এমন হবে, তা কে জানে ! জানলে কক্‌খনো আমি এ-বিয়ের জন্য এত তাড়া দিতুম না ! আমি ভেবেছিলুম, বিয়ে হয়ে গেলে বর থাকবে এলাহাবাদে, সলিলা থাকবে এখানে…দু'জনে চিঠি-পত্র লিখবে। আমি এসে পড়বো…কেমন রোমান্স…

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের ডাগর করে বিয়ে দিয়ে

এ-রোমান্স আমরা ভেঙ্গে দিচ্ছি দিদি, না হলে সত্যি এই চিঠি-লেখার মধ্যে যে-রোমান্স ছিল…সব হারিয়ে বসলেও সে-কথা এখনো ভুলিনি, কিরণ !…রোজ একখানা করে চিঠি লিখতুম আমি তোমার ঠাকুমাকে… তিনিও রোজ আমাকে চিঠি লিখতেন। সে-সব চিঠিতে কি আবোল-তাবোল যে না লিখতুম ! তবু সে কি মিষ্টি ছিল। ভাবি তাই, সে ভালো ছিল ? না, তোমাদের এই বড় করে বিয়ে দিয়ে একেবারে কর্ত্তা-গিন্নী সাজিয়ে ছেড়ে দেওয়া…এ ভালো হয়েছে ?

কিরণ এ-কথার জবাব দিল না ; বলিল,—সলিলা কোথায় ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের স্বর্ণদ্যুতি সাহেব এসে তাঁকে নিয়ে গেছেন। পছন্দ করে কি সব কেনা-কাটা করবেন…তার পর দু'জনে সিনেমায় যাবেন। ফিরবেন সেই যার নাম রাত সাড়ে আটটা-ন'টায়।

হাস্যোচ্ছ্বাসে গলিয়া কিরণ বলিল,—দু'জনে এর মধ্যে এত ভাব হয়েছে ?

তারাচরণ রায় কহিলেন,—ভাবের সম্পর্ক…ভাব হবে না ?

কিরণ বলিল,—তা বলে দু'দিনেই এমন সড়গড় !…স্বর্ণদ্যুতির রকম দেখে মনে হয়, সলিলার সঙ্গে যেন দু'চার বছর ধরে ওঁর জানাশোনা !

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তা হলে বলি শোনো, দিদি…তোমাদের জামাইবাবু এলেন…এসে আমাকে একেবারেই বললেন, সলিলাকে একটু দরকার আছে ! আমি বললুম, বসো, সলিলাকে আমি ডাকিয়ে দি। দাদুজী বসলেন। সলিলা এলো। আসতেই দেখি, আমার সামনে সলিলার হাতে এক-তাড়া নোট দিয়ে, বললেন, এগুলো তোমার

হাত-ব্যাগে রাখো। তার পর তুমি চট্ করে তৈরী হও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে তোমাকে নিয়ে বেরুবো···বাজারে যাবো··· তার পর যাবো সিনেমায়।

হাসিয়া কিরণ বলিল,—তোমার অনুমতি নেওয়া নয়, কিছু না···ঐ কথা বললে? আর সলিলা দিব্যি গেল?

—হ্যাঁ। আমার সামনে লজ্জায় প্রথমে উনি নুয়ে পড়্লেন! টাকা নিতে হাত পাততে পারেন না! আমি বললুম, নাও···কর্ত্তা দিচ্ছে··· গিন্নীর অমন কাঠের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন? তখন নিলে·

কিরণ বলিল,—সত্যি, তোমায় দেখে স্বর্ণদ্যুতির লজ্জা হলো না এমন করে বৌকে ডেকে আত্মীয়তা করতে?

—না। ওরা ভাবে, এ-আত্মীয়তা by right. তা ছাড়া, স্ত্রী হলো better-half এবং স্ত্রীর জন্যই তো সব···অতএব এ-বুড়োকে আবার কিসের লজ্জা?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তারাচরণ রায় চুপ করিলেন···

কিরণ সহাস দৃষ্টিতে তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সত্যি বলছি দিদি, আমার খুব ভালো লাগলো। একালের এই forward-ভাব বড় ভালো লাগে। আমাদের আমলে লুকোচুরি রোমান্সে যত মধুই থাকুক, একালের এই পরমাত্মীয় সপ্রতিভ ভাব···এত চট্ করে দু'জনকে দু'জনের নাগালে পাওয়া···এমন সহজ নির্ভরতা···এর দাম আছে, দিদি। হাসছো কি? তোমারো এ শুভদিন এলে এই দৃশ্যই দেখবো!···আমরা পাশে থাকলে মনে হবে,

এতে আবার লজ্জা কি! স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্কে তো লজ্জার সম্পর্ক নয়! আমরাও এই ভেবে নিশ্চিন্ত হবো যে, দু'জনে সংসারের চার্জ্জ নিতে সক্ষম···বুঝলে?

কিরণ বলিল,—ওরা এলে আমি কিন্তু খুব ঝগড়া করবো···বুঝলে দাদু। দু'জনে যে দু'জনকে পেয়েছে, সে কার জন্য বাবু? এই আমি ছিলুম বলেই তো!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—নিশ্চয়···

কিরণ বলিল,—আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে দু'জনের রোমান্সের রঙ ছুটে যেতো?

দু'জনে কথা হইতেছে, এমন সময় ঊষাঙ্গিনী আসিয়া দেখা দিল।

এ-বিবাহে ঊষাঙ্গিনী নিমন্ত্রণে আসিয়াছে।

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—আমি আজ যাচ্ছি, জ্যাঠামশাই···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—সেখানকার ডাক এসে গেছে? আর বেশী দু'দিন ছুটী মঞ্জুর হলো না; মা?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—আপনার জামাই একলা···খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট হয়, জ্যাঠামশাই। তার উপর সদ্য অসুখ থেকে উঠেছেন··

তারাচরণ কহিলেন,—ও!···কিন্তু সে এলো না বলে মনে বড় দুঃখ রইলো, মা। তাকে বলো, চাকরি করে বলে সে-চাকরিতে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকা ঠিক নয়। পাওনা ছুটিগুলো মাঠে মারা উচিত হবে না। এ ছুটিগুলোর সদ্ব্যবহার করতে বলো···তা হলে দেহ-মন সুস্থ থাকবে। বুঝলে?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—বলবো।

—হ্যাঁ, বলো। আমার নাম করে তাকে বলো···বৃদ্ধস্য বচন· একালের ছেলে বলে যেন উড়িয়ে না ছায়!

ঊষাঙ্গিনী এ-কথার জবাব দিল না; মৃদু হাস্য করিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—ক'টায় তোমার ট্রেণ?

ঊষাঙ্গিনী বলিল,—সাড়ে আটটায়। দিল্লী মেলে যাচ্ছি।

তারাচরণ রায় কহিলেন,—তা হলে সলিলার সঙ্গে যাবার আগে আর দেখা হলো না।

ঊষাঙ্গিনী যেন আকাশ হইতে পড়িল, কহিল,—কেন? সে শ্বশুর বাড়ী গেছে?

কিরণ বলিল,—না, ঊষা পিশি, তোমার জামাই আর মেয়ে দু'জনে বাজার করতে বেরিয়েছেন···সেখান থেকে সিনেমায় যাবেন। দাদু সুখ্যাতি করছিল। বলছিল, বেশ ভালো লাগলো এই সপ্রতিভ ভাব! কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি ওদের বেহায়াপনা দেখে! সদ্য বিয়ে হয়েছে, আর এর মধ্যে এমন অন্তরঙ্গতা···ওঁরা স্বামি-স্ত্রী ছাড়া দুনিয়ায় যেন আর মানুষ নেই!

হাসিয়া ঊষাঙ্গিনী বলিল,—এই ভালো, কিরণ। তোমার বিয়ে হোক···তখন জামাই এসে এমনি করে তোমাকে নিয়ে বেরুবে···আমি কায়মনে সেই প্রার্থনা করি···

কিরণ বলিল,—হুঁ! আমি যাবো কি না! বয়ে গেছে!···দু'দিনে কোনো লোককে বুঝি এতখানি বিশ্বাস করা যায়? যে-সে এসে বলবে, চলো···অমনি তার সঙ্গে বেরুবো! কিরণ সে-মেয়ে নয়, ঊষা পিশি।

তারাচরণ রায় হাসিলেন। হাসিয়া তিনি বলিলেন,—সেই ভালো।

অজানা নতুন লোককে তুমি চট্ করে বিশ্বাস করো না, দিদি। তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইলে তুমি এই বুড়ো দাদুকে সঙ্গে নিয়ো···তোমার ব্যাগ বইবে, লিপষ্টিক বইবে, পাউডার বইবে, আয়না বইবে।

তার পর তিনি চাহিলেন উষাঙ্গিনীর পানে, বলিলেন,—জামাই কেমন হয়েছে মা উষা ?

উষাঙ্গিনী কহিল,—চমৎকার, জ্যাঠামশাই! রূপে-গুণে যেমন হতে হয়! দুঃখ শুধু এই যে, আজ সন্তু কাকা নেই, কাকিমা নেই···

একটি নিশ্বাস ফেলিয়া গাঢ় স্বরে তারাচরণ বলিলেন,—হুঁ···

উষাঙ্গিনী তখনি অন্য কথা পাড়িল, বলিল,—সলিলা এলে সলিলাকে তুমি বলো এলাহাবাদে থাকবে তো···আমার ওখান থেকে খুব কাছে। আমায় যেন চিঠি লেখে···তা ছাড়া আমাকে যে কথা দেছে···আমার ওখানে একদিন ওরা দু'জনে বেড়াতে যাবে···সে কথা যেন সত্যি হয়!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমাদের জামাই মত করবে তো ?

উষাঙ্গিনী বলিল,—নিশ্চয়। জামাইকেও আমি বলেছি। তাতে সে আমায় কথা দেছে। বলেছে, অত কাছে থাকবেন···নিশ্চয় দু'জনে যাবো পিশিমা।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমার কথা বলবো মা···নিশ্চয় বলবো! চিঠি-পত্র আমাকেও লিখো মা উষা...আমি হয়তো যাবো। এ-বয়সে আবার মাঝে-মাঝে প্রয়াগ-তীর্থে না নিয়ে গিয়ে সলিলা ছাড়লো না! এমন মায়া হয়েছে...মাসে একবার করে ঘুরে আসতে হবে, দেখছি!

উষাঙ্গিনী বলিল,—নিশ্চয় আসবেন, জ্যাঠামশাই। মেয়ে···তাকে কাছে রাখা চলে না, তাই বিয়ে দিয়ে দূরে পাঠাতে হয়। কিন্তু দেখতে

যাওয়া যায় তো। আপনি সেখানে নিশ্চয় যাবেন। আপনার জিনিষ! অমনি একবার আমাদের কুঁড়ে-ঘরেও পায়ের ধূলো দিয়ে আসতে হবে জ্যাঠামশাই, না হলে আমার বড্ড দুঃখ হবে।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—যাবো মা। এলাহাবাদে যদি যাই, তোমার ওখানে যাবো না?

তারাচরণ রায়ের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঊষঙ্গিনী প্রণাম করিল। তারাচরণ রায় তার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—চিরায়ুষ্মতী হও মা।…কার সঙ্গে যাচ্ছো?

—বাবা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।

—বটে!

কিরণকে আদর করিয়া ঊষাঙ্গিনী চলিয়া গেল।

কিরণ গুম্ হইয়া রহিল...খানিকক্ষণ। তার পর অকস্মাৎ ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল,—নাঃ, সলিলার বিয়ে হয়ে গেলে কত আমোদ-আহ্লাদ করবো, ভেবেছিলুম। তা না, বৌকে এর মধ্যে না নিয়ে গেলে বরের চাকরি থাকবে না!

হাসিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন,—তোমারো বরের চেষ্টা দেখছি দিদি…দাঁড়াও না! এই জষ্টি-মাস পেরুতে দেবো না।

কিরণ বলিল,—হ্যাঁ তাই না কি আমি বলেছি তোমার গলা ধরে!

২৫

বীণাকে লইয়া স্বর্ণদ্যুতি ফিরিল রাত্রি তখন ন'টা বাজে—সঙ্গে একরাশ জিনিষ। রেশমী শাড়ী-ব্লাউশ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান-সেণ্ট প্রভৃতি নানা টুকিটাকি !

তারাচরণ বলিলেন,—বাজার বাজার হলো ?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—হ্যাঁ। ভাবছি কাল বিশ্রাম, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হবে। কাল বাজার করা সুবিধা হবে না বলেই আজ··· বুঝলেন দাদু !

সলজ্জ ভঙ্গীতে বীণা চলিয়া যাইতেছিল, স্বর্ণদ্যুতি বলিল—দাদুকে জিনিষপত্র দেখাও...

লজ্জায় সলিলা যেন কাঠ !

তারাচরণ রায় বলিলেন,—কাঠ হলে তো চলবে না, দিদি, পড়েছো মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে !

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আমাকে মোগল বললেন দাদু !

তারাচরণ রায় বলিলেন,—চল্‌তি ছড়া বলেই বলেছি, ভাই। তুমি সত্যিকারের মোগল হবে কেন ?...তা লজ্জা কেন দিদি ? ঘর-সংসার পাতছো...আমাকে দেখাও সে ঘর-সংসার কেমন হবে।

বীণার লজ্জা তবু ভাঙ্গিতে চায় না! হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—বাইরে আমার সঙ্গে দিব্যি ঘুরে এলে তো···অত কথাবার্ত্তা! আর ঘরের মধ্যে দাদুর সামনে এমন লজ্জা! জানলেন দাদু···সে কি smartness···দেখলে কে বলবে, আমার সঙ্গে সদ্য বিয়ে হয়েছে!

তারাচরণ রায় হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন—বর কি বলে দিদি?···আমার সঙ্গে এত দিন ঘর করলে, তবু লজ্জা! দেখি, দু'জনে কি কিনলে···কে কোন্‌টা পছন্দ করলে, আমায় বলো···

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—এসো···

বীণা আসিল। তারাচরণ রায় বলিলেন—বরের কথায় দিব্যি এলে তো! আর এই বুড়ো এতক্ষণ সাধ্য-সাধনা করছিল···

বীণা কোনো জবাব দিল না। নিঃশব্দে প্যাকেট খুলিল।

জিনিষ দেখিয়া তারাচরণ রায় সুখ্যাতি করিলেন।

উচ্ছ্বসিত স্বরে স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনার নাৎনী এর কোনোটা পছন্দ করেনি···এর সব আমি পছন্দ করেছি। আমার টেষ্টের তারিফ করুন।

তারাচরণ রায় কোনো কথা বলিলেন না। আসন্ন বিদায়ের কথা স্মরণ করিয়া তাঁর বুক ব্যথা-ভরে ভরিয়া উঠিতেছিল।

জিনিষপত্র দেখা হইলে স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনার নাৎনীকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেলুম দাদু, অক্ষত দেহে-মনে! চার্জ্জ বুঝে নিন···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—তার মানে? তুমি চলে যাচ্ছো না কি?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—বাড়ী যাবো না ? বাঃ !

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বাড়ী তো তোমার এখন এইখানে।

—কি-রকম ?

—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ! তোমার গৃহিণী যেখানে, সেইখানেই তোমার বাড়ী…

হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—পরশু চলে যাবো দাদু…বাড়ীতে এ-দু'রাত্রি না থাকলে লোকে কি বলবে ?

তারাচরণ রায় বলিলেন,—লোকের কথা এত বড় ? তোমরা একালের ছেলে…যাকে বলে modern…লোকের কথায় নিজের মনকে উপবাসী রেখে পীড়া দেবে ! মন চাইছে ষোড়শী বধূ…জ্যোৎস্না রাত্রি…

সলজ্জ হাস্যে স্বর্ণদ্যুতি চাহিল বীণার পানে। বীণা আর এক-নিমেষ দাঁড়াইল না…ত্বরিত-পায়ে বাহিরের বারান্দায় চলিয়া গেল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনার নাৎনী পালালো যে ! ওকে ধরে আনি।

স্বর্ণদ্যুতি বাহিরের বারান্দায় গেল এবং বীণাকে ধরিয়া ঘরে ফিরিল।

লজ্জায় বীণা জড়ো-সড়ো মূর্তি ! স্বর্ণদ্যুতি ছাড়ে না ! হেলিয়া বাঁকিয়া-চুরিয়া মুক্তির জন্য বীণার সে কি আকুল প্রয়াস !

হাসিয়া তারাচরণ বলিলেন,—তোমায় পালাতে হবে না দিদি আমিই না হয় সরে যাচ্ছি ! আমি বুঝি দিদি, মন চায়…সেই যে সে-দিন গান গাইছিলে…সেই মন চায় তবু খুব লজ্জা…কি গানটা ?

উচ্ছ্বসিত-আগ্রহে স্বর্ণদ্যুতি বলিল—মন চায় না দাদু, প্রাণ চায়। আমি জানি…রবি বাবুর গান।

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়—
মরি এ কি তোর দুস্তর লজ্জা!
সুন্দর এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা!

তারাচরণ রায় কহিলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ...তাই বটে! প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়! কিন্তু তোমার সুন্দর এসে যে ফিরে যাচ্ছে দিদি...এ সময় লজ্জা করলে তাকে ধরে রাখবে কে?

সলজ্জ ভ্রূভঙ্গি-সহকারে বীণা বলিল,—যাও...হুঁ...

লজ্জা-জড়িত এই মৃদু-হাস্য তারাচরণ রায়ের বুকে যেন বসন্ত-বাতাসের স্পর্শ দিল! কি সুন্দর, সরল ঐ মিষ্ট-মধুর হাসি! ও হাসির পিছনে কতখানি আশা...কি মধুর স্বপ্ন-সুষমা...

ছোট একটা নিশ্বাস তিনি রোধ করিতে পারিলেন না। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তোমার কর্ত্তাটিকে থাকতে বলো দিদি...না হলে আমাদের সলিলা বিগলিতা হয়ে পড়বে...

বীণা এবার কথা কহিল; বলিল—আমার হাত ছেড়ে দিতে বলো দাদু...

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—তুমি পালাবে না...কথা দাও।

তারাচরণ রায় বলিলেন—ও হলো সবল-তরুণ...তা ছাড়া তোমার উপর ওরই এখন অধিকার...আমার কি সাধ্য দিদি, ওর হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দেবো!

বীণা বলিল—না...ছাড়তে বলো!...সকলে মজা পেয়েছো আমায় নিয়ে...না? আমি যেন মানুষ নই!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—তুমি মানুষ বলেই বন্দী করা হয়েছে। পাছে পালাও, তাই!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এ-খেলা আমার ভাল লাগছে দিদি। এ-খেলা আজ প্রথম দেখছি···হয়তো এই প্রথম-দেখাই আমার শেষ দেখা ভাই···

কথাগুলা শেষের দিকে বাষ্প-ভারে বিজড়িত হইল।

তিনি চাহিলেন স্বর্ণদ্যুতির পানে ; তার পর কাশিয়া গলা সাফ করিয়া লইয়া বলিলেন,—তুমি জানো না স্বর্ণ, হেলায় জীবনের কতখানি আমি হারিয়ে ছিলুম! আজ শেষ বেলায় সে-অবহেলার ক্রটি সেরে কি আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছে!

একটা বড় নিশ্বাস! কত কালের পুঞ্জিত বেদনা যে এ-নিশ্বাসে বুকের কোটর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বাড়ী যাবে বলছো! ধরে রাখবো না! কাকেও ধরে রাখবার মতো শক্তি আমার নেই, ভাই···সাহসও আর নেই! তবে তোমাদের দু'টিকে যতক্ষণ কাছে পাই!···আজ আমার সব কথা মনে পড়ছে। সন্তু ডাগর হয়ে উঠলো, মনে কত আনন্দ··· অমনি তিনি চলে গেলেন। সন্তুর বিয়ে দেবেন, তাঁর কি সাধই ছিল!··· তিনি চলে গেলে সন্তুর বিয়ের নামে আমার বুক কি-ব্যথায় ভরে উঠতো! সম্বন্ধ আসতো···কিন্তু বিয়ে দেবার কথা মনে হলেই ভাবতুম, কার বৌ···আদর করে বৌ নিয়ে আসবো আমি, সে-বৌ কে দেখবে? যার ছেলে, যাঁর বড় সাধ ছিল, তিনি নেই! মনের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ চলতো···

তারচরণের স্বর অবরুদ্ধ হইল।

এ কথায় ব্যথা বোধ করিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আমি জানি দাদু· সে কথা আমি শুনেছি। কিন্তু যা গেছে, তা নিয়ে দুঃখ পুষে তো কোনো ফল নেই! যা আছে, তাই নিয়ে সে-দুঃখ আমাদের ভুলতে হবে। আমি বেশ বুঝছি, সলিলা এখান থেকে চলে গেলে আপনার জীবন খালি হয়ে যাবে···তাই···যদি কিছু মনে না করেন, আমার একটু নিবেদন আছে···

তারাচরণ রায় কোনো জবাব দিলেন না। দুই চোখে আকুল প্রশ্ন ভরিয়া স্বর্ণদ্যুতির পানে চাহিলেন।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আপনি মাঝে-মাঝে যদি আমাদের ওখানে যান, তা হলে আপনিই শুধু মনে শান্তি পাবেন, তা নয়···আমরাও অনেকখানি শান্তি পাবো। বিশেষ, সলিলা।···বায়স্কোপে আজ এইমাত্র একটা ছবি দেখে আসছি। সে ছবির গল্প ছিল, একজন ভদ্রলোকের একটিমাত্র মেয়ে···সেই মেয়ে একটি ছেলে রেখে মারা গেল। ছেলেটিকে বুকে নিয়ে বুড়ো দাদামশায় কোনো মতে শান্তি পেলেন, শক্তি পেলেন। তার পর সে-ছেলে এক বিদেশিনীকে বিয়ে করে বিদেশে চলে গেল। বুড়ো দাদামশায়ের কথা ভাবলো না! দাদামশায়ের তখন কি দুঃখ! সে-দুঃখ কি-পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ছবিতে দেখিয়েছে!···ছবি দেখে সলিলা কেঁদে সারা! আমি যত বোঝাই, সলিলা বলে, আমি চলে গেলে দাদু কি নিয়ে থাকবে? কি করে দাদুর দিন কাটবে? আমিও সেই কথা ভাবছি, দাদু···

এ কথায় তারাচরণ রায় কি-স্বস্তি যে বোধ করিলেন। তাঁর দুঃখ

এমন করিয়া এরা ভাবে? কিন্তু না, তাঁর এ দুঃখ মোচনের কোনো উপায় নাই! তাঁর জন্য এরা কেন এ বয়সে মিছা দুঃখ পাইবে?

তিনি বলিলেন—না দাদা, না দিদি, আমার জন্য দুঃখ করো না। সংসারে এ-বিদায়, এ-অদর্শন নিত্যকার ঘটনা। এ-ব্যথা সকলকেই বুকে নিতে হবে।···আমি যাবো...নিশ্চয়। মাঝে-মাঝে ওখানে গিয়ে তোমাদের দেখে আসবো। নিত্য-দিন এখানে বসে তোমাদের মঙ্গল কামনা করবো। তোমরা সুখী হও···সুখে থাকো!···তোমাদের ছেলেমেয়ে হবে। মেয়ে হলে বিয়ে দিয়ে সে-মেয়েকেও একদিন চোখের আড়ালে পাঠাতে হবে তো!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—আমার এক মাসিমা বলছিলেন, সলিলাকে আজ আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে। তাতে মা বললেন, না···বুড়ো দাদা-মশায়ের কাছ থেকে দূরে যাচ্ছে··· দুটো দিন সলিলা তাঁর কাছে থাকুক! ও-ছাড়া দাদামশায়ের আর কে আছে!···কাল আমি নিশ্চয় আপনার কাছে আসবো দাদু। পরশুও আসবো। আমরা বেরুবো সেই পাঞ্জাব মেলে! সলিলা কাল তার জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিক্!···তার পর ভাবছেন কেন দাদু? সলিলাকে দু'দিনে এমন স্মার্ট করে দেবো যে, শুধু আপনি কেন আমাদের দেখতে যাবেন···দেখবেন, সলিলা একলা হুট্ বলতে এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবে। আমি অবশ্য হুট্ বলতে আসতে পারবো না, হয়তো···পরের চাকরি! জানি না, সে-চাকরিতে French leave মিলবে কি না···

গল্পে ও কৌতুক-হাস্যে বিদায়-ব্যথার জমাট ভাব কাটাইয়া স্বর্ণদ্যুতি বিদায় লইল···ঘড়িতে তখন দশটা বাজিতেছে।

২৬

পরের দিন।

মনের দুঃখ মনে চাপিয়া তারাচরণ রায় কোমর বাঁধিয়া বীণার সঙ্গে মিলিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া বাঁধা-ছাঁদা করিতে লাগিলেন। ও-বাড়ী হইতে কিরণ আসিয়া সে-কাজে যোগ দিল।

বেলা প্রায় তিনটা...ডাকে একখানা চিঠি আসিল। সলিলার নামে চিঠি। খামের উপর কদর্য্য হাতের অক্ষরে নাম-ঠিকানা লেখা।

খাম হাতে লইয়া বীণার বিস্ময়ের সীমা নাই! এমন হাতের হরফে ঠিকানা—কে চিঠি লিখিয়াছে?

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। তিন-পাতা চিঠি। হাতের অক্ষর খামে-লেখা অক্ষরের অনুরূপ। চিঠিতে সম্বোধন দেখিয়া বীণার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চিঠির তলায় যে-নাম লেখা···

দেখিবামাত্র দিনের আলো যেন দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল! কোনো মতে কিরণ এবং তারাচরণের দৃষ্টি এড়াইয়া চিঠিটা লইয়া বীণা আসিল পাশের বারান্দা পার হইয়া নিরালা একটা ছোট ঘরে। এ-ঘরে রাজ্যের ছেঁড়া লেপ-তোষক-বালিশের পাহাড় ডাঁই হইয়া আছে। এ-ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন কাহারো বড় একটা হয় না।

এ-ঘর সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবিয়া বীণা চিঠি পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে—

কল্যাণীয়াসু

বীণা

ক'দিন আগে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। ঘটার বিবাহে কনে সাজিয়া ফুল-দিয়া-সাজানো মোটরে চড়িয়া বরের পাশে বসিয়া নূতন শ্বশুর-বাড়ীতে চলিয়াছ!

গোলমালের মধ্যে তখন কোনো কথা কহি নাই। কে জানে, যদি কেহ ধরিয়া প্রহার দেয় এই ভয়ে।

তার পর কাল সন্ধ্যার সময় দেখি মোটর হইতে নামিয়া বরের সঙ্গে সিনেমায় চলিয়াছ। সিনেমার দ্বারে ঠায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। সিনেমা দেখিয়া তোমরা বাহির হইলে। তাহার মধ্যে ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ করিয়া সব বৃত্তান্ত জানিয়া লইয়াছি।

ড্রাইভারের মুখে শুনিলাম, তুমি নাকি অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক তারাচরণ রায়ের একমাত্র পৌত্রী! তার মন্দিবের ছেলে বিলাত-ফেরত স্বর্ণদ্যুতি রায়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়াছে। তোমার বর তোমাকে লইয়া কাল এলাহাবাদে যাইবে—বড় সরকারী চাকরী করিতে।

তুমি আমার মেয়ে বীণা—তারাচরণ রায়ের নাৎনী সলিলা সাজিয়াছ! আর এতকাল তোমাকে আমি কোথায় না খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি!

তোমার এই বুদ্ধি আর সাহস দেখিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইতেছে। হ্যাঁ, আমার মতন বুদ্ধি, বিদ্যা এবং সাহস পাইয়াছ!

একবার মনে করিয়াছিলাম, তোমার পরিচয় দিয়া তোমাকে কাড়িয়া

আনি। তার পর মাথায় সুবুদ্ধি জাগিল! ভাবিলাম, না, একে আমার দুরবস্থা চলিয়াছে—তোমাকে লইয়া কোথায় যাইব? তার উপর যদি তুমি আমার কথা না শোনো, আমার যে-দুর্দ্দশা, সেই দুর্দ্দশা থাকিয়া যাইবে দুর্দ্দশা কখনো ঘুচিবে না। তার চেয়ে বিবাহ হইয়া যাক—বড়লোকের নাৎনী, বড়লোকের বৌ—তখন তুমি আমার হাতের মুঠায় থাকিবে। আমারো আর কোনো দুর্দ্দশা থাকিবে না। এই কথা ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

আজ চিঠি লিখিতেছি, তার কারণ, তুমি এলাহাবাদে চলিয়াছ, তাই তোমাকে জানাইয়া দিলাম, আমি আছি! বাঁচিয়া আছি এবং তোমাকে পাইয়াছি! আমার দুর্দ্দশার একশেষ! একটা মোটরের কারখানায় তেল-কালি মাখিয়া মিস্ত্রীর কাজ করিতেছি। মাহিনা পাই মাসে পঁচিশ টাকা। কষ্টের সীমা নাই। তুমি এত টাকার মালিক, আর আমি কি-দুঃখে তেল-কালি মাখিয়া কষ্ট সহিব, বলিতে পারো?

এখন আমি কি করিব জানিতে চাই— তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে যাইব? না, আমার জন্য ভালো রকম মাসহরার ব্যবস্থা করিবে?

আমার ঠিকানা ১২ নম্বর রাশু হালদার লেন, কালীঘাট। এই ঠিকানায় কাল সকালে যেন তোমার চিঠি পাই। না পাইলে ষ্টেশনে যাইব। ইতি

আশীর্ব্বাদক তোমার পিতা

শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী

বীণার পায়ের তলায় পৃথিবী দুলিয়া উঠিল! দিনের আলোর

উপর কে যেন কালো পর্দ্দা ঢাকিয়া দিল! চারিদিকে জমাট অন্ধকার!

বীণার মনে হইল, এ অন্ধকারে সে পৃথিবী ছাড়িয়া কোন্ অন্ধ পাতালে পড়িয়া গিয়াছে! চেতনাও যেন লোপ পাইয়াছে!...

চেতনার উন্মেষ হইলে সে দেখে, অন্ধকার সরিয়া আবার দিনের আলো এবং তার হাতে চিঠি!

চিঠি তাহা হইলে সত্য! শ্রীপতি তার দেখা পাইয়াছে এবং তুর্জ্জয় নিয়তির মতো আবার তাকে সে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে চায়!

হায় রে, সে ভাবিতেছিল, এত দিন পরে পুরানো সব-কিছু ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিবে! এখানে আসিয়া বেশ ছিল...কিন্তু যে দিন সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে শ্রীপতিকে দেখিয়াছিল চকিতের মতো, সে-দিন হইতে অতীতকে অবলম্বন করিয়া মনে আতঙ্ক-বাষ্প আবার উদয় হইয়াছে! এত-বড় সহর.. কোথায় কখন্ থাকিবে শ্রীপতি, যদি তাকে দেখে...দেখিয়া কি করিবে, এই ভয়ে সারাক্ষণ সে কাঠ হইয়া থাকিত! সে-ভয় এমন যে তারাচরণ রায়ের স্নেহের কূলে বসিয়াও সারাক্ষণ মনে হইত, এ কূলটুকু বিপদের পারাবারে যদি ডুবিয়া যায়, সে তখন কোথায় থাকিবে! শুধু থাকা-যাওয়ার কথা নয়... এই তারাচরণ রায় সব হারাইয়া, সব চুকাইয়া বসিয়াছিলেন! মিথ্যার জোড়া-তালি দিয়া তাঁর সেই হারানো-চুকানোর উপর বীণা তাঁর বুকখানাকে আবার যে-ভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে...বীণার এ মিথ্যা ছলনা জানিতে পারিলে ব্যথা আরো কত-গুণ হইয়া তাঁর বুকে বাজিবে!

সে ব্যথায় বিধুর-চিত্ত তারাচরণ রায় যদি বলেন, তোর কাছে কোনো অপরাধ করি নাই তো, কেন তুই এত-বড় মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইয়া আমার সঙ্গে এ-প্রতারণা কেন করিলি ?

নিজের নৈরাশ্য, নিজের সর্ব্বনাশের ব্যথার চেয়ে বৃদ্ধ তারাচরণের ব্যথা অনেকখানি তীব্র গভীর হইয়া বীণার বুকে বিঁধিতে লাগিল—হাজার-হাজার তীক্ষ্ণ তীরের মতো···

বাহিরে পৃথিবী তার নির্বিকার গতিতে ঘুরিয়া চলিয়াছে···পত্র-পল্লবের গায়ের উপর হইতে রৌদ্র-কিরণ ঐ সরিয়া-সরিয়া চলিয়াছে···পথে লোকজনের কলরবে শ্রান্তির সুর মিশিতে সুরু করিয়াছে···আকাশের বুকে যে-সব পাখী এতক্ষণ নিশ্চিন্ত-মনে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তারা আবার এই মাটীর পৃথিবীর পানে, পৃথিবীর গাছপালার পানে ফিরিয়া চাহিতেছে···

অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসিলেও জীবনের স্পন্দন ঠিক আছে···সে স্পন্দন থামিবার কোনো লক্ষণ কোনো দিকে নাই। সে-ই শুধু নিস্পন্দ কাঠের পুতুল! কি করিবে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই! যে-অপরাধ করিয়াছে, এখন আর তা সংশোধন করিবার উপায় নাই, সাহসও নাই!

ওদিক্ হইতে কিরণের কণ্ঠে আহ্বান শোনা গেল—সলিলা··· সলিলা···

সর্ব্বনাশ! কিরণ যদি জানিতে পারে? আর স্বর্ণদ্যুতি?

এ-দুদিনে স্বর্ণদ্যুতির কাছে কি স্নেহ, কি প্রীতি সে পাইয়াছে! ইহাকেই বলে ভালোবাসা?···গল্পে-উপন্যাসে যে-ভালোবাসার কথা

পড়িয়া বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া থাকিত···যে-ভালোবাসা নিজেকে ভুলিয়া প্রিয়জনের তৃপ্তি চায়···

এ ছলনার কথা শুনিলে স্বর্ণদ্যুতি কি বলিবে? সে কি করিবে?

বীণার দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কিরণ আবার ডাকিল—সলিলা···অ···সলিল···

স্বর এই দিকে আসিতেছে···

চিঠিখানা চট্ করিয়া সেমিজের ফাঁকের মধ্য দিয়া বুকে গুঁজিয়া বীণা আসিয়া দাঁড়াইল সামনের ছোট ছাদে।

কিরণ ছাদে আসিল। কহিল—খুব মেয়ে যা হোক! বরের জন্য মন কেমন করছে বুঝি? তাই ও-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এখানে তারি প্রতীক্ষা-রত!

কষ্টে নিশ্বাস চাপিয়া বীণা চাহিল কিরণের পানে।

কিরণ দেখিল, বীণার দুই চোখে জল!

মমতা হইল। কাছে আসিয়া বীণাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল—কাঁদছিস্?

এ প্রশ্নে বীণা একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল!

কিরণ বলিল—আমারো কান্না পাচ্ছে সলিলা···যত দিন দেখিনি, দুঃখ ছিল না ভাই। দেখা হয়ে জানাশুনা হয়ে এ কি যাতনা, বল তো? তোর যেমন, আমারো তেমনি!

একটা নিশ্বাস···নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণ বলিল—তোর তবু একটা সান্ত্বনা এই যে, বরের সঙ্গে যাচ্ছিস্। নতুন বন্ধু, নতুন ভালোবাসা

নতুন জায়গা, নতুন ঘর! সেই যে গান আছে···সে-গানটা কাল থেকে আমার মনে গেঁথে আছে!

যে যায়···চলে যায়···
যারা থাকে,—
তাদের মতন সে কি ব্যথা পায়?
যে যায়,—সে যায় নব-নব বিশ্বে
নূতন প্রীতির কূলে···নূতন নূতন দৃশ্যে···

কিন্তু না, কাঁদিস্‌নে ভাই·· দাদু ওদিকে গুম্ হয়ে আছে! দাদুকে কি বললুম, জানিস? বললুম, চলো দাদু, আমরা তিন জনে একটু বেড়িয়ে আসি···মাঠ ঘুরে, গঙ্গার ধার ঘুরে, লেক ঘুরে একবার তোর বরের বাড়ীতেও যাবো। তার পর এখানে ফিরবো···কেমন?

বাহিরে? বাহিরে সেই পথ? বীণা শিহরিয়া উঠিল! কে জানে, বাহিরে ঐ পথের উপর হয়তো দাঁড়াইয়া আছে সেই দুর্বৃত্ত শ্রীপতি···

ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বীণা বলিল—আমার কিছু ভালো লাগছে না কিরণ। আমি কোথাও যাবো না। তার চেয়ে আমরা তিন জনে যদি চুপ করে ঘরে বসে থাকি আজ? সে-ঘরে আর কেউ আসবে না···শুধু আমরা তিন জনে থাকবো!

কিরণ কহিল—বেশ। দাদুকে তাই বলি। এসো সলিলা, দাদুর সঙ্গে গল্প করবে। দাদু ডাকছে।

বীণাকে লইয়া কিরণ আসিল তারাচরণের কাছে···বলিল—না দাদু, কোথাও যাবো না। সলিলা কাঁদছিল। সলিলা বলছে, তিন জনে শুধু এক-ঘরে চুপ করে বসে থাকবো···সে-ঘরে আজ আর কেউ আসবে না।

এ-কথায় বীণার মনের গভীর দুঃখের আভাস পাইয়া তারাচরণ রায় ব্যথাতুর হইলেন। তিনি বলিলেন—তাই হবে দিদি। এসো তুমি আমার কাছে…

সন্ধ্যার পর স্বর্ণদ্যুতি আসিয়া দেখা দিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—মনে করো না দাদু, এ-কালের ছেলে বলে আমি খুব নির্লজ্জ…

এ কথার অর্থ না বুঝিয়া তারাচরণ রায় স্বর্ণদ্যুতির পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিরণ বলিল,—বুঝতে পারছেন না দাদু, ভূমিকা করছেন! এর পরেই প্রথম পরিচ্ছেদে হবে সলিলাকে নিয়ে একবার বেরুবো! তার পর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওঁদের বাড়ীতে সলিলাকে নিয়ে ওঁর বাসর-জাগরণ!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—এ-কালের ছেলেদের চেয়ে এ-কালের মেয়েদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ—এ-কথা ভেবে অহঙ্কার বোধ করলেও কথাটা সত্য নয়!

কিরণ বলিল,—তার মানে?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—তার মানে, আপনি পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণে মস্ত ভুল করছেন! আমি বলছিলুম, আমি নিজে যেচে এখানে আপনাদের সঙ্গে কুটুম্বিতে করতে আসিনি! মা আমাকে পাঠিয়ে দিলে। বললে, বুড়ো দাদামশায় কত দিন তোদের দু'জনকে কাছে পাবেন না—আজ তোরা দু'জনে অর্থাৎ আমি এবং আমার এই নবোঢ়া বধূ সলিলা…আমরা এইখানে দাদুর কাছে থাকবো। আপনার যদি আপত্তি না থাকে,

তা হলে সখী সেজে আমাদের সে-বাসরে বা আসরে গান গাইতে পারেন।

দু'জনে দেখা হলো মধু-যামিনী রে।

ভ্রূভঙ্গী-সহকারে কিরণ বলিল,—আস্পর্দ্ধার কথা শুনচো দাদু! ওঁরা যেন থিয়েটারের সেই হুসেন-মর্জ্জিনা...ওঁরা বসবেন সিংহাসনে আর আমি ঘাগ্‌রা-পরা বাঁদী নীচেয় দাঁড়িয়ে গান গাইবো, চাঁদ-চকোরে অধরে-অধরে পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে!...বয়ে গেছে আমার থাকতে! ওঁরা কাল মজা করে চলে যাবেন, আর আমরা ওঁদের সে-মজাকে আরো জম্‌জমাট করে তুল্‌বো! বটে! আমি সে বান্দা নই মশাই!

এই কৌতুক-হাস্য-কলরবে বীণার মনের উপর হইতে পাথরের ভার যেন সরিয়া যাইতেছিল! বীণা ভাবিল, কোনো মতে যদি কালিকার রাত্রি পর্য্যন্ত সময়টুকু নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে একদিন সুবিধা করিয়া স্বর্ণদ্যুতিকে সব কথা সে খুলিয়া বলিবে। এখনি একদিন নয়! সে-একদিন অনেক দিন পরে...স্বর্ণদ্যুতি যখন বীণার মনের পরিচয় পাইবে...সম্পূর্ণ পরিচয়...তখন! তার পর বলিবে দাদুকে!

অনেক দিন পরে সে-একদিন কবে আসিবে ঠাকুর?

স্বর্ণদ্যুতিকে পাশে পাইয়া রাত্রিটা কোনো মতে কাটিয়া গেল। চোখে ঘুম নাই। কত কথা মনে হয়! সেই সঙ্গে ভয়-সংশয় আশা-নিরাশা...

পরের দিনটাও ভয়ে-ভয়ে কাটিল। ডাকে যদি আবার একখানা চিঠি আসে?

কিম্বা সশরীরে শ্রীপতি আসিয়া যদি দাদুর সঙ্গে দেখা করে?

কিন্তু চিঠি আসিল না! শ্রীপতিও আসিয়াছে বলিয়া জানা গেল না।

সন্ধ্যার পর তাড়া-হুড়া···বিষম কোলাহল। তার পর ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করিয়া গাড়ী···

গাড়ীতে বসিয়া বীণা ভয়ে ভয়ে-সবার অলক্ষ্যে পথের পানে চাহিল। না, শ্রীপতি নাই!

ষ্টেশন।

সেকণ্ড-ক্লাশ কামরা। ছোট কুপে। দু'খানি মাত্র বার্থ। সে দু'খানির একটায় সে থাকিবে, অপরটিতে স্বর্ণদ্যুতি।

তারাচরণ রায় বীণাকে ছাড়িতে চান না! গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। স্বর্ণদ্যুতি প্লাটফর্ম্মে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে কথা কহিতেছিল।

বাঁশী বাজিল। এবার গাড়ী ছাড়িবে।

তারাচরণ কহিলেন,—আসি দিদি।

তিনি নামিলেন। স্বর্ণদ্যুতি গাড়ীতে উঠিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন,—পৌঁছেই টেলিগ্রাম করো দাদা। সামনের হপ্তাতেই দেখো, তোমাদের হনি-মুনে এই বুড়ো দাদু রাহুর মতো গিয়ে উদয় হবে!

হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—সে-ভয় দেখাবেন না দাদু। আপনি গেলে আমাদের হানি-মুল ষোল-কলায় পরিপূর্ণ হবে!

গাড়ী চলিতেছে। বীণা জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আছে। ঐ দাদু···

কিন্তু একটু দূরে...ঠাকুর, ঠাকুর···ও যে শ্রীপতি! এখানে আসিয়াছে

২৭

বীণার এত আশায়-রচা স্বপ্ন-প্রাসাদ যেন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল! কি না সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল...

ভাবিয়াছিল, গোপনতা ছাড়িয়া ছলনার এ-কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে। বলিবার ফলে তার ভাগ্যে যা ঘটে, যত কঠিন দণ্ডই হোক, সে-দণ্ড সে মাথা পাতিয়া লইবে! এজন্য তাকে যদি সব ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাসনে যাইতে হয়, তবু মনের মধ্যে এ বিষ সে আর চাপিয়া রাখিবে না!...

এখন ভাবিতেছিল, নিমেষের এ খেয়াল তার কেন হইয়াছিল? বেচারী! বোঝে নাই, পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে কত জটিলতা, সে-সম্পর্ক রক্ষা করিতে কত দিকে কত শৃঙ্খল বাজে!

ট্রেণ চলিয়াছে।

বার্থের গদি-মোড়া আসনে ঠেশ দিয়া বীণা বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে। দু'চোখের উপর আর্দ্র বাষ্প প্রতিক্ষণে পুঞ্জিত হইতেছে! সে ভাবিতেছে, ট্রেণ তো চলিয়া আসিল...কিন্তু শ্রীপতি?

নিশ্চয় সে দাদুর কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে!

তার মতো লোকের যে কিছু বাধে না, বীণা তা বোঝে! তার এ-বলায় সেখানে এখন কি যে ঘটিতেছে—হয়তো বৃদ্ধ তারাচরণ রায় এত-বড় মিথ্যার আঘাত সহিতে না পারিয়া...

বুকের মধ্যে রাজ্যের নিশ্বাস ফুলিয়া-ফুঁশিয়া এমন হইল যে প্রাণটা বুঝি সে-নিশ্বাসের চাপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে!

স্বর্ণদ্যুতি ও-দিকে জিনিষপত্র গুছাইয়া বেডিং খুলিয়া বলিল,—একবার ওঠো, তোমার বিছানাটা পেতে দি। তার পর শুয়ে পড়ো! জানি, তোমার মন ব্যথায় ভরে আছে! শুয়ে-শুয়ে দাদুর কথা ভাবো। ভাবতে ভাবতে ঘুম আসবে'খন...

এ স্বরে কতখানি আদর...কি গভীর স্নেহ! ক'দিনে স্বর্ণদ্যুতির যে-পরিচয় বীণা পাইয়াছে..

স্বর্ণদ্যুতির কথায় বীণা উঠিল!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—দাঁড়িয়ে থেকো না! তুমি এ বার্থে বসো...

বীণা নিঃশব্দে এ আদেশ পালন করিল; বার্থে বসিল। বুঝিল, স্বর্ণদ্যুতি কার জন্য এ শয্যা বিছাইতেছে। মনে হইল, তার উচিত, নিজের হাতে শুধু তার শয্যা নয়, স্বর্ণদ্যুতির শয্যাও রচনা করা...

কিন্তু নিজের হীনতার লজ্জায়, অনধিকারিত্বের গ্লানিতে তার হাত-পা যেন নিস্পন্দ অসাড়! কথা কহিবে, সে শক্তিও যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! চুপচাপ সে সামনের বার্থে বসিয়া রহিল; এবং স্বর্ণদ্যুতি তার জন্য শয্যা রচনা করিতে লাগিল।

শয্যা বিছানো হইলে স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—শুয়ে পড়ো...বুঝলে!

দু'চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি···বীণা আবার উঠিয়া দাঁড়াইল···

স্বর্ণদ্যুতি নিজের বিছানার ষ্ট্রাপ খুলিতে লাগিল। বীণা কোনো মতে কথা কহিল, বলিল,—আমি বিছানা পেতে দি···

হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—না। কাল থেকে তুমি সংসারের চার্জ্জ নিয়ো। আজ তোমার অভ্যর্থনার ভার আমার থাক্। তোমাকে এতদিনকার স্নেহ-শৃঙ্খল ছিঁড়ে দূরে নিয়ে যাচ্ছি নিজের স্বার্থে—এ তুমি যেমন বুঝছো, আমিও তেমনি বুঝছি, সলিলা···

এ-কথায় বীণার মনের ভিতরে যে-জায়গাটা গ্লানির বেদনায় একেবারে আর্ত্ত-আতুর হইয়া আছে, সে-জায়গাটা যেন ভাঙ্গিয়া মচকাইয়া গেল। বীণা কোনো কথা বলিতে পারিল না। বার্থের বিছানায় নিস্পন্দ বসিয়া কামরার খোলা জানলা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে ঘন-ঘোর অন্ধকার। মাঝে-মাঝে আলোর চমক! আলোর ও-চমক দেখিয়া বীণা ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে! মনে হয়, ও-আলো যেন শ্রীপতির উল্লাসের হাস্যদীপ্তি।

গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়িল।

স্বর্ণদ্যুতির হাতে ছিল একখানা বই। বইখানা রাখিয়া সে বলিল—শুয়ে পড়া যাক...কি বলো?

স্বর্ণদ্যুতি শুইয়া পড়িল। বীণা তেমনি বসিয়া আছে। স্বর্ণদ্যুতি বলিল—শোও, সলিলা।

বীণা বলিল—আমি পরে শোবো...

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আমি কামরা লক্ করে দিয়েছি। রাত হয়েছে· মিথ্যা কেন জেগে বসে থাকবে? অন্ধকারে কি-বা দেখবে?

স্বর্ণদ্যুতি উঠিল, বীণার পাশে আসিয়া বসিল। বলিল,—বড্ড মন কেমন করছে...না?

বীণা কোনো কথা কহিল না—চোখে জল একেবারে ছাপাইয়া উঠিল!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—এ ঘটনা সব মেয়ের জীবনে ঘটে, সলিলা। শকুন্তলা যখন পতিগৃহে যাত্রা করেছিলেন···সে তবু তপোবন থেকে রাজাধিরাজের অন্তঃপুরে মহারাণী হতে যাচ্ছিলেন! তিনিও দুঃখে-বেদনায় অভিভূত হয়েছিলেন! এর যে উপায় নেই!···শুয়ে পড়ো, লক্ষ্মীটি। বলো তো, গল্প করি···কি বলো?

গল্প? বীণার পৃথিবীতে কিছু কি আর আছে···কিসের গল্প শুনিবে সে? তার পৃথিবী জুড়িয়া এখন শুধু ঐ এক দারুণ বিভীষিকা!

বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে বীণা কহিল—না, আমি শুচ্ছি। তুমিও শোও···

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—খুব ভালো কথা! কাল সকাল থেকে আমাদের নব-জীবন নব-জাগরণ! কাল থেকে আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় সুরু! সে অভিনয় শুভ হোক, শিব হোক...

মনে মনে বীণা বলিল, তা কি হইবে? তার জীবনের সব বুঝি শেষ হইয়া গেল!

এলাহাবাদে নিজের নীড়ে আসিয়াও বীণা প্রাণপণে মনের সঙ্গে যুঝিতে লাগিল...কোনো দিন যদি তার এ গৃহে বজ্রপাত হয়, সে-দিন

যা হয় করিবে···তাই বলিয়া তার আগে বজ্রপাতের আশঙ্কা লইয়া চারিদিকে এমন অশান্তি, এতখানি দুঃখ কেন রচনা করে!

অফিসের কাজ-কর্ম্মে স্বর্ণদ্যুতিকে প্রথম-প্রথম অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তরুণ উৎসাহী লোক পাইয়া অফিসের সাহেব নানা কাজে স্বর্ণদ্যুতিকে খাটাইয়া লয়। মফঃস্বলের দু'চারিটা অফিসের হিসাবের গরমিল মিলাইয়া পরখ করিবার জন্য পাঠায়, বলে—মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ইউ উইল বী প্লীজ্‌ড টু·· এ্যাণ্ড আই উড বী সো গ্রেটফুল···

মৃদু হাসিয়া স্বর্ণদ্যুতি বলে,—অল্ রাইট···

স্বর্ণদ্যুতি বাহিরে যায়। বীণা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, এবারে মনের সঙ্গে ঠিক বোঝাপড়া করিয়া লইবে।

স্বর্ণদ্যুতি ফিরিয়া আসে, বীণার বুক কাঁপে! স্বর্ণদ্যুতি আসিবামাত্র মনের আগ্রহ লইয়া ছুটিয়া তার সঙ্গে গিয়া সে দেখা করিতে পারে না। ভয় হয়, কি জানি, বাহিরে কোথাও যদি ইতিমধ্যে শ্রীপতির সঙ্গে দেখা হইয়া থাকে? যদি সে সাক্ষাতে উঁহার কাছে বীণার সব কথা সে বলিয়া থাকে? স্বর্ণদ্যুতি গৃহে ফিরিলে বীণা নেপথ্যান্তরালে থাকিয়া ভয়ে-ভয়ে তাকে লক্ষ্য করে! দেখে, স্বর্ণদ্যুতির মনে কোনো ভাবান্তর? মুখ গম্ভীর···মূর্ত্তি রুক্ষ?

যখন দেখে, তা নাই, তখন মলিন-হাসি মুখে লইয়া সে সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—আমি ও-দিকে ছিলুম···

স্বর্ণদ্যুতি তার পানে তাকায়, তাকাইয়া বলে—বিরহ-তপঃক্লিষ্টা মলিন তোমার মূর্ত্তি···

এবং কথার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণদ্যুতির আদর-উচ্ছ্বাসের সমারোহ!

সে-আদরে বীণার দুই চোখ বুজিয়া আসে···জগৎ-সংসার, শ্রীপতি·বীণা···সব ভুলিয়া মন কোন্ অদৃশ্য-লোকে উধাও হইয়া যায়!

তার পর দু'জনে ফিরিয়া আসে আবার এই কঠিন মর্ত্ত্যলোকে! তখন এই মর্ত্ত্যলোক লইয়া দু'জনের নানা কথা···

স্বর্ণদ্যুতি বলে,—দাদুর চিঠি পেয়েছো?

বীণা জবাব দেয়,—পেয়েছি···

স্বর্ণদ্যুতি বলে,—কি লিখেছেন? কবে আসবেন, তার কোনো আভাস?

বীণা বলে—না। লিখেছেন, নানা কাজে সময় হচ্ছে না···যেমন একটু সময় পাবেন, অমনি এখানে আসবেন···একেবারে কোন খপর না দিয়ে!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—হুঁ!···বিদেশে বসে তোমার কথাই ভাবতুম, সলিলা···

সলিলা-নামে বীণার বুকখানা ধড়াস করিয়া ওঠে! মুখ আপনা হইতে আনত হয়···সে-মুখে কথা ফোটে না! মনের মধ্যে আতঙ্ক···ভয়···দ্বিধা···সংশয়!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—কি কথা ভাবতুম, জানো?

বীণা মুখ তুলিতে পারে না···বুকের মধ্যে ফৌজে-টানা কামানের গাড়ী চলিতে থাকে!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—মুখ তুলে আমার পানে চাও···তবে তো কথা বলবো!

বীণা মুখ তোলে···

স্বর্ণদ্যুতি বলে,—এখনো আমাকে তোমার এত লজ্জা, ওগো মৌনবতী নব-বধূ···

বীণা কষ্টে নিশ্বাস চাপে।

স্বর্ণদ্যুতি বলে,—বলো দিকিনি কি কথা?

কোনো মতে বীণা বলে,—কি?

নিজের কণ্ঠের এই অতি-ক্ষীণ কম্পিত স্বর শুনিয়া বীণা চমকিয়া ওঠে! এ তারি কথা না কি?

স্বর্ণদ্যুতি বলে—নিরীহ বেচারী বৃদ্ধ তারাচরণ রায়! সারা জীবন কত ব্যথা সয়ে তোমাকে পেয়ে সে ব্যথা একটু ভুলেছিলেন···আর আমি দুর্বৃত্ত দস্যুর মতো তোমাকে তাঁর বুক থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে এলুম! ভাবি, তাঁকে যে এ-দুঃখ দিলুম, সে-জন্য আমাকে এক দিন কঠিন প্রায়শ্চিত্ত না ভোগ করতে হয়!

এ কি কথা! এ-কথা বীণার বুকে তীরের মতো বেঁধে!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—তোমার এই মলিন মুখ···তোমার চোখের পিছনে সব-সময়ে আমি যেন জমাট অশ্রুর ছায়া দেখি।···সত্যি সলিলা, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে, দাদুর অদর্শনে···না? যাবে তুমি দাদুর কাছে?

বীণার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে। বীণা বলে,—না, না, তা নয়!

স্বর্ণদ্যুতি বলে—তবে কেন তুমি এমন মলিন-মুখে থাকো?···আমি মাঝে-মাঝে চলে যাই বলে?

এ কথায় বীণা যেন অকূল সমুদ্রে কূল পায়! তাড়াতাড়ি এই কথার কূলটুকুকে আশ্রয় করিয়া বীণা বলে—হ্যাঁ···

কথার সঙ্গে-সঙ্গে তার দেহ দুলিয়া ওঠে···

দুই বাহুর বাঁধনে আবদ্ধ করিয়া স্বর্ণদ্যুতি তাকে বুকে চাপিয়া ধরে। স্বর্ণদ্যুতির বুকে মুখ রাখিয়া বীণা দু'চোখে অশ্রুর উৎস একেবারে খুলিয়া দেয়...

প্রায় এমন ঘটে—

সে-বার স্বর্ণদ্যুতি বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—চলো, আমরা চুণার ঘুরে আসি...তোমার পিশিমার ওখানে যাই। তিনি অত করে লিখছেন...আমরাও তাঁকে কথা দিয়েছি যখন...যাবে?

বীণা বলিল,—চলো...

দু'জনে আসিল ঊষাঙ্গিনীর কাছে।

রেলওয়ে-কোয়ার্টার্স। পাশাপাশি ক'ঘর বাঙালী পরিবারের বাস। সকলে মিলিয়া-মিশিয়া যেন অখণ্ড একটি সুবৃহৎ পরিবার গড়িয়া তুলিয়াছে। একজনের গৃহে উৎসবের আয়োজন হইলে সেখানেও যেমন সকলের ডাক পড়ে, তেমনি এক পরিবারের ব্যথা-বেদনাও সকল পরিবার সমান ভাবে বুকে তুলিয়া লয়?

চুণারে দু'দিন হাস্য-কলরবে কাটাইয়া আবার এলাহাবাদে প্রত্যাগমন।

যে-দিন চলিয়া আসিবে, ঊষাঙ্গিনী বলিল,—বাবা আসছেন দু-এক দিনের মধ্যে...এ-দিকে তাঁর কি কাজ আছে। আজ চিঠি পেলুম।

বীণা বলিল—চুণারে আস্‌ছেন?

—হ্যাঁ।

—একা?

—চিঠিতে তাই লিখেছেন।

বীণার মনে হইল, একবার তিনকড়িকে পাইলে যেন ভালো হয়! ঐ তিনকড়ি গাঙ্গুলির হাত ধরিয়া সে এ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে! যদি এখন তিনু দাদুকে পায়, তাহা হইলে মন খুলিয়া নিজের এ-দুঃসাহসের কথা, এ-অনধিকারের কথা, বুকে এই যে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে— সে-সব কথা সে খুলিয়া বলে···বলিয়া পরামর্শ চায়, বীণা এখন কি করিবে?

আর সে পারে না! এত স্নেহ, এত প্রীতি-ভালোবাসা···নিজের হীনতায় প্রতিক্ষণে মন যা হইয়া আছে···না পারে কিছু দিতে! না পারে কারো কাছ হইতে কিছু লইতে! স্নেহ-পারাবারের তীরে বসিয়াও তার মন যেন দুঃখী-কাঙালের অধম হইয়া আছে···

মনে হইতেছে, যাঁকে তার এ দুঃসাহসিকতা এতটুকু আঘাত দেয় নাই, এমন দরদী বন্ধু পাইলে তার কাছে সব কথা বলিয়া আশ্রয় চাহিবে ···তাঁর কাছে কাঁদিতে পাইলে বীণা যেন বাঁচিয়া যাইবে!

যে চরম দুর্দ্দিনের আশঙ্কা সর্ব্বক্ষণ সমুদ্যত রহিয়াছে, সে দুর্দ্দিন সমাগত হইলে কোথায় কার মুখ চাহিয়া সে দাঁড়াইবে? কে বুঝিবে, ঐশ্বর্য্যের লোভে, বিলাসের লালসায় বীণা এত বড় পাপ করে নাই?

২৮

আরো দু'তিন মাস পরের কথা।

মনকে বীণা অনেকখানি শান্ত করিয়া আনিয়াছে। এত দিনেও যখন তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের বিন্দু উদয় হয় নাই, তখন মনে হয়, শ্রীপতি হয়তো ভয় পাইয়া সরিয়া গিয়াছে…হয়তো তার মনে করুণার সঞ্চার হইয়াছে…হয়তো শ্রীপতি ভাবিয়াছে, নূতন-জীবনে যদি বীণা সুখী হইয়া থাকে, তার সে-সুখে নাই বা বাদ সাধিলাম!

শয়নে স্বপনে সে ঠাকুর-দেবতার পায়ে মিনতি জানায়—ঠাকুর, শ্রীপতির মনে দয়া-মায়া সঞ্চারিত করো…তাকে সুবুদ্ধি দাও, ঠাকুর!

কিন্তু এমন করিয়া বাঁচাও যায় না! ইহার চেয়ে সত্য প্রকাশ হোক, এবং তার ফলে দণ্ডমুণ্ড বা মার্জ্জনা…যা হয় একটা ফয়শালা হোক! তাহাতে যেন ঢের স্বস্তি! অনেকখানি শান্তি!

দাদু চিঠি লেখেন। সে-চিঠিতে বীণার জন্য তেমনি অধীর আবেগ …'সলিলা-দিদিকে দেখিবার জন্য মনে কতখানি ব্যাকুলতা'…তার পর নানা কারণে আসিতে গিয়াও আসা হইতেছে না বলিয়া দুঃখ-প্রকাশ!

বীণা ভাবে, সে যেন সেই কবিতায়-পড়া পদ্মপত্রে জলের বিন্দু! কখন ঝরিয়া পড়িবে, ঠিক নাই!

এ-জন্য কতবার তার মনে হইয়াছে, আজ নয়···কাল···কাল নিশ্চয় স্বর্ণদ্যুতির কাছে সব কথা খুলিয়া বলিবে !, এত ভালোবাসা···সে-ভালোবাসা গড়িয়া উঠিয়াছে কি তারাচরণ রায়ের দৌহিত্রীকে লইয়া ? তার নিজের কিছু নাই···যা দিয়া স্বর্ণদ্যুতির এ-ভালোবাসাকে সে ধরিয়া রাখিতে পারে ? স্বর্ণদ্যুতি কি তাকে ভালোবাসে তার এই তারাচরণের দৌহিত্রী পরিচয়ে ? যদি তাই হয়, তাহা হইলে ছদ্মাবরণে এ-ভালোবাসা নাই বা রহিল ! সে বীণা···বীণা বলিয়া স্বর্ণদ্যুতি যদি তাকে ভালো না বাসে, তাহা হইলে এ-ভালোবাসার কোন দাম নেই ! চোর সাজিয়া এ-ভালোবাসা সে আর চায় না !

দিনের আলোয় স্নান সারিয়া মনে-মনে কত দিন সঙ্কল্প করিয়া সে নিজের কথা বলিবে বলিয়া স্বর্ণদ্যুতির সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ! স্নান করিতে করিতে মনে মনে কতবার ঠিক করিয়া লইয়াছে, কোন্‌খান হইতে সুরু করিয়া এ-কাহিনী কি করিয়া খুলিয়া বলিবে···কিন্তু বলিতে আসিয়া বলিতে পারে নাই ! নানা কারণে বলা হয় নাই···

কোনো দিন দেখিয়াছে, স্বর্ণদ্যুতির আদরের অত্যুচ্ছ্বাস...কোনো দিন বা স্বর্ণদ্যুতি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গিয়াছে !

বীণার মনে হইয়াছে, বাঁচিয়া গিয়াছে ! একটা দিন আরো প্রাণটা তবে রহিয়া গেল !

সে-দিন অফিস হইতে বেলা-ছুটোয় বাড়ী ফিরিয়া স্বর্ণদ্যুতি ডাকিল—সলিলা···

নিজের ঘরে বীণা চুপ করিয়া বসিয়াছিল···

স্বর্ণদ্যুতির আহ্বানে চমকিয়া উঠিল। এ সময়ে তো উনি বাড়ী আসেন না! হঠাৎ আজ...

শ্রীপতি আসিয়াছে না কি?

বীণা কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল! উঠিতে গিয়া উঠিতে পারিল না।

স্বর্ণদ্যুতি এ-ঘরে আসিল, বলিল,—বসে আছো যে! অসুখ করেছে না কি?

মলিন হাস্যে বীণা কহিল,—না...

—তবে?

বীণা কোনো জবাব দিল না।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—হঠাৎ এ সময় বাড়ী এলুম, তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছো... না?...

বীণা এ-কথারো জবাব দিল না...মলিন দৃষ্টিতে স্বর্ণদ্যুতির পানে চাহিয়া রহিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল,—দুঃসংবাদ আছে...

দুঃসংবাদ। বীণার বুকে যেন বাজ পড়িল! মনে হইল, আমি জানি...জানি...এ দুঃসংবাদের ভয়ে আজ ক'মাস কি করিয়া আমার রাত্রি-দিন কাটিতেছে!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—কিন্তু জানো তো যে মেঘ বন্যা আনে, সেই মেঘই আবার পৃথিবীকে শস্যশ্যামল করে! তেমনি এ দুঃসংবাদের পিছনে আছে মনোহর ইঙ্গিত!

বীণার মুক মৌন দৃষ্টি...

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আজই আমাকে একটা স্পেশাল ডেপুটেশনে

দিল্লী যেতে হবে, এনকোয়ারির জন্য। তার পর এ কাজে যদি এফিসিয়েন্সি দেখাতে পারি, তাহলে দিল্লীতে বদলি হবো···ভালো গ্রেড পাবো!···যাকে বলে, stepping stone to success···

এ কথার কি জবাব দিবে, বীণা খুঁজিয়া পাইল না। বোঝে স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর কতখানি সম্পদ-সৌভাগ্য···

কিন্তু মনে-প্রাণে এ কথাটা আজো সে গ্রহণ করিতে পারিল না। কি করিয়া পারিবে? মন্ত্র পড়িয়া বিবাহ···আগে মনে হইত, বিবাহ হইয়া গেলে কোনো দুর্ভাগ্যের ভয় থাকিবে না! মনে হইত, স্বামীর ভালোবাসা পাইয়াছি, স্ত্রী···শ্রীপতিকে কিসের ভয়? বিবাহ তো মিথ্যা হইবে না! এখন মনে হয়, এ ভালোবাসা যদি নিজের দাবীতে পাইত, তবেই শুধু···নহিলে, এ যেন সেই সলিলার উপর ভালোবাসা···সে বীণা বলিয়া লোকে তাকে ভালোবাসে না! যে-দিন সকলে জানিবে, সে সলিলা নয়, বীণা,···সে-দিন এ ভালোবাসা আকাশ-কুসুমের মালার মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে!

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—অফিসের সাহেব কি বললে, জান? বললে, তোমাদের দেশে কথা আছে, স্ত্রী-ভাগ্যে সম্পদ! তোমার নূতন স্ত্রীর ভাগ্যে তোমার কর্তৃপক্ষের এমন সুনজর পড়িয়াছে···এই স্ত্রীর ভাগ্যে এক দিন তুমি বড় অফিসার হইবে!

কথাটা বলিয়া স্বর্ণদ্যুতি আবেগাতিশয্যে বীণাকে বক্ষ-লগ্ন করিয়া তার সলজ্জ অধরে···

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—তুমি বলবে, আমি স্বার্থপর···তোমাকে এখানে এনে একা রেখে দিব্যি মজা করে বেড়াচ্ছি! আমারো কষ্ট হচ্ছে, সত্যি!

একবার ভাবছি, তোমায় যদি সঙ্গে নিয়ে যাই! আবার মনে হয়, আমি ঘুরে বেড়াবো, সেখানেও তুমি সেই একা থাকবে! তার চেয়ে এখানে তোমার ঘর, তোমার সংসার...এইখানেই থাকো! এখানে দু'জনের সুখের মধুময় স্মৃতি...এ স্মৃতিকুঞ্জে একটু তবু আরাম পাবে তুমি! রোজ একখানা করে চিঠি লিখবো...সত্যি। তুমিও লিখবে। যা মনে আসে, লিখবে...বুঝলে! যদি ছাখো, সামনের ঐ গাছের পাতা ঝরে যাচ্ছে, তাও লিখো। তোমার সে-লেখায় তোমাকে আমি কাছে-কাছে পাবো, বুঝলে!

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাস্যে বীণা জানাইল, বুঝিয়াছে!

তার পর বাঁধা-ছাঁদা যাত্রার আয়োজন। অফিসের আর্দ্দালী, আসিয়াছিল...

বীণা বলিল—এখান থেকে তুমি মংরুকে নিয়ে যাও...তোমার কাজ-কর্ম্ম করবে।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—না, না...মংরু এখানে তোমার মস্ত সহায় থাকবে। ওকে নিয়ে গেলে তোমার অসুবিধা হবে।

বীণা বলিল—আমার আবার কিসের অসুবিধা?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—আমার কি ভাবনা হয়, জানো? যদি তোমার অসুখ-বিসুখ হয়? সত্যি সলিলা, ঐটেই আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা...

বীণা বলিল—এত দিন আছি, কোনো দিন আমার মাথা ধরেছে দেখেছো?

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—তা ধরেনি...কিন্তু কোনো দিন মাথা ধরেনি বলে

আমার কিন্তু তোমার জন্য মন সর্ব্বদা আকুল হইয়া আছে। রোজ সকালে মনে হয় আজ দাদু আসিবে। কিন্তু আসো না। ক'বার লিখিলে, শীঘ্র এবার এলাহাবাদে যাইব। সে শীঘ্র ক'বছর পরে...

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছে, এমন সময় মনের উপরে সেই শ্রীপতি! কে জানে, হয়তো শ্রীপতির মুখে তার পরিচয় শুনিয়া দাদু এখানে আসিবার কল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন! দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন, বিবাহ দিয়াছেন! সে জন্য মাঝে-মাঝে চিঠি না লিখিলে দুঃখ পাইবে, তাই হয়তো চিঠি-লেখা বন্ধ করেন নাই!

মনে পড়িল, এক দিন সেই মনের ঝোঁকে বীণা বলিয়াছিল, যদি আমি সলিলা না হয়ে আর কেউ হই, তা হলেও আমাকে ভালোবাসবে, দাদু?

ভয়ে-ভয়ে এ প্রশ্ন করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, উত্তরে হয়তো বুকের উপরে বজ্রাঘাত...কিম্বা...

কি কারণে এ প্রশ্নের উত্তর দিবার মতো অবসর দাদুর মিলে নাই! তার পর এ প্রশ্ন করিবার সাহসও বীণার মনে আর কখনো জাগে নাই!

হয়তো আর কোনো দিন জাগিত না! শ্রীপতির চিঠি পাইবার পর ক'দিন কি ভয়ে দিন কাটিয়াছে...তার পর এ প্রশ্ন মনের উপর হইতে মিলাইয়া যাইতেছিল! হয়তো আর উঠিত না—যদি না সে-দিন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে...

এমনি চিন্তার মধ্যে রাবেয়ার কণ্ঠ শোনা গেল,—মেম-সাহেব বাড়ী আছেন, দাই?

দাসীকে ডাকিয়া প্রশ্ন...

বীণা উঠিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিল। কহিল,—আপনি! আসুন…

রাবেয়া বলিল—ক'দিন আসবো আসবো মনে করছি, কিছুতেই সময় হয় না।…মিষ্টার রায় এখানে নেই?

বীণা বলিল—না। দিল্লী গেছেন।

রাবেয়া বলিল,—এলুম…সেতার নিয়ে আপনার বসবার একটু সুবিধা হবে?

—হবে।

বীণা যেন বাঁচিয়া গেল! একজন সঙ্গিনী! একটা কাজ। নহিলে একা থাকিয়া-থাকিয়া ভয়ে-ভাবনায় তার মন যেন মরিতে বসিয়াছে!

বীণা সেতার বাহির করিল…

একটা, দুটো, বহু রাগিণীর আলাপে অতিথিকে তৃপ্ত করিল!

বেলা প্রায় পাঁচটা…রাবেয়া বলিল,—চলুন, একটু বেড়িয়ে আসি দু'জনে।…সেই যমুনার ধার অবধি। চমৎকার জায়গা! গেছেন কখনো?

বীণা কহিল—দু'-চারবার গেছি…

রাবেয়া বলিল—চলুন, আজ চাঁদ উঠবে…দিব্যি জ্যোৎস্না-রাত্রি!

বীণা বলিল—বেশ…

রাবেয়া কহিল—তৈরী হয়ে নিন। আমি বাড়ী গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে আসি। আপনার এখানে খাওয়া-দাওয়া তো হলো বেশ।

হাসিয়া রাবেয়া বাড়ী গেল…

তার পর যমুনার ধার ঘুরিয়া দু'জনে যখন বাড়ী ফিরিল, তখন রাত্রি ন'টা বাজিয়াছে।

বীণাকে গৃহে নামাইয়া দিয়া রাবেয়া গৃহে ফিরিল ; বলিয়া গেল—সামনের রবিবারে আবার আসবো···খুব জ্বালাতন করবো। সে-দিন আমাকে সেতারের বিদ্যায় দীক্ষা দিতে হবে···

হাসিয়া বীণা বলিল—সেতারে আমার যা বিদ্যে !

রাবেয়া বলিল—ভয় নেই ! আমাকে সে-বিদ্যা শিখিয়ে দিলে গুরুমারা বিদ্যা আমার হবে না !

রাবেয়ার গাড়ী চলিয়া গেল ।

বীণা দোতলায় আসিল ।

দেউকী-দাই আসিয়া বলিল,—কলকাতা থেকে তোমার মামাবাবু এসেছেন, বৌদিদি···

দেউকী বেশ বাংলা বলে ।

দেউকীর কথায় বীণা চমকিয়া উঠিল ! মামাবাবু ? মামাবাবু আবার কে ?

বীণা বলিল,—কে মামাবাবু রে ? নাম বলেছে ?

দেউকী বলিল,—না···বাঙালী বাবু। বললেন, তোমাদের বৌমার মামাবাবু হই। বললেন, জামাইবাবু কোথায় ? হামি বন্নু—দেহাতে গেছেন।···বললেন, তোমার বৌদিদি ? হামি বন্নু—বেড়াতে গেছেন ! বললেন, কখন আসবেন ? বন্নু···সাত-আট বাজ্‌লে। তা বললেন, বেশ, আমি ঠাকুর-দর্শন করে রাত্রে আসবো। এখানে থাকেন, থাকবেন, বলে গেছেন।···একটা ছোট টাঙ্ক রেখে গেছেন···

বীণার চোখের সামনে আবার এক-রাশ অন্ধকার !

মামাবাবু ! কে মামাবাবু ?

রাবেয়ার সঙ্গে গল্পে-স্বল্পে মনটা বেশ স্বচ্ছ হাল্‌কা হইয়াছিল..., এ-কথায় সে-মনে আবার সেই পাহাড়ের বোঝা! ভাবিল, কে জানে, হয়তো সলিলার মামা...কাছে কোথাও ছিলেন! সে-মামা পশ্চিমে আজ এই জামাতার সংবাদ পাইয়া আত্মীয়তা করিতে আসিয়াছেন! যদি তাই হয়?

ভাবিল, এ আবার কি নূতন বিপদ, ঠাকুর!

দেউকী বলিল—তোমার খাবার দিতে বলি, বৌদিদি?

অন্যমনস্ক ভাবে বীণা বলিল,—বলো...

দেউকী গেল তেওয়ারীকে খাবারের কথা বলিতে...

বীণা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল...আতঙ্কে তার মন ভরিয়া উঠিল।

২৭

টেবিলের উপর স্বর্ণদ্যুতির চিঠি। বীণা চিঠি পড়িতেছিল···স্বর্ণদ্যুতি লিখিয়াছে—

তুমি এখন কি করছো, বলবো? আমার কথা ভাবছো! তোমার মনে হচ্ছে বায়ু বহে পূরবৈঁয়া—নিদ্ নাহি বিনু সেঁইয়া!

আমি thought-reading জানি, না সলিলা?

বীণার দু'চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সকলের কতখানি সরল-বিশ্বাসে বীণা কি নিষ্ঠুর আঘাত দিয়াছে! অথচ তার কাছে কেহ এতটুকু অপরাধ করে নাই!

মন বলিয়া উঠিল, এ ছলনা আর নয়! এ ছলনা শেষ করিয়া ফ্যাল্···

চিঠি রাখিয়া বীণা কাগজের প্যাড্ টানিয়া লিখিতে বসিল। লিখিল,

প্রিয়তম

কখনো তোমায় এ-নামে ডাকিনি। আজ প্রথমবার আর শেষ-বারের মতো ডাকছি—প্রিয়তম···আমার প্রিয়তম!

তুমি জানো না, কাকে তুমি তোমার বুকের আসনে রাজ-রাণী করে বসিয়েছো! আমি সলিলা নই। আমি বীণা।

বিশ্বাস করো! ওগো, আমি একবিন্দু মিথ্যা বলছি না! তোমরা বলবে, আমি যদি বীণা, তাহলে সলিলা হয়ে তোমাদের মাঝখানে এসে কেন বসলুম?

সেই কথাই তোমাকে আজ খুলে বলবো! আমার সব কথা শুনে তবে বিচার করো। ছলনার কথা শুনেই রাগে অন্ধ হয়ে আমাকে দণ্ড দিয়ো না।

আমার নাম বীণা। আমার বাবার নাম ছিল তারক হালদার। বাবা ছিলেন হুগলীর এক স্কুলে মাষ্টার। আমি তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। আমার খুব ছোট-বয়সে বাবা মারা যান। বাবার কথা মনে পড়ে না। বাবা মারা গেলে আমাকে নিয়ে আমার মা খুব বিপদে পড়লেন। মায়ের এক জ্ঞাতি-ভাই ছিলেন—আশু ঘোষাল। তিনি ছিলেন সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনের-মাষ্টার। সেই আশু-মামার ওখানে মা আমাকে নিয়ে আশ্রয় পেলেন। মা রান্নাবান্না করতেন, বাসন মাজতেন, কাঁপড় কাচতেন! অর্থাৎ মাকে পেয়ে বিনা-মাহিনায় তাঁরা পেলেন বাঁদীকে বাঁদী, রাঁধুনিকে রাঁধুনি!

সেই আশু-মামার আশ্রয়ে বাস করতো তাঁর এক সম্বন্ধী। বেকার হতভাগা শয়তান! তার নাম শ্রীপতি...

এই পর্য্যন্ত লিখিবার পর লেখা থামিয়া গেল। কলম আর চলিতে চায় না! চলিলে যে-সব কথা কলমে বাহির হইবে, সে কথার বাতাসে পৃথিবী বুঝি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে! তার বেচারী দুঃখিনী

মা! সেই মার কলঙ্কের কথা···মেয়ে হইয়া কি করিয়া মায়ের নামে কালির ছোপ্ লেপিয়া দিবে!

দু'চোখে জল···উদাস নেত্রে বীণা চাহিয়া রহিল বাহিরের পানে।

সামনে দুটো ঝাউ গাছ। বাতাসে ঝাউয়ের পাতা দুলিতেছে···চামর দুলাইয়া জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রিকে যেন অভিনন্দিত করিতেছে!

দূরে কে গান গাহিতেছিল। হিন্দী গান। গানের মর্ম্ম, তুমি আসিয়া কেন ডাকিলে না? কেন তোমার অভিমান হইল? নীরবে কেন চলিয়া গেলে?

দেউকী আসিয়া ডাকিল—বহুদি···

বীণা তার পানে চাহিল···তার চোখ যেন পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতো···

দেউকী বলিল—তেওয়ারী খাবার দেছে।

বীণা বলিল—আমি খাবো না দেউকী···

দেউকী বলিল—তুমি যে বললে খাবার দিতে···

একটা উন্নত নিশ্বাস রোধ করিয়া বীণা বলিল,—তখন বলেছিলুম। কিন্তু খিদে নেই, মনে হচ্ছে! খেয়ে যদি অসুখ করে?

অসুখ! দেউকী বলিল—তবে থাক···

বীণা আরাম বোধ করিল, বলিল—হ্যাঁ। তোরা খেয়ে নিগে যা··· আমার জন্য বসে থাকিসনে।

দেউকী বলিল,—তোমার মামাবাবু বলে গেলেন, ফিরে আসবেন···

বীণার বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! বীণা বলিল,—তা হোক।

কখন কে আসবে বলে বসে থাকিস্‌নে! তিনি এলে তেওয়ারী তাঁর খাবার দেবে'খন! যা, বুঝলি?

দেউকীর সান্নিধ্যও বীণার সহ্য হইতেছিল না! তাকে বিদায় করিতে পারিলে বীণা যেন বাঁচে!

বীণার কথা দেউকী মানে। এ-কথায় সে চলিয়া গেল।

বীণা ভাবিল, মামাবাবু শ্রীপতি নয় তো?

এ চিন্তা মনে জাগিবামাত্র বাহিরে চাঁদের আলো চকিতে নিবিয়া গেল।

বীণা ভাবিতে বসিল···

যদি শ্রীপতি হয়? এই রাত্রে আসিয়া যদি গোলমাল করে? দাসী-চাকরদের সামনে? স্বর্ণদ্যুতি থাকিলে হয়তো সাহস হইত না! স্বর্ণদ্যুতি নাই···সলিলা-বেশে এখানকার কর্ত্রী সাজিয়া থাকিলেও শ্রীপতি জানে, সে সলিলা নয়, বীণা! কাজেই বীণার মান-সম্ভ্রমের পানে বা নিজের বিপদের পানে সে চাহিয়া দেখিবে না!

বীণা ভাবিল, আর নয়! এ চিঠি লিখিয়া শেষ করা চাই! মা তার কি সর্ব্বনাশ যে করিয়া গিয়াছে! শয়তান শ্রীপতি মা'কে কি-মোহে ভুলাইয়াছিল যে, সে-মোহে নিজের কথা ভুলিলেও নিরপরাধ মেয়ের কথা মা'র মনে জাগে নাই?

মানুষের এক-নিমিষের ভুল! সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কত জনকে কত ভাবে না করিতে হয়!

বুকের মধ্যে অশ্রুর পাথার একেবারে উথলিয়া উঠিল! কি দুরাশায় ভর করিয়া বীণা নিজেকে আজ কোথায় আনিয়াছে? এখানে তার ঠাঁই হইতে পারে না। এখন কোন্ রসাতলে গিয়া পড়িবে···

বীণার পায়ের নীচে হইতে বিশ্ব-সংসার যেন কোথায় সরিয়া চলিয়াছে···

চেতনা ফিরিতে মনে হইল, মা'র উপর তার মিথ্যা অভিমান! মা'র কি দোষ? মা তো বলে নাই, সলিলা সাজিয়া তুই পরের ভাগ্য চুরি কর্!

বেচারী তারাচরণ রায়! বেচারী স্বামী!

চোখের সামনে জাগিল দিনের প্রখর আলো···কাণের কাছে মত্ত গর্জ্জনে হুঙ্কার তুলিল সংসারের অট্টহাসি···যে-কাজ করিয়াছিস্, কার কাছে মার্জ্জনার প্রত্যাশা রাখিস? কার কাছে আশ্রয় চাহিবি? কে তোকে বিশ্বাস করিবে? ওরে অবিশ্বাসিনী···ওরে··· ওরে···

বীণা স্থির করিল, যে-কাজ করিয়াছে, তার চেয়ে কি বড় পাপ হইবে নিজের সত্য পরিচয় দিতে অকপটে যদি মায়ের কথা সে আজ প্রকাশ করে?···আর কারো কাছে নয়! তারাচরণ রায়ের কাছে···স্বর্ণদ্যুতির কাছে! পৃথিবী তাকে না বুঝিয়া অবিচারে যত-বড় কঠিন দণ্ড দিক্, সে গ্রাহ্য করিবে না! কিন্তু তারাচরণ রায় আর স্বর্ণদ্যুতি?···তাঁদের কাছে সব কথা সে খুলিয়া বলিবে! আর কেহ বীণাকে না বুঝুক, এঁরা দু'জনে যদি বুঝিতে পারেন···

এঁরা বুঝিলে রৌরব-নরকে গিয়াও বীণা আরাম পাইবে!

বীণা আবার চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল নিজের জীবনের পরিচয় ···যা-যা ঘটিয়াছিল! এবং নিমেষের যে-খেয়ালে তারাচরণ রায়কে সে চিঠি লিখিয়াছিল···

মস্ত চিঠি! চিঠি লিখিয়া সে-চিঠি খামে পুরিয়া লেফাফার উপরে লিখিল···

শ্রীযুক্ত স্বর্ণদ্যুতি রায়

পরম-পূজনীয়েষু

তার পর টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া খামখানি তার মধ্যে রাখিল।

ড্রয়ার বন্ধ করিয়া মনে হইল, তার জীবনে যেন পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিয়াছে! এ-জগতের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক শেষ!

এখন···?

দেহে-মনে প্রচণ্ড শিহরণ! না···মরিতে পারিবে না! মৃত্যু নয়! সে বাঁচিতে চায়···বাঁচিবে!···তবে এখানে নয়! এখানে সমাজ-সংসার! সে সমাজে, সে সংসারে মান-সম্ভ্রম···তারাচরণ রায়ের পানে চাহিয়া, স্বর্ণদ্যুতির পানে চাহিয়া লোকে হাসিবে···

না···

দূর হইতে সে দেখিতে চায়, তার এ সত্য পরিচয় জানিয়া বীণার কি বিচার ওঁরা করেন! ওঁরা কি বুঝিবেন না, রাজ্যৈশ্বর্য্য ও সম্পদের লোভে বীণা এ-প্রতারণার আশ্রয় লয় নাই?

সেইটুকু···শুধু সেইটুকু যদি বীণা জানিতে পারে...

তার পর মৃত্যু আসিয়া যদি ডাকিয়া বলে, এসো বীণা···বীণা হাসি-মুখে খুশী-মনে মৃত্যুকে বরণ করিবে।

সে-মৃত্যুর আগে যেমন করিয়া পারে, তাকে বাঁচিতেই হইবে!

কিন্তু কোথায়? কোথায়? কেমন করিয়া বাঁচিবে? নিজের সব

অবলম্বন বিসর্জ্জন দিয়া বাঁচা কি সম্ভব? মনে পড়িল ক্ষীরোদাময়ীর কথা—তার পর তিনকড়ি-দাদু···উষাঙ্গিনী···কিরণ···

বুক চিরিয়া প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস!

—ভগবান···বলিয়া বীণা টেবিলের উপরে মাথা লুটাইয়া দিল···

যখন মাথা তুলিল, তখন নিঝুম-রাত্রি। চারিদিক নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আছে! আকাশের আসন ছাড়িয়া চাঁদ বিদায় লইয়াছে। আকাশের বুকে শুধু একরাশ নক্ষত্র স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নক্ষত্রগুলা তার পানে চাহিয়া আছে!

বীণা উঠিল। উঠিয়া খোলা খড়খড়ির সামনে আসিল। গাছ-পালার ফাঁক দিয়া ও-দিকে রাবেয়ার দোতলার ঘর ঐ দেখা যায়···ঘরে আলো জ্বলিতেছে! আলোর এতটুকু রশ্মি!

বীণার মনে হইল, ভাগ্যবতী রাবেয়া! ও যেন বিজলী বাতির আলো নয়···রাবেয়ার সৌভাগ্যের দীপ্তি!

বিগলিত মনে বীণা বলিল, তুমি ভাগ্যবতী···মায়ের স্নেহে মানুষ হইয়াছ বোন্···স্বামীর স্নেহে তোমার জন্মগত অধিকার! তোমার এ সুখ-সৌভাগ্য অক্ষয় হোক, অনন্ত হোক! আদর করিয়া বীণাকে তুমি সখী বলিয়া ডাকিয়াছিলে···কাল যখন শুনিবে, বীণা কে···কত-বড় ছলনায় কার সৌভাগ্য সে চুরি করিয়া ভোগ করিতেছিল···

বীণার ব্যথা কত বড়, বীণা কতখানি ভাগ্যহীনা···কি নিরুপায় অসহায়তায় পড়িয়া সে···তার জন্য একটু সৌভাগ্য কামনা করিয়ো বোন্···তার দুঃখ স্মরণ করিয়া তোমার চোখে শুধু দু'টি ফোঁটা

অশ্রু! তোমাদের ভালোবাসার স্মৃতি ছাড়া বীণার আর কোনো সম্বল নাই!

কিন্তু এখন? এখন সে কি করিবে?

এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে নিজেকে ভাসাইয়া দিবে?

এ-অন্ধকারের ও-দিকে কি যে আছে!

পা সরিতে চায় না! মন বলিল, তার চেয়ে স্বামীর পায়ে পড়িয়া বলো, তোমার স্ত্রী নই···দাসী করিয়া এইখানে ফেলিয়া রাখো! পারিবে না···ওগো?

মন আবার বলিল, উষাঙ্গিনীর কাছে যাইবে?

ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে চড়িয়া বসা···তার পর ট্রেণ গিয়া চুণারে থামিবে!

কিন্তু সেখানে গিয়া কি করিয়া···?

ভগবান্ ভগবান্ ক'ঘণ্টার মধ্যে এ তুমি কি করিলে প্রভু পৃথিবীতে এমন একটু ঠাঁই রাখো নাই যেখানে গিয়া বীণা ক্ষণেকের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারে!

চিন্তার তীক্ষ্ণ শরে জর্জ্জরিত বুক লইয়া বীণার রাত্রি কাটিল।

৩০

ভোরের আলো, ভোরের বাতাস কি সম্ভাবনা যে বহিয়া আনিল! বীণা ভাবিল, ভাগ্যে রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হই নাই!···এ-বাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? অপরাধ করিয়াছে! সে-অপরাধের শাস্তি সে লইবে...স্বামীর হাতে···সে-শাস্তি কঠোর হয়, হোক! চোরের মতো আসিয়াছে···কিন্তু যে আদর ভালোবাসা পাইয়াছে···চোরের মতো চলিয়া গিয়া সে-আদর, সে-ভালোবাসার অপমান সে করিবে না!

চুপ করিয়া বীণা নিজের ঘরে বসিয়াছিল, দেউকী আসিয়া বলিল— উঠেছো বহুদি···

বীণা চাহিল দেউকীর পানে। তার মূর্ত্তি দেখিয়া দেউকী শিহরিয়া উঠিল! এ যেন তার সে বহুদি নয়···বহুদির কঙ্কাল যেন শ্মশান ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে!

দেউকী বলিল—সারা রাত ঘুমোওনি বুঝি?

বীণা কহিল—না। সারা রাত কাল ভয়ঙ্কর মাথার যাতনা গেছে দেউকী!

দেউকী বলিল—মোহনলালকে বলি, ডাংদার-সাবকে ডেকে আমুক!

মুখে মলিন হাসি···বীণা বলিল—না রে, ডাংদার-সাবের দরকার নেই। মাথা ধরা ছেড়েছে···চান করে ঘুমোলেই শরীর ঠিক হবে।

দেউকী বলিল—তা হলে চান করো। আমি তোমার দুধ আর হালুয়া নিয়ে আসি।

বীণা বলিল—হবে'খন। ব্যস্ত হোস্‌নে।

দেউকী ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর বলিল—তোমার মামাবাবু কাল রাত্রে ফিরেছেন। তখন বারোটা বেজে গেছলো। আমি এসে দেখি, তুমি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছ···তাই আর ডাকিনি। তেওয়ারী ওঁকে খাইয়েছে। নীচে দক্ষিণের ঘরে বিছানা হয়েছিল··· ঘুমিয়েছেন।

একাগ্রমনে বীণা কথাগুলি শুনিল—কোনো জবাব দিল না।

দেউকী বলিল—এখন চা খেয়েছেন। বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। আজ আবার উনি কাশী নাকি যাবেন···কাজ আছে!

বীণার বুকের মধ্যে আবার সেই সাগরের উত্তাল তরঙ্গ! এ-তরঙ্গ থামিয়াছিল, দেউকীর কথায় আবার···

বীণা বলিল—কোথায় সে-লোক?

দেউকী বলিল,—নীচে আছে। বসবার ঘরে।

বীণা বলিল,—আচ্ছা, তুই যা। আমি গিয়ে দেখা করবো'খন।

দেউকী চলিয়া গেল।

বীণা বিলম্ব করিল না...ধীর-পায়ে নীচে নামিয়া আসিল। একেবারে স্বর্ণদ্যুতির বসিবার ঘরে আসিল।

দেখে···যা ভাবিয়াছিল···শ্রীপতি !

বুক কাঁপিল। চকিতের জন্য ! বীণা বুক বাঁধিল। 'এখনো ভয় ? কেন ? কিসের জন্য ?

স্পষ্ট রুক্ষ স্বরে বীণা বলিল,—এখানে এসেছো তুমি ! এর মানে ?

দাঁত বাহির করিয়া হাসির বন্যা বহাইয়া শ্রীপতি বলিল,—আসবো না ? মেয়ে কেমন সুখে বাস করছে, দেখবার সাধ হয় না ?

বীণা বলিল,—তোমার মেয়ে এখানে কেউ নেই যে, তার সুখ দেখবার জন্য তোমার সাধ হবে !

শ্রীপতি বলিল,—আমার ভুল হয়েছে, বটে ! তুমি এখন বড়-মানুষের নাত্‌নী···তুমি বীণা নও···সলিলা !

বীণা বলিল,—আমি সলিলা নই। আমি বীণা।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া শ্রীপতি বলিল—তা হলে আমার আসা অন্যায় হলো কোন্‌খানটায় ?

বীণা বলিল,—সে-কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার মতো সময় বা ধৈর্য্য আমার নেই।···আমি তোমায় স্পষ্ট কথা বলতে এসেছি···শোনো, এ-বাড়ীতে এক দণ্ড তোমার থাকা হবে না। এখনি তুমি চলে যাও···

বীণার কঠিন ভঙ্গী দেখিয়া শ্রীপতি বিস্মিত হইয়াছিল। এমন ভঙ্গী শ্রীপতি জন্মে কখনো দেখে নাই ! বীণার এ-কথায় তার সে-বিস্ময় বাড়িল। শ্রীপতি বলিল,—এক-কথায় চলে যাবার মতো লোক আমি নই, তা বোধ হয় তুমি জানো বীণা !

বীণা বলিল—আমি কি জানি, না জানি, সে-কথা তোমার মুখে আমি

শুনতে আসিনি!...তুমি এখনি এখান থেকে চলে যাবে কি না, আমি শুধু তাই জানতে চাই।

শ্রীপতি ভ্রূকুটি করিল; বলিল—আমি যাবো না।

বীণা বলিল—হুঁ...তা হলে তোমার হাত ধরে বাড়ীর বার করে দেবার জন্য আমার লোক-জনকে হুকুম দিতে হবে, দেখছি!

রাগে শ্রীপতি ফোঁশ করিয়া উঠিল! কহিল—সে সাহস তোমার হবে?

—সাহস!

—হ্যাঁ। সে-সাহসের ফলে কি হতে পারে, জানো?

অবিচল কণ্ঠে বীণা কহিল—আমি জানি; আমার কিছুই হবে না। তুমি আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, এটা তুমি জেনে রেখো!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিদ্রূপের সুরে শ্রীপতি কহিল—এমন প্রেম! বটে!

বীণা হস্ত প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনী-নির্দ্দেশে বলিল—যাও... ও-চেয়ারে বসেছো...এত-বড় তোমার স্পর্দ্ধা! যাও, এখনি বেরিয়ে যাও...

শ্রীপতি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল...বীণার পানে চাহিয়া...তার দু'চোখে আগুনের স্ফুলিঙ্গ!

বীণার চোখেও অগ্নি-শিখা! বীণা ডাকিল—দেউকী...

দেউকী আসিল। বীণা বলিল—দরোয়ানকে ডাক্...এ একজন বদমায়েস্! এর ঘাড় ধরে দরোয়ান এখনি একে বাড়ীর বার করে দেবে। যা...

বীণার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতেছে...বাতাসের দোলায় কিশলয়-পল্লবের

মতো! বীণার এমন মূর্ত্তি দেউকী কখনো চোখে দেখে নাই!…সে কেমন মূঢ়ের মতো দাঁড়াইয়া রহিল!

বীণা কহিল—যা…দাঁড়িয়ে রইলি যে! এখনি দরোয়ানকে ডেকে নিয়ে আয়…

দেউকী চলিয়া গেল।

বীণা কহিল—ভেবেছো, চোখ রাঙিয়ে চিরদিন চলবে?…তোমার ও চোখ-রাঙানির ভয় আমি করি না! পথের কুকুর কোথাকার…নাই পেয়ে আস্পর্দ্ধা তোমার…

শ্রীপতি এবার চটিল। বলিল—এই পথের কুকুরের পায়েই তোমার গর্ভধারিণী-মা এক দিন…

অভাগিনী মায়ের নামে বীণার বুকে যেন নৃমুণ্ডমালিনী মহা-কালী নাচিয়া উঠিলেন! বীণার পায়ে ছিল শ্লীপার। পা হইতে সেই শ্লীপার খুলিয়া সে-শ্লীপার সবেগে বীণা নিক্ষেপ করিল শ্রীপতির মুখ লক্ষ্য করিয়া। শ্লীপার আসিয়া পড়িল শ্রীপতির কপালের উপর…

শ্রীপতি গর্জ্জন করিল—জুতো মারা! তবে রে মেয়ের নিকুচি করেছে! অতসীর মেয়ে বীণা—সেই বীণা…

কথাটা বলিয়া শ্রীপতি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সজোরে বীণার হাত চাপিয়া ধরিল…

সেই মুহূর্ত্তে দেউকীর সঙ্গে দরোয়ান আসিয়া দাঁড়াইল ঘরের দ্বারে…

বীণা কহিল,—ডাকু—

এ-দৃশ্য দেখিয়া নেপালী দরোয়ান্ বাহাদুর একেবারে বাঘের মতো শ্রীপতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার গলা টিপিয়া হাঁটুর গুঁতায় তাকে

মেঝেয় ফেলিল, তার পর মারিল লাথি-ঘুষি-গাঁট্টা। শ্রীপতিকে বাহাদুর যেন পিষিয়া মারিবে…শ্রীপতির মুখে কথা সরিল না…শ্রীপতির হু' চোখ কপালে উঠিল!

বীণা বলিল—আর মেরো না বাহাদুর। ওকে বাড়ীর বার করে দাও।

দেউকী বলিল—পুলিশে দাও বাহাদুর…

বীণা কহিল,—না…শুধু বার করে দাও। তার পর ত্থাখো, ওর কি জিনিষ-পত্তর আছে…সেগুলো ফেলে দাও। আর ওকে চিনে রাখো, এ-বাড়ীর ফটকে আর কখনো যেন ও মাথা গলাতে না পারে!

শ্রীপতির ঘাড় ধরিয়া তাকে ধাক্কা দিতে দিতে বাহাদুর বাড়ীর বাহির করিল…শ্রীপতি একবার শুধু হু' চোখে আগুন জ্বালিয়া গর্জ্জন তুলিল,—আচ্ছা, অতসীর মেয়ে বীণার এর জন্য কি হাল হয়…

বীণা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল…কোনো জবাব দিল না!

শ্রীপতিকে বাহাদুর দরোয়ান ফটকের বাহির করিয়া দিল।

গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া শ্রীপতি বলিল—আমার ব্যাগ আর ছাতা?

দেউকী ব্যাগ আর ছাতা লইয়া আসিয়াছিল। বাহাদুর সে-ব্যাগ ও ছাতা ফটকের বাহিরে ছুড়িয়া দিল।

শ্রীপতি কহিল,—যদি বনবাসে না পাঠাতে পারি তো আমার নাম শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী নয়…

বীণার ভয় নাই…দ্বিধা নাই…যেন মস্ত বিপদের মেঘ কাটিয়া তার জীবনে সূর্য্য উঠিয়াছে!

শ্রীপতি সেই যে গিয়াছে, তার আর সাড়া-শব্দ নাই!

বীণা জোর করিয়া তার কথা মন হইতে দূর করিয়া দেয়! স্বর্ণদ্যুতির চিঠি আসে। সে লেখে, লক্ষ্মীছাড়া অফিস…যেন অক্টোপাশ! লেখে, সে আর পারে না! এলাহাবাদে আসিবে। আসিয়া বীণাকে দিল্লী লইয়া যাইবে।

তিন দিন পরে স্বর্ণদ্যুতি টেলিগ্রাম করিল,—আসিতেছি।

টেলিগ্রাম পড়িয়া বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর স্নান করিয়া দেউকীকে ডাকিল, বলিল,—আজ আমি একটু বাইরে যাবো দেউকী…

—কোথায় বহুদি?

—চুণার। সেখানে আমার এক পিশিমা আছে, জানিস্ তো! সেই যে একবার তোর সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম।

দেউকী বলিল,—হ্যাঁ…

বীণা বলিল,—কাল রাত্রে আমার সেই পিশিমাকে স্বপ্ন দেখেছি… তাঁর জন্য মন ভারী অস্থির হয়ে আছে। হয়তো দু' একদিন সেখানে থাকবো। তোর সাহেব তো এখানে নেই…তোরা ঘর চৌকি দিতে পারবি না?

দেউকী কোনো জবাব দিল না। তার মনে মেঘের মতো অনেক প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল…ঐ যে লোকটি মামা-পরিচয়ে আসিয়াছিল, সে এমন দুর্বৃত্ত…তাকে দেখিয়া অবধি দেউকীর মনে অশান্তি…লোকটা যেন কেমন-এক ধাতের…

বীণা বলিল,—ও-লোকটা বাড়ীতে যেন না ঢোকে, খবর্দ্দার! ও সর্ব্বস্ব নিয়ে যেতে পারে। কলকাতায় একবার গিয়েছিল···ওকে খুব সাবধান!

ষ্টেশনে আসিয়া চুণারের টিকিট কিনিয়া বীণা ট্রেণে উঠিয়া বসিল। দেউকী বার-বার বলিল, বাহাদুর সঙ্গে যাক্, নাহলে সাহেব রাগ করিবেন। হাসিয়া বীণা জবাব দিল,—না রে না, তোর সাহেবকে আমার চেয়ে তুই বেশী জানিস?

দেউকী বলিল,—এক-কাপড়ে চললে বহুদি! গায়ে গয়না নেই··· কাপড়চোপড় সঙ্গে নিলে না!

হাসিয়া বীণা বলিল,—গয়না গায়ে ট্রেণে চড়ে শেষে চোরের হাতে প্রাণ দেবো! আর কাপড়-চোপড়? আমার পিশিমার কি কাপড় নেই? তাছাড়া দু'দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছি···সেখানে থাকতে যাচ্ছি না তো!

ট্রেণ চলিয়াছে। কামরায় বসিয়া বীণা ভাবিতেছিল আর-এক দিনের কথা! সেদিনও ট্রেণে চড়িয়া চুণারে যাইতেছিল···সঙ্গে ছিল স্বামী স্বর্ণদ্যুতি!···তার আগে আর-এক দিন···যে-দিন ট্রেণে চড়িয়া কলিকাতা ছাড়িয়া এলাহাবাদে আসে। সে-দিনের সে-যাত্রায় বৈস্যচন দেখা দিয়াছিল। কে জানিত, বজ্রের মতো তার জীবনকে তা এত-শীঘ্র দগ্ধ ভস্ম করিয়া দিবে!

স্বামী···স্বামীর ঘর···স্বামীর আদর···

হায় রে, একান্তে বসিয়া বিধাতা তার ভাগ্যে যে-লেখা লিখিয়া দিয়াছেন, কোমর বাঁধিয়া সে গিয়াছিল ভাগ্যের সে-লেখা উল্টাইয়া দিতে! এখন—

যেমন মানুষ, যদি তেমন থাকিত...

কিন্তু রাজ-সিংহাসনের লোভ বীণা করে নাই! সিংহাসনের লোভ কোনো দিন তার মনে জাগে নাই! সকলের পিছনে...সকলের পায়ের কাছে চাহিয়াছিল শুধু নিরাপদ একটু ঠাঁই! তার বেশী সে প্রত্যাশা করে নাই—কোনো দিন না!

এখন চুণারে চলিয়াছে···তার পর?

পরের কথা বীণা আর ভাবিতে পারে না! ভাবিবার মতো শক্তি বা বুদ্ধি তার নাই!

৩১

চুণার।

টিকিট দিয়া ফ্লাটফর্ম্ম হইতে বীণা বাহির হইবে, সামনে তারাচরণ রায়।

তারাচরণ রায় উঠিলেন, ডাকিলেন,—দিদি···

বীণার মনে হইল, ভূমিকম্প হইয়া পৃথিবীখানা ফাটিয়া গিয়াছে এবং সেই ফাটা-মাটীর নীচে যেন তার পাতাল-প্রবেশ!

তারাচরণ রায় বলিলেন—এখানে?

কোনো মতে বীণা 'মুখ তুলিল'। দু' চোখে অপরাধীর কুণ্ঠিত দৃষ্টি!

তারাচরণ রায় বলিলেন—একা!···স্বর্ণ কোথায়?

বীণার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া কাঁপনের স্রোত···সে-স্রোতে নিজেকে খাড়া রাখা যায় না!

তারাচরণ রায় দু'হাতে বীণাকে ধরিয়া ওয়েটিং-রুমে আনিয়া বসাইলেন।

বীণা যন্ত্র-চালিতের মতো বসিল।

একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া তারাচরণ রায় সেই চেয়ারে বসিলেন; বসিয়া বীণার পানে চাহিলেন।

বীণার পৃথিবী তখন কোথায় কত দূরে সরিয়া গিয়াছে! বীণা যেন পৃথিবীর বাহিরে পড়িয়া আছে···সামনে তারাচরণ রায়! তাঁর ছ' চোখে পুরানো সেই স্নেহের দৃষ্টি···মনে হইতেছিল, ও-দৃষ্টি যেন সত্য নয়—আগেকার সে-দৃষ্টির স্বপ্ন-স্মৃতি!

তারাচরণ রায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমি বুঝেছি, দিদি···সে-লক্ষ্মীছাড়াটা তোমার ওখানে নিশ্চয় গিয়েছিল। কলকাতায় আমাকে সেই ভয় দেখিয়েই এসেছিল···

এ-কথায় সরিয়া-যাওয়া পৃথিবী আবার যেন বীণার বুকের কাছে আগাইয়া আসিল! সে পৃথিবীর সঙ্গে সেই-প্রীতি-ভালোবাসা···সেই দ্বিধা-সংশয়·· সেই দারুণ বিভীষিকা···

বীণা কোন কথা বলিল না···ভয়াতুর দৃষ্টিতে তারাচরণ রায়ের পানে চাহিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন—স্বর্ণ এখন দিল্লীতে···না?

নিশ্বাস ফেলিয়া বীণা বলিল,—হ্যাঁ···

তারাচরণ রায় বলিলেন,—বুঝেছি।

তার পর বীণার মুখে-চোখে সস্নেহে হাত বুলাইলেন; বুলাইয়া তিনি বলিলেন—তুমি চলে এসেছো···আমার ভয় করছে দিদি।

ট্রেণের কামরায় বসিয়া বীণা নিজের সম্বন্ধে সব কথা ভাবিয়া শেষ করিয়াছে! ভাবিয়া ঠিক করিয়াছে, উষাঙ্গিনীর কাছে মুখের কথায় সে সব বলিবে। চিঠির লেখায় নয়! সব কথার শেষে উষাঙ্গিনীকে এ-কথাও বলিবে, কোনো দিক দিয়া তার নিজের কোনো অপরাধ নাই! মায়ের ভুল···সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যদি তাকে করিতে হয়···

ইহার বেশী আর সে ভাবিতে পারে নাই! উষাঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিবে, বীণা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তুমি বলিয়া দাও পিসিমা...

তারাচরণ রায়ের প্রশ্নে তার বুকখানা একবার দুলিয়া উঠিল। তার পর সে-বুক চাপিয়া মাড়াইয়া বীণা বলিল—আমায় ক্ষমা করো, দাদু! আমি তোমার সলিলা নই। আমি বীণা। সলিলা স্বর্গে। সন্তোষ-মামা আর চারুলতা-মামীমা আমাকে সলিলার মতো ভালো বাসতেন। আর আমি...

বলিতে বলিতে অশ্রুর বন্যায় বীণা একেবারে ফাটিয়া পড়িল!

তাকে বুকে টানিয়া তারাচরণ রায় বলিলেন—তুমি বীণা নও, তুমি সলিলা নও, তুমি কেউ নও...আজ তুমি শুধু আমার দিদি...তুমি আমার সব!...জানো, আমার বুক একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিল? বুকে পাথর এঁটে মানুষ বাঁচে না...বাঁচতে পারে না। আমিও বাঁচতে চাইনি...কিন্তু না চাইলেও মানুষকে বাঁচতে হয়! সে-বাঁচা কত-বড় দুর্ভোগ...আমার সে-দুর্ভোগ তুমি কি করে মোচন করেছো দিদি, তুমি জানো না, কিন্তু আমি তা জানি!

বীণা এ-কথার জবাব দিল না, বিমূঢ়ের মতো তারাচরণ রায়ের পানে চাহিয়া রহিল।

তারাচরণ রায় বলিলেন—আমি সব জানি, দিদি। তোমার বিয়ের পর যে-দিন তোমায় এলাহাবাদে পাঠাই, তোমাদের গাড়ী ছেড়ে যাবার পর প্লাটফর্মে একটা লোক আমার সঙ্গে এসে আলাপ করে। সে আমাকে সব কথা বলেছিল। টাকা দিয়ে আমি তার মুখ বন্ধ করি। একবার নয়...তিন-চার বার।...ভয় হয়েছিল, এ-কথা শুনে স্বর্ণ যদি...

বীণার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ-রেখা···

তারাচরণ চরণ বলিলেন,—তাই আমি টাকা দিয়ে লোকটাকে আটকে রেখেছিলুম। তার পর লোকনাথকে কাশীতে পাঠাই···যাঁর কাছে সেখানে তুমি থাকতে, ক্ষীরোদা দেবী···তাঁর কাছে সব খপর নিতে। লোকনাথ সব খপর নিয়ে ফিরলে লোকটাকে আমি বলি, কাগজে-কলমে সব কথা লিখে দাও, একেবারে কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়ো···নগদ পাঁচশো টাকা দেবো! সে রাজী হলো। লিখে দিলে, তোমার জন্ম পবিত্র···তখনি তাকে দিলুম দিদি, পাঁচশো টাকা! তার পরে তার লোভ বাড়লো। সে আবার এলো। বললে, আবার টাকা চাই! তাকে তাড়িয়ে দিলুম। বললুম, ফের এলে পুলিশে দেবো। সে চলে গেল। বলে গেল, এবার স্বর্ণদ্যুতির পালা! স্বর্ণদ্যুতি দেবে টাকা!··· এ-কথা শুনে তখনি আমি বেরিয়ে পড়লুম। লোকনাথ কাশী গেছে ওঁদের আনতে···ক্ষীরোদাময়ী দেবীকে। ক্ষীরোদাময়ী দেবীকে নিয়ে এলাহাবাদে গিয়ে আমি এ-ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে চাই!

বীণা যেন কাঠ! তার চেতনা নাই···প্রাণের স্পন্দন যেন থামিয়া গিয়াছে!

তারাচরণ রায় বলিলেন,—এই পার্শেল-এক্সপ্রেশে ওরা এসে পৌছুবে। এখানে ওরা নামবে না। আমিও সেই ট্রেণে উঠবো। উঠে এক সঙ্গে সকলে যাবো এলাহাবাদ। উষাও আমাদের সঙ্গে যাবে।

বীণার মুখে কথা নাই! পাংশু, বিবর্ণ মুখ! পৃথিবীতে যেন মহাপ্রলয় ঘটিতেছে···এ প্রলয়ের পরে কি···আলো, না অন্ধকার, কে জানে!

এলাহাবাদে ট্রেণ থামিলে বীণাকে লইয়া সকলে আসিলেন স্বর্ণদ্যুতির গৃহে।

গৃহে বিপর্য্যয় কাণ্ড!

দিল্লী হইতে স্বর্ণদ্যুতি আসিয়াছে। আসিয়া বীণাকে লেখা সেই চিঠি পড়িয়া এবং বাড়ীতে বীণাকে না দেখিয়া দাসী-চাকরকে ভর্ৎসনা করিতেছে, বেইমান্! মা-জীর খপর রাখো না! এমন সময় শ্রীপতির আবির্ভাব···

নাম বলিয়া পরিচয় দিবা মাত্র স্বর্ণদ্যুতি নিঃশব্দে টেলিফোন্ করিয়া পুলিশ ডাকিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়াছে। চার্জ্জ দিয়াছে, ভয় দেখাইয়া টাকা-আদায়ের প্রয়াস!

বীণা আসিয়া চোরের মতো সেই যে নিজের ঘরে ঢুকিয়াছে, কাহারো সঙ্গে দেখা নেই···কথা নাই···কিছু না!

ওদিকে এক-তলার ড্রয়িং-রুমে তারাচরণ রায়ের সঙ্গে স্বর্ণদ্যুতির কথা হইতেছিল।

স্বর্ণদ্যুতি বলিল—দিল্লীতে আমার ঠিকানায় চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, কুলটার কন্যাকে বিবাহ করেছেন! ও-মেয়ের নাম সলিলা নয়; বীণা। ও তারাচরণ রায়ের পৌত্রী নয়! এ-কথা প্রকাশ পেলে কি হবে ভাবো,—এমনি সব কথা লিখেছিল। পোষ্টকার্ডে। পোষ্ট-মার্ক দেখলুম এলাহাবাদ। ভয় হলো! ভাবলুম, ও এখানে একা···ছুঁচোটা বাড়ীতে এসে যদি উৎপাত করে! তাই ফার্ষ্ট ট্রেণে চলে এসেছি।

তারাচরণ রায় হতভম্বের মতো বসিয়াছিলেন। কহিলেন—মিথ্যা